WWW.BANGLAPDFBOI.COM EXCLUSIVE

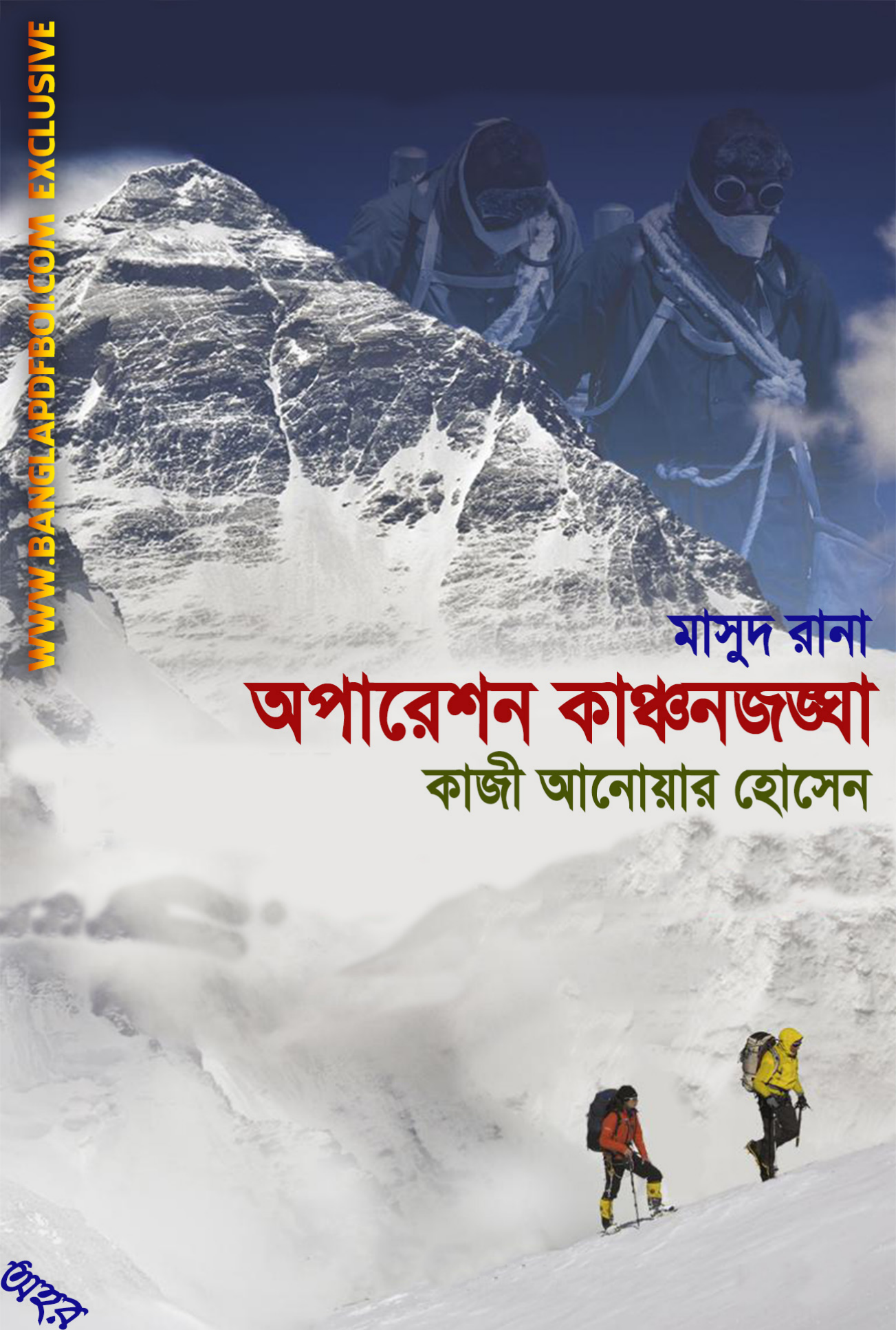

মাসুদ রানা

অপারেশন কাঞ্চনজঙ্ঘা

কাজী আনোয়ার হোসেন

এই বইটি বাংলাপিডিএফবই এর সৌজন্যে নির্মিত। বইটি ভালো লেগে থাকলে অবশ্যই এর একটি কপি আপনার নিকটতম বুকস্টল থেকে সংগ্রহ করার জন্য অনুরোধ করা হল। লেখক কিংবা প্রকাশকের কোন প্রকার আর্থিক ক্ষতি আমাদের কাম্য নয়।

বাংলাপিডিএফবই ওয়াটারমার্ক বিহীন বই প্রকাশ করে থাকে। এই পদ্ধতি অবলম্বনের কারনে আমাদের ওয়েবসাইটটির প্রসারে ও প্রচারে বাধা আসছে। কাজেই সবার কাছে অনুরোধ করা হচ্ছে যে আপনি এই ওয়েবসাইটটি থেকে বই ডাউনলোড করে উপকৃত হলে, অবশ্যই আপনার পরিচিতজনদের কাছে আমাদের সাইটটি শেয়ার করবেন।

বাংলাপিডিএফবই কর্তৃপক্ষ

Coming Soon

অপারেশন কাঞ্চনজঙ্ঘা

প্রথম প্রকাশ:২০০৪

এক

চোয়াল দুটো নব্বুই ডিগ্রি খুলে ওদেরকে অবাক করে দিল রাক্ষুসে ব্যারাকুডা। সারি সারি ধারাল দাঁত বেরিয়ে পড়েছে, কামড় দিয়ে নিমেষে এক খাবলা মাংস তুলে নিতে পারবে। খিঁচানো মুখ বন্ধও করল খপ্ করে, তবে আধ ইঞ্চি ফাঁক রেখে।

ওটা কি হাই তুলল?

মাছটার ওজন হবে প্রায় বিশ পাউন্ড। ব্যারাকুডাকে ভোজন পটু একটা মেশিন বললেই হয়, হিংস্রতায় হাঙরের প্রতিদ্বন্দ্বী। ওদের পাশে সাবধানে সাঁতরাচ্ছে, নজর রাখছে কড়া। অচেনা বড় দুটো 'মাছ' নিজের বসতিতে অনধিকার ঢুকে পড়ায় স্বভাবতই খুব কৌতূহল বোধ করছে ওটা।

একটা ব্যারাকুডার কাছাকাছি থাকবার চেয়ে রানা বরং সাপে ভর্তি-একটা গর্তে থাকতে বেশি পছন্দ করবে। এমন নয় যে ভয় পায়–আসলে ওগুলোর নীচতা, বদমেজাজ আর খামখেয়ালীপনা দু'চোখের বিষ ওর। রানাকে নিজের পাহারায় থাকতে হবে নির্ভয়ে, কারণ কেউ ভয় পেলে ঠিকই টের পেয়ে যায় ব্যারাকুডা, দুর্বলতার সুযোগ নিতেও দেরি করে না।

সঙ্গিনীর দিকে তাকাল রানা। মাছটাকে ভয় না পেয়ে বরং মুগ্ধ চোখে দেখছে সে। ইঙ্গিতে তাকে সাঁতার থামাতে নিষেধ করল রানা, মাথা ঝাঁকিয়ে সাড়া দিল মেয়েটি। মাছটাকে উপেক্ষা করবে ওরা। দেখা গেল এটাই সবচেয়ে ভাল কৌশল। কয়েক মিনিটের মধ্যে আগ্রহ হারিয়ে ফেলল ওটা, দ্রুত সাঁতার কেটে ধোঁয়াটে নীলে অস্পষ্ট হতে হতে হারিয়ে গেল।

সাঁতরে সৈকতের দিকে ফিরছে ওরা। পায়ের নীচে দাঁড়াবার মত শক্ত কিছু পাওয়ার পর ফেসমাস্ক আর স্নরকেল খুলে ফেলল রানা। ওর পাশে এসে দাঁড়াল পলি। মাস্ক আর স্নরকেল খুলে হেসে উঠল সে। 'আমার ধারণা, বুঝলে রানা, আমাদের খানিকটা নমুনা সুভেনিয়ার হিসেবে সঙ্গে করে বাড়ি নিয়ে যেতে চেয়েছিল ওটা।'

মার্চ মাসে আশি ডিগ্রি ফারেনহাইট বাহামা দ্বীপপুঞ্জে খুবই উপভোগ্য। গরম আসি আসি করছে, এইসময় পাওনা ছুটি চেয়ে নিয়ে ঢাকা থেকে সরাসরি ক্যারিবিয়ানে চলে এসেছে রানা। ওর অবশ্য ইচ্ছে ছিল ছুটিটা জ্যামাইকায় কাটাবে। কিন্তু ট্র্যাভেল এজেন্সির অফিসে প্লেনের টিকেট কাটতে গিয়ে হঠাৎ পলি মির্জার সঙ্গে দেখা হয়ে যাওয়ায় সেই ইচ্ছেটা বাতিল করে দিতে হয়েছে।

লন্ডনে, রিজেন্টস্ পার্কের কাছে রানার ঠিক পাশের ফ্ল্যাটেই বাস করেন বিখ্যাত আর্কিটেক্ট সামাদ মির্জা। ভদ্রলোকের ছোট মেয়ে পলি মির্জা চোখে পড়বার মত সুন্দরী, আর্কিটেকচারাল ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ করে বাবার লন্ডন অফিসে বসে।

মেয়েটির সঙ্গে রানার পরিচয় আছে। পরস্পরকে ওরা পছন্দও করে। তবে দুজনেই যে-যার কাজে বড় বেশি ব্যস্ত বলে কখনোই ঘনিষ্ঠ হওয়ার সুযোগ পায়নি।

এখানে এই ঢাকায় ওদের দেখা হয়ে যাবে, তা-ও দুজনেই ছুটি নিয়ে বেড়াতে যাচ্ছে, এটা স্রেফ কাকতালীয় একটা ব্যাপার। বিস্ময় কাটতে প্রশ্ন উঠল কে কোথায় চলল। পলি জানাল তার বহুদিনের ইচ্ছে বাহামার রাজধানী নাসাউ-এ বেড়াতে যাবে। ঢাকায় সম্পত্তি সংক্রান্ত কিছু কাজ ছিল, সে-সব সেরে ওদিকেই চলেছে সে। জ্যামাইকার কথা বেমালুম চেপে গিয়ে চোখেমুখে বিস্ময়ে বাকরুদ্ধ হয়ে গেল রানা, বলল, 'আরে! আমিও তো!'

ব্যস, খোদাই ষাঁড়ের মত পলির পিছুপিছু চলে এসেছে রানা। গত চারটে দিন হাসি-গল্প-আনন্দে যেন স্বপ্নের ঘোরে কেটেছে দুজনের। মুগ্ধ বিস্ময়ে আবিষ্কার করেছে ওরা একে অপরকে।

'লোকজন সব গেল কোথায়?' খালি সৈকতের চারদিকে চোখ বুলিয়ে জিজ্ঞেস করল পলি। পানিতে ওরা নামবার আগে কয়েকজন স্নরকেলার আর সানবেদারকে দেখা গিয়েছিল, এখন কেউ কোথাও নেই।

চারপাশে তাকিয়ে লোকজনের উপর খুশি হয়ে উঠল রানা।

এইমাত্র দুপুর পার হয়েছে। বড় একটা পাথর দেখে ওটার ছায়ায় চলে এল পলি। একে তো সম্ভাব্য ক্ষুদ্রতম বিকিনি পরেছে, তার উপর রোদ আগুনের মত গরম।

নিউ প্রভিড্যান্স আইল্যান্ডের দক্ষিণ-পশ্চিমে রয়েছে ওরা। বাহামার এই দ্বীপটাতেই লোক সংখ্যা সবচেয়ে বেশি। ভাগ্যটা নিতান্তই ভাল ওদের, তা না হলে এই মরসুমে কোরাল হারবারে কোন ভিলা ভাড়া পাওয়ার কথা নয়। মেট্রোপলিটান নাসাউ-এর শব্দ দূষণ আর ব্যস্ততা থেকে অনেক দূরে জায়গাটা।

'আজ রাতে কী পরব আমি?' জিজ্ঞেস করল পলি।

ছায়ার ভিতর ঢুকে তার পাশে রানাও বসল।

'কী যে পরতে বলি! সব ড্রেসেই তো ভাল লাগে তোমাকে। ড্রেস না থাকলে আরও!'

রানার কাঁধে বক্সিং মারল পলি। চট করে হাতটা ধরে ফেলে কাছে টানল ওকে রানা। একগাল দুষ্টামি হাসি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল ও রানার উপর।

রানার এক সিনিয়র বন্ধু, বাহামার সাবেক গভর্নর, আজ রাতে ওদেরকে ডিনারে দাওয়াত দিয়েছেন। ভদ্রলোককে দীর্ঘ বহু বছর ধরে চেনে রানা। পরিচয় হয়েছিল চরম একটা অস্থির সময়ে। 'মিস্টার নেগোশিয়েটর' নামে এক ক্রিমিন্যাল তাঁর মেয়ে মিনার্ভাকে অপহরণ করে মুক্তিপণ আদায় করবার পর রটিয়ে দিল, তার প্রতিদ্বন্দ্বী আরেক গ্রুপ মেয়েটাকে ছিনিয়ে নিয়ে গেছে। আরও টাকা আদায় করাই তার উদ্দেশ্য ছিল। রানা তখন বাহামায় এসেছে ইন্টারপোলের সাহায্য নিয়ে কুখ্যাত ড্রাগ ব্যবসায়ী কিউবান ডি কস্টাকে ধরবার জন্য। ইন্টারপোল অফিসারদের মুখ থেকে সব কথা জানতে পারল ও। ধর্ষক আর কিডন্যাপারকে ঠিক খুনীর মতই ঘৃণা করে রানা, কিন্তু নাবালিকা একটা মেয়ে কিডন্যাপ হয়েছে

শুনেও সেই মুহূর্তে ওর কিছু করবার ছিল না। কারণ ডি কস্টার আস্তানায় হামলার প্ল্যানটা একেবারে ফাইন্যাল করা হয়ে গিয়েছিল।

রানার অ্যাসাইনমেন্ট সফল হয়। কয়েক টন কোকেন, গাঁজা, আফিম সহ প্রচুর হেরোইন ধরা পড়ে। বন্দুক যুদ্ধে ডি কস্টার সাতজন অনুচর মারা যায়, ছ'জন আহত হয়, আত্মসমর্পণ করে ডি কস্টা সহ বাইশজন। তাদের আস্তানা থেকে দশ বছরের একটা মেয়েকে উদ্ধার করে রানা। তখনই জানা গেল ডি কস্টাই 'মিস্টার নেগোশিয়েটর' সেজে সাইড বিজনেস হিসাবে কিডন্যাপিং শুরু করেছিল। রানা নিজে গভর্নর হাউসে পৌঁছে দিয়ে আসে মিনার্ভাকে। বিচারে ত্রিশ বছরের জেল হয় ডি কস্টা ওরফে মিস্টার নেগোশিয়েটরের।

বছর কয়েক হলো অবসর নিয়েছেন গভর্নর, তবে স্ত্রী রোক্সানাকে নিয়ে নাসাউ-এ রয়ে গেছেন তিনি। মিনার্ভাই তাঁদের একমাত্র সন্তান, কানাডার মন্ট্রিয়লে একটা বোর্ডিং স্কুলে থাকে সে। বাহামায় বা আশপাশে এলে গভর্নরের সঙ্গে একবার দেখা করবার চেষ্টা রানা, তবে এদিকে ওর খুব কমই আসা হয়।

আন্তরিক উৎসাহের সঙ্গে রানাকে অভ্যর্থনা জানালেন গভর্নর। হ্যান্ডশেকটা এতই জোরাল যে মনে হল কাঁধের কাছ থেকে খসে চলে যাবে হাতটা। 'হ্যালো, মাই ইয়াং ফ্রেন্ড। তুমি একটুও বদলাওনি দেখে অসম্ভব ভাল লাগছে।'

'ধন্যবাদ। আপনারও তো বয়স দেখছি একই সমান রয়ে গেছে।'

মাথা নাড়লেন গভর্নর। 'না হে, এতদিনে সত্যি বুড়ো হয়েছি। কিন্তু তোমার ব্যাপারটা মনে হয় আলাদা। তুমি বোধহয় ফাউন্টেইন অভ ইয়ুথ-এ প্রায়ই ডুব দিয়ে আসছ। তো সঙ্গের বিশ্ব সুন্দরীর নামটা বলবে না?'

'ও আমার বান্ধবী, পলি মির্জা,' বলল রানা। প্যারিসের বিখ্যাত এক ফ্যাশন-হাউসের ডিজাইন করা ড্রেস পরেছে পলি, নগ্ন কাঁধ ঢেকে রেখেছে দোপাট্টা চাদরে। রানা পরেছে নীল সুতি শর্ট-স্লিভ পোলো শার্ট আর নেভী ব্লু কটন টুইল ট্রাউজার। হালকা, ধূসর রঙের বাস্কেট উইভ জ্যাকেটটা শোল্ডার হোলস্টারে গোঁজা ওয়ালথারটাকে নিখুঁত ভাবেই ঢেকে রেখেছে।

'আমার স্ত্রীকে তোমার মনে আছে তো?' জিজ্ঞেস করলেন গভর্নর, ইঙ্গিতে সুদর্শনা এক প্রৌঢ়াকে দেখালেন। ভদ্রমহিলা ওদের দিকেই এগিয়ে আসছেন। সাদা চুল আর নীল চোখ চকচক করছে।

'হ্যাঁ, অবশ্যই,' বলে তাঁর দিকে ফিরল রানা, জিজ্ঞেস করল, 'কেমন আছেন?'

'ভাল, বাবা,' ভদ্রমহিলা বললেন। 'তোমরা ভেতরে এসো।'

বাহামা কলেজের কাছাকাছি থম্পসন বুলেভার্ডে শতাব্দী-প্রাচীন একটা ম্যানশানে ডিনার পার্টি। ড্রইংরুমে এরইমধ্যে দশ-বারোজন অতিথি পৌঁছেছেন। পাশেই বড়সড় একটা লিভিংরুম, বিশাল বে উইন্ডোর বাইরে বাগান দেখা যাচ্ছে। বাইরেও কিছু অতিথি রয়েছেন, হাতে শ্যাম্পেনের গ্লাস নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। ঘরের ভিতর ধীরে ঘুরছে সিলিং ফ্যান।

সাবেক গভর্নরের বাড়িতে এই প্রথম চোখে পড়বার মত সিকিউরিটি

আয়োজন দেখতে পেল রানা। সাদা স্পোর্টস কোট পরা লম্বা-চওড়া পুরুষ একাধিক প্রবেশপথে পজিশন নিয়েছে। রানা ভাবল, ডিনারে তবে কী কোন ভিআইপি উপস্থিত আছেন, যাঁর এরকম প্রোটেকশন প্রয়োজন?

অচেনা লোকজনের সঙ্গে মিশতে পারা সহজ নয়। তাই রানা আর পলি সবার কাছ থেকে একটু দূরে থাকল, তারপর একসময় বেরিয়ে এল বাগানে। চারদিকে এখনও প্রচুর আলো রয়েছে, রাত নামতে এখনও অন্তত ঘণ্টা দুয়েক বাকি।

হাঁটতে হাঁটতে আউটডোর বার-এর কাছে চলে এল ওরা। এখানে কিছু অতিথিকে দেখে চিনতে পারল রানা; সবাই তাঁরা যে যাঁর ক্ষেত্রে সেরা: একজন আমেরিকান গলফ চ্যাম্পিয়ান, দু'জন বিজনেস টাইকুন, বহুল আলোচিত ব্রিটিশ পেইন্টার জব উডকাটার, হলিউডের ভিলেন কিড পলেমার। তাঁদের সঙ্গে সাবেক গভর্নরকেও দেখা যাচ্ছে। তবে তাঁর মনোযোগ অন্য দিকে।

গভর্নর পনেরো ফুট দূরে হেড সার্ভেন্টের দিকে তাকিয়ে আছেন। লোকটা কালো, মাথায় কাঁচাপাকা চুল, চোখে চশমা। একজন সিকিউরিটি গার্ডের কানে ফিসফিস করছে সে। গার্ড শ্বেতাঙ্গ বডিবিল্ডার, মাথায় সোনালি চুল, মাথা ঝাঁকিয়ে দ্রুত স্থান ত্যাগ করল।

'সব ঠিক আছে তো, ডিক?' জানতে চাইলেন গভর্নর।

'ইয়েস, সার!' জবাব দিল নিগ্রো হেড সার্ভেন্ট। 'বেড়ার বাইরে কে যেন একটা মোটর স্কুটার পার্ক করেছে, মাইককে চেক করতে পাঠালাম।'

'ও। আচ্ছা,' বললেন গভর্নর।

ভদ্রলোককে খানিকটা নার্ভাস আর সন্ত্রস্ত বলে মনে হলো রানার। তাঁর দিকে এগোল ওরা। 'কোন সমস্যা, গভর্নর?'

তিনিও ওদের দিকে এগিয়ে এলেন, মুখে ম্লান হাসি। 'মনে মনে তোমাকে আমি খুঁজছিলাম, রানা। একটা জিনিস দেখাতে চাই, দেখলে হয়তো বুঝতে পারবে সমস্যাটা কী ধরনের। ব্যাপারটা গোপনীয়, দেখতে হলে তোমাকে আমার অফিসে যেতে হবে। কিছু মনে করবে?'

পলির দিকে তাকাল রানা। কাঁধ ঝাঁকাল পলি। 'আমি বেশ আছি,' বলল সে, ট্রেতে সাজিয়ে রাখা খোসা ছাড়ানো বাগদা চিংড়ির দিকে চোখ। 'তুমি যাও। ফিরে এসে আশপাশেই পাবে আমাকে।'

মৃদু চাপ দিয়ে পলির হাতটা ছেড়ে দিল রানা, গভর্নরের পিছু নিয়ে ফিরে এল বাড়ির ভিতর। পালিশ করা কাঠের পেঁচানো সিঁড়ি বেয়ে তিনতলায় উঠতে হলো। স্টাডিতে ঢুকে দরজাটা বন্ধ করে দিলেন গভর্নর।

'আপনাকে বেশ রহস্যময় লাগছে,' বলল রানা। 'কৌতূহলে মরে যাচ্ছি আমি।'

ডেস্কের পিছনে থেমে একটা দেরাজ খুললেন গভর্নর। 'এখন বলা যায়, রানা। আমি একটা বিপদেই পড়েছি,' বললেন তিনি। 'তোমার পরামর্শ চাই।'

ভদ্রলোক রীতিমত ঘাবড়ে গেছেন। রানা দৃঢ়কণ্ঠে আশ্বস্ত করল, 'হ্যাঁ, অবশ্যই।'

'এদের সম্পর্কে আগে কখনও কিছু শুনেছ?' ওর সিনিয়র বন্ধু জানতে

চাইলেন, তারপর ওর হাতে ধরিয়ে দিলেন স্বচ্ছ প্লাস্টিকে মোড়া একটা কাগজ আর সোনার একটা চাকতি। মোড়ক থেকে বের করে কাগজটা দেখল রানা, মাঝখানে কমপিউটার কম্পোজে লেখা–'সময় শেষ'। এরপর সোনার চাকতিটা পরীক্ষা করল রানা। দু'পিঠেই একজোড়া হাত খোদাই করা রয়েছে। করমর্দনের ছবি। নীচের দিকে ইংরেজি ক্যাপিটাল লেটারে লেখা: গ্রুপ অভ মার্সেনারি।

'হ্যাঁ, নামটা ইদানীং কানে আসছে,' বলল রানা। 'এটা ক্রিমিন্যালদের নতুন একটা সিন্ডিকেট। তবে এদের সম্পর্কে প্রায় কিছুই আমি জানি না।'

'লোকাল পুলিশকে এখনও কিছু জানাইনি আমি,' গভর্নর বললেন। 'তবে এরই মধ্যে লন্ডনে রিপোর্ট করেছি। ওখান থেকে এখনও কোন উত্তর আসেনি।'

'এই মেসেজ–"সময় শেষ"–এটা কী আপনাকে পাঠানো হয়েছে?' জানতে চাইল রানা।

মাথা ঝাঁকালেন গভর্নর। 'স্পেনের এক লোক বেশ মোটা একটা টাকা পাবে আমার কাছে। তার সঙ্গে ব্যবসাটা ছিল রিয়েল এস্টেটের, ঠিক···বৈধ বা আইনসম্মত বলা যায় না–দুঃখিত। যাই হোক, এই মার্সেনারি গ্রুপের কাছ থেকে প্রথম চিঠিটা পাই আমি দু'মাস আগে। তাতে বলা হয়েছিল টাকা পরিশোধ করার জন্যে আমার হাতে আর দু'মাস সময় আছে।

'কিন্তু টাকা না দেওয়ার সিদ্ধান্তে অটল থাকি আমি, কারণ প্রথমত লোকটা আমার সঙ্গে প্রতারণা করতে গিয়ে ধরা পড়ে যায়, দ্বিতীয়ত যে টাকাটা সে আমার কাছে পাবে ঠিক সেই অঙ্কের টাকা আমার লোকসান হয়েছে ব্যবসাটা শেষ পর্যন্ত পুরোপুরি না হওয়ায়। তারপর এই চিঠিটা পেলাম, আজ থেকে চারদিন আগে। এরা কারা, রানা? মাফিয়ার নতুন সংস্করণ?'

'মাফিয়ার চেয়ে আলাদা কিছু নয়, তবে ওদের চেয়ে আরও অনেক বেশি আন্তর্জাতিক। আমার এজেন্সি সবে মাত্র ওদের তৎপরতা সম্পর্কে খোঁজ-খবর করেছে। শুধু এইটুকু জানা গেছে যে অত্যন্ত সিরিয়াস একদল মার্সেনারিদের জোট ওটা, যে-কোন ব্যক্তি বা সরকারের হয়ে ভাড়া খাটে।'

'কতদিন হলো এই ব্যবসায় নেমেছে ওরা?'

'বেশিদিন নয়। বোধহয় তিন বছর।'

'আমি কখনও এদের নাম শুনিনি। এরা কী সত্যি বিপজ্জনক?'

চিঠি আর সোনার চাকতিটা গভর্নরকে ফিরিয়ে দিল রানা। 'বিপজ্জনক কিনা আপনিই বিবেচনা করুন। পেন্টাগন থেকে কিছু সামরিক ম্যাপ চুরি গেছে, হাইলি ট্রেইন্ড সিকিউরিটি অফিসারদের নাকের ডগা থেকে। ম্যাপের জায়গায় পাওয়া গেছে এরকম একটা সোনার চাকতি। বছরখানেক আগে কড়া পাহারা থাকা সত্ত্বেও সিসিলিতে খুন হয়ে গেছে একজন মাফিয়া ডন। সেখানেও ওই চাকতি ছিল। সম্প্রতি ওরা এক ফরাসী রাজনীতিককে ব্ল্যাকমেইল করে বাগিয়ে নিয়েছে আশি মিলিয়ন ফ্রাঙ্ক। সর্বশেষ গুজব হলো, মার্সেনারি গ্রুপ সামরিক গোপন তথ্য সংগ্রহ করে বিভিন্ন দেশে বিক্রি করাটাকেই সবচেয়ে বেশি লাভজনক বলে গণ্য করছে। বোঝাই যায়, কোন একটা দেশ বা রাষ্ট্রের প্রতি ওদের আনুগত্য বা পক্ষপাতিত্ব নেই। মূল লক্ষ্য টাকা কামানো, সেজন্যে যত খুশি নির্মম হতে বাধে

না।'

গভর্নর এতক্ষণে বসলেন। ভীষণ উদ্বিগ্ন। 'বুঝলাম, খুবই বিপজ্জনক ওরা। কিন্তু কে ওদেরকে চালাচ্ছে? ওদের ঘাঁটিটা কোথায়?'

'এ-সব কিছুই এখনও আমরা জানি না।'

শুকনো একটা ঢোক গিললেন সাবেক গভর্নর। 'পরামর্শ দাও। কী করব আমি?'

'বাড়ির চারদিকে অতিরিক্ত প্রোটেকশন খেয়াল করেছি আমি। গুড ডিসিশান।'

গভর্নরকে দিশেহারা দেখাল। 'চারদিকে এত বেশি গার্ড, কাকে কোথায় দায়িত্ব দেয়া হয়েছে মনে রাখা ভীষণ এক ঝামেলা।'

'আমি ইন্টারপোলকে সতর্ক করে দিচ্ছি, দেখি চিঠিটা ওরা ট্রেস করতে পারে কিনা। যদিও কাজটা খুব কঠিন। কাল আমি আমার এজেন্সির লন্ডন শাখায় রিপোর্ট করব, দেখা যাক সার্ভেইলান্সের কী ব্যবস্থা করতে পারে। প্রায় নিশ্চিতভাবে ধরে নেয়া চলে যে আপনার ওপর নজর রাখছে ওরা। হয়তো আপনার ফোনও ট্যাপ করছে।'

'গুড গড।'

'আপনি বললেন লোকাল পুলিশকে কিছু জানাননি।'

'না।'

'এখনি না জানানোই ভাল বলে মনে করি আমি। শোনা যায়, ল এনফোর্সমেন্ট অর্গানাইজেশন-এর নীচের স্তরে অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে অনুপ্রবেশ করে গ্রুপ অভ মার্সেনারি। কাল চলুন গভর্নমেন্ট হাউসে গিয়ে একটা অফিশিয়াল রিপোর্ট ফাইল করি। ঘটনাটা আমাকে জানিয়ে খুব ভাল করেছেন আপনি। এই গ্রুপ সম্পর্কে প্রচুর তথ্য সংগ্রহ করতে হবে আমাদের।'

'ধন্যবাদ, রানা। জানতাম তোমার ওপর ভরসা করা যায়।' দাঁড়ালেন তিনি, তবে মুখ থেকে সব রক্ত নেমে গেছে। 'চলো, পার্টিটা আবার ধরি।'

'আপনাকে যতটা সম্ভব সাবধানে থাকতে হবে,' বলল রানা। 'কোন রকম ঝুঁকি নিতে যাবেন না।'

স্টাডি থেকে বাইরে বেরিয়ে এল ওরা। একটা পাথুরে বেঞ্চে একা বসে রয়েছে পলি, ফুল গাছের উপর দিয়ে তাকিয়ে আছে বাড়িটার দিকে। রানাকে দেখে মিষ্টি করে হাসল। 'কাজ করছ, গোয়েন্দা সাহেব? আমি ভেবেছিলাম আমরা ছুটিতে এসেছি।'

'ছুটিতেই আছি। সামান্য একটু প্রফেশন্যাল অ্যাডভাইস দিলাম আর কি।'

বাহামার ঐতিহ্য ধরে কনচ চাউডার অর্থাৎ বড় জাতের শামুক দিয়ে তৈরি সুপ, পাঁচ রকম ডাল সহযোগে খিচুড়ি, বাহামীয় লবস্টার, সাদা ওয়াইনে ডুবিয়ে সেদ্ধ করা রুই মাছের ফালি, ক্রীম আর সরষের সসের উপর সজানো শ্রিম্প, পাইনআপেল স্প্রিং রোলস, সঙ্গে ডেজার্ট হিসাবে হিমসাগর আম আর আইসক্রিম।

পরে বাগানে ফিরে এসে তারকাখচিত রাতের আকাশ দেখা। আশপাশে আরও দু'এক জোড়া কপোত-কপোতী। নিঃসঙ্গ দু'একজন পুরুষ চাকরদের ডেকে সিগার চাইল। নির্জনতার খোঁজে পলিকে নিয়ে বাগানটাকে ঘিরে থাকা সরু পথ ধরে হাঁটছে রানা। এদিকে আলো বেশি না থাকায় ওদেরকে খুব কম মানুষই দেখতে পাচ্ছে।

বড় একটা নিঃশ্বাস ছেড়ে পলি বলল। 'এখান থেকে আমি ফিরতে চাই না।'

'সব ভাল জিনিসই এক সময় শেষ হয়।'

'যেমন মেয়েরা তোমাকে পেয়েও হারায়?'

'আমার প্রসঙ্গ থাক।'

'আমি তোমার প্রসঙ্গে কিছু বলিনি তো। আমি কয়েকজন অভাগিনীর কথা বলছি।'

'তথাকথিত সেই অভাগিনীর দলে তো আর তুমি পড়ো না! তাই না?' হাসি চেপে জানতে চাইল রানা।

'আমার দুর্ভাগ্য আরও গভীর। হারাব কী, তোমাকে আমি পেলাম কবে?'

'পাও না, পাও আমাকে! কে বাধা দিচ্ছে?' বলে পলিকে ধরে নিজের দিকে ঘোরাল রানা। চুমো খেতে যাবে, ওর কাঁধের উপর দিয়ে পিছনে তাকাল পলি, সঙ্গে সঙ্গে আতঙ্কে বিস্ফারিত হয়ে উঠল চোখ জোড়া। 'রানা!'

পলিকে ছেড়ে দিয়ে বন করে ঘুরল রানা, হাত পৌঁছে গেছে হোলস্টারে গোঁজা ওয়ালথারের বাঁটে। সরু পথের ঠিক পাশেই, ঘাসের উপর একজন লোক পড়ে রয়েছে। গাঢ় ছায়া পুরোটাই ঢেকে রাখত, ফর্সা চামড়ায় চাঁদের ম্লান আলো প্রতিফলিত হওয়ায় তা সম্ভব হয়নি। তাড়াতাড়ি তার পাশে সরে এসে ঝুঁকল রানা। না, পালস্ নেই। লাশটা চিনতেও পারল ও। এর নাম মাইক, সিকিউরিটি গার্ড। তার শার্ট আর সাদা জ্যাকেট খুলে নেওয়া হয়েছে, গলাটা কাটা হয়েছে এক কান থেকে আরেক কান পর্যন্ত। রক্ত এখনও পুরোপুরি জমাট বাঁধেনি, সেই রক্তের উপর পড়ে আছে সে!

'মানুষজনের মধ্যে চলে যাও, পলি, জলদি!' পলিকে নির্দেশ দিয়েই লন ধরে ছুটল রানা।

ছুটতে ছুটতে বাড়িটার পিছনদিকে চলে এল ও, হন্যে হয়ে গভর্নরকে খুঁজছে। তাঁকে নয়, তাঁর স্ত্রীকে দেখতে পেল ও, কয়েকজন অতিথির সঙ্গে গল্প করছেন।

'গভর্নর কোথায়?' তাগাদার সুরে জানতে চাইল রানা।

চমকে উঠে ভদ্রমহিলা জবাব দিলেন, 'কেন...আমি তো বোধহয় তাকে একজন সিকিউরিটি গার্ডকে নিয়ে ওপরতলার অফিসে যেতে দেখলাম।'

সঙ্গে সঙ্গে ঘুরল রানা, এক ছুটে বাড়ির ভিতর ঢুকল, প্রতিবার তিনটে করে ধাপ টপকে সিঁড়ি ভেঙে খোলা দরজার সামনে এসে থমকে দাঁড়াল। সাবেক গভর্নর তাজা লাল রক্তের উপর শুয়ে আছেন। গার্ড মাইকের মত তাঁর গলাও কাটা হয়েছে। কামরার ভিতর আর কেউ নেই, তবে রক্ত মাখা একজোড়া পায়ের ছাপ দরজার দিকে এগিয়ে এসেছে। চৌকাঠ পেরোবার ঠিক আগে, কার্পেটের উপর

ঘষে ঘষে জুতোর রক্ত মুছেছে খুনী।

ইতিমধ্যে অন্যান্যরা সিঁড়ি বেয়ে উঠতে শুরু করেছে। রানা বাধা দিতে ব্যর্থ হলো, উঁকি দিয়ে বীভৎস দৃশ্যটা দেখে ফেললেন গভর্নরের স্ত্রী। রানা তাঁকে ধরে সরিয়ে আনছে, তিনি সবাইকে চমকে দিয়ে আর্তনাদ করে উঠলেন। এক হাতে দরজাটা বন্ধ করে দিল রানা। দু'জন চাকরকে ডেকে ভদ্রমহিলার উপর খেয়াল রাখতে বলল ও। এক ভদ্রলোককে অনুরোধ করল পুলিশকে ফোন করতে। তারপর তাড়াতাড়ি দোতলায় নেমে এসে হতভম্ব হেডসার্ভেন্টকে সামনে পেয়ে জিজ্ঞেস করল, 'সিঁড়ি বেয়ে কোন গার্ডকে নামতে দেখেছ?'

'ইয়েস, সার!' জবাব দিল ডিক। 'কিচেনের ভেতর দিয়ে এই তো বেরিয়ে গেল।'

'ওদিক দিয়ে কি মোটর স্কুটারটার কাছে পৌঁছানো যাবে? আগে যেটা তুমি দেখেছিলে?'

দ্রুত মাথা ঝাঁকাল ডিক। পথ দেখিয়ে রানাকে কিচেনে নিয়ে এল সে। বিরাট ভোজের পর একদল চাকরবাকর ধোয়াধুয়ির কাজে অত্যন্ত ব্যস্ত। করিডরে বেরিয়ে এসে শেষ মাথার খোলা দরজাটা রানাকে দেখিয়ে দিল ডিক।

'ওটাই চাকরবাকরদের আসা-যাওয়ার পথ,' বলল সে। 'গেট দিয়ে বেরিয়ে বাম দিকে বাঁক নেবেন। রাস্তা ধরে সামান্য হাঁটলেই জায়গাটা।'

'আমার গার্লফ্রেন্ডকে বাড়ির ভেতর অপেক্ষা করতে বলো,' দরজা দিয়ে বেরোবার সময় বলল রানা।

ছোট্ট একটা পার্কিং এরিয়ায় বেরিয়ে এসেছে রানা, শুধু চাকরবাকরদের জন্য আলাদা করা। খোলা গেটটা দিয়ে রাস্তায় চলে এল ও। আরে, ঠিকই তো! গার্ডের সাদা কোট পরা একজন নিগ্রো পুরানো একটা ভেসপা মোটর স্কুটারে বসে রয়েছে। স্টার্ট দেওয়া হয়ে গেছে, এবার রওনা হবে সে।

'স্টপ!' নির্দেশ দিল রানা। ঘাড় ফিরিয়ে রানাকে দেখেই ভেসপা ছেড়ে দিল লোকটা। হোলস্টার থেকে আগেই বেরিয়ে এসেছে ওয়ালথারটা, তুলেই গুলি করল রানা। কিন্তু লাগাতে পারল না। এখন দৌড়ে লোকটাকে ধাওয়া করা ছাড়া উপায় নেই।

লোকটা ওর প্রায় সিকি মাইল সামনে চলে গেছে। থম্পসন বুলেভার্ডের ব্যস্ত ট্র্যাফিকের ভিতর দিয়ে উত্তর দিকে যাচ্ছে সে। ছুটে রাস্তায় বেরিয়ে এসে একটা বাসের সামনে পড়ে গেল রানা, ওই একই দিকে যাচ্ছে। ড্রাইভার অকস্মাৎ চাপ দিল ব্রেকে, ফলে আরোহীদের অনেকেই ছিটকে পড়ল মেঝেতে। তারপরও বাসটা এত জোরে আঘাত করল যে প্রায় উড়ে গিয়ে ফুটপাতে পড়ল রানা। তবে লাফ দিয়ে তখনি আবার সিধে হলো, শরীরটা একবার ঝাঁকিয়ে নিয়ে আবার ভেসপা লক্ষ্য করে ছুটল।

মিডো স্ট্রীট পার হয়ে সেন্ট বার্নাড'স পার্কে ঢুকল ভেসপা, সেন্ট জোসেফ'স ব্যাপ্টিস্ট চার্চকে মাঝখানে রেখে চক্কর দিচ্ছে। লাফ দিয়ে একটা বিএমডব্লিউ-এর হুডে পড়ল রানা, শরীরটাকে গড়িয়ে দিয়ে উল্টোদিকে নেমে দেখল খুনী এক দোকানদারের টঙঘরে ধাক্কা খেল। পার্কের এক কোণে ওটা, সরু পথের উপর

ছড়িয়ে পড়ল টি-শার্ট আর নানা ধরনের সুভেনিয়ার। খেপে উঠে ঘুসি পাকাল দোকানদার, চিৎকার করে অভিশাপ দিচ্ছে। ভেসপা গাছপালার আড়ালে হারিয়ে গেল।

রাস্তায় প্রচুর আলো ছিল, কিন্তু পার্ক প্রায় অন্ধকার। খুব হাঁপাচ্ছে রানা, তবে এখনও ছুটছে। ওর কী গুলি করবার ঝুঁকি নেওয়া উচিত? প্রায় ত্রিশ ফুট সামনে স্কুটারের টেইল লাইট দেখতে পাচ্ছে ও। লোকটাকে মেরে ফেলা ওর ইচ্ছে নয়। মার্সেনারি গ্রুপের সঙ্গে জড়িত হলে তাকে জীবিত ধরতে পারাটা অত্যন্ত জরুরী।

একটা বাঁক ঘুরে সরল বিস্তৃতি ধরল ভেসপা। এটাই শেষ সুযোগ, এখন যদি ওটাকে থামানো না যায় স্পিড তুলে ধরাছোঁয়ার বাইরে চলে যাবে খুনী। সাবধানে টেইল লাইটে লক্ষ্যস্থির করল রানা, একবারই টান দিল ট্রিগারে।

পিছনের চাকায় লাগল বুলেট, কাত হয়ে পড়া স্কুটার হড়কে পেভমেন্টের কিনারায় গিয়ে ধাক্কা খেল। খুনী ছিটকে পড়েছে, ব্যথাও পেয়েছে খুব, তবে তখনি সিধে হয়ে খোঁড়াতে খোঁড়াতে ছুটল, হাত দিয়ে একটা পা ধরে আছে। খুব বেশি দূর যেতে পারবে না সে।

তারপরও পার্কের পশ্চিম প্রান্তে পৌঁছে গেল লোকটা, রাস্তায় বেরিয়ে ঢুকে পড়ল আবাসিক এলাকায়। রানা তার পিছু ছাড়ছে না। রাস্তা পেরোবার সময় একটা ট্যাক্সির সঙ্গে ধাক্কা খেতে যাচ্ছিল, চরকির মত ঘুরে পড়ে গেল শক্ত পিচের উপর। সময় নষ্ট করতে রাজি নয়, লাফ দিয়ে সিধে হয়েই ছুটল আবার। ত্রিশ ফুট দূরে খুনীকে পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে ও।

'স্টপ!' আবার গর্জে উঠল রানা।

ঘুরল লোকটা। তার হাতে কী যেন একটা আছে বলে মনে হলো। আলোর একটা ঝলক, তার সঙ্গে গুলির আওয়াজ রানাকে বাধ্য করল রাস্তার উপর শরীরটাকে গড়িয়ে দিতে। সশস্ত্র লোকটাকে জীবিত ধরবার আশা উবে যাচ্ছে।

নিজের পায়ে আবার দাঁড়াবার পর রানা দেখল ওর শিকার অদৃশ্য হয়ে গেছে। সামনে একজোড়া গলি দেখা যাচ্ছে, দুটোর যে-কোন একটায় যেতে পারে সে। ছুটে এসে এক কোণে দাঁড়িয়ে একটার ভিতর উঁকি দিল রানা। ছুটন্ত পায়ের আওয়াজ ফাঁস করে দিল সব। দেয়াল ঘেঁষে এবার রানাও ছুটল। তারপর শেষ মাথায় দেখতে পেল লোকটাকে, কানাগলিতে আটকা পড়েছে। ডাস্টবিনের আড়ালে গা ঢাকা দিল রানা।

'ধরা দাও!' গলা চড়িয়ে বলল রানা। 'তুমি হেরে গেছ। হাতের পিস্তল ছুঁড়ে দাও এদিকে।'

ঘাড় ফিরিয়ে আওয়াজটার দিকে তাকাল লোকটা। চোখ দুটো বিস্ফারিত হয়ে আছে। গুলি করল আন্দাজে, টার্গেট দেখতে পাচ্ছে না। গলির দেয়ালে লেগে আরেক দিকে ছুটে গেল বুলেটটা।

কী ঘটেছে রানার কাছে এখন পরিষ্কার। বেড়া টপকে গার্ড মাইককে খুন করে লোকটা, তার শার্ট আর জ্যাকেট খুলে নিজে পরে। নকল একজন সিকিউরিটি গার্ড সেজে গভর্নরকে কিছু একটা বলে বাড়ির ভিতর নিয়ে যায় সে।

'আমি তিন পর্যন্ত গুণব,' বলল রানা। 'এর মধ্যে পিস্তল ছুঁড়ে দাও, মাথার ওপর হাত তোলো। আমি তোমার মাথা দেখতে পাচ্ছি, ইচ্ছে করলেই গুলি লাগাতে পারব।'

গলার আওয়াজ লক্ষ্য করে পিস্তল তুলল লোকটা। আরেকটা গুলি হলো। এই বুলেটটা ডাস্টবিনের গায়ে একটা ফুটো তৈরি করল।

'এক–'

লোকটা ইতস্তত করছে, কী করবে সিদ্ধান্তে আসতে পারছে না। তবে জানে যে পালানোর পথ বন্ধ।

'দুই–'

হঠাৎ অদ্ভুত সুরে হেসে উঠল খুনী।

'আমাকে তুমি জ্যান্ত ধরতে পারবে না, মিস্টার!' বলল সে, স্পষ্ট ওয়েস্ট ইন্ডিজের বাচনভঙ্গি। তারপরই পিস্তলের মাজল চেপে ধরল নিজের কপালে।

'না!' মানা করল রানা। 'এই, না!'

ট্রিগার টেনে দিল লোকটা। বদ্ধ গলির ভিতর ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত বজ্রপাতের মত শোনাল আওয়াজটা।

দুই

লর্ড লিফটন গলফ ক্লাবটা ইংল্যান্ডের দক্ষিণে, ইটন আর উইন্ডসোর-এর কাছাকাছি জায়গাটার নাম বাকিংহামশায়ার। প্রায় দশ বছর হলো এই ক্লাবের সদস্য রানা। গলফ খুব কমই খেলে ও, ওকে আকর্ষণ করে ক্লাবহাউসের পাবলিক আর প্রাইভেটরুম, পরিচ্ছন্ন ডাইনিং হল, বিনয়ী ও দক্ষ স্টাফ, চমৎকার রান্না আর ইনডোর গেমসের আয়োজন। গলফ কোর্স ছাড়াও চোখ জুড়ানো বাগিচা আর পার্ক আছে এখানে, আছে সুইমিংপুল ছাড়াও বেশ বড় একটা লেক।

পুরানো কিছু ইংরেজ বন্ধুর সঙ্গে আধবেলা গলফ খেলে ক্লান্ত আর একঘেয়ে বোধ করছে রানা, এই সময় না চাইতেই বৃষ্টির মত হঠাৎ উদয় হয়ে ওকে উদ্ধার করল সোহেল আহমেদ, ওর প্রাণপ্রিয় বন্ধু। খেলবার সরঞ্জাম ব্যাগে ভরে একজন স্টাফকে ধরিয়ে দিল ও। সোহেলকে নিয়ে ক্লাব হাউসে ফিরছে।

লবিতে ঢুকে সিঁড়িটাকে পাশ কাটাল ওরা, বার-এ ঢুকে এক কোণে একটা টেবিলে গিয়ে বসল। 'আমার ক্লাব, কাজেই আমি অর্ডার দিচ্ছি,' বলে ওয়েটারের দিকে ফিরে দুটো বিয়ার চাইল রানা।

বাহামা থেকে লন্ডনে এসেছে রানা আজ সাতদিন। গভর্নরের হত্যাকাণ্ড ওদের আনন্দময় ছুটিকে শুরু হতে না হতে নষ্ট করে দিয়েছে। লন্ডনে ফিরেই জরুরী কাজের চাপে সাজ্ঘাতিক ব্যস্ত হয়ে পড়েছে পলি। তবে রানার কাছ থেকে কথা আদায় করে নিয়েছে, সময় পেলেই আবার একসাথে হবে ওরা।

'গ্রুপ অভ মার্সেনারিকে নিয়ে তোর রিসার্চ কেমন এগোচ্ছে?' জানতে চাইল সোহেল।

'আজ রোববার ছুটির দিনও আমাকে কাজ নিয়ে কথা বলতে হবে?' রানার গলায় ঝাঁঝ।

'দুঃখিত।'

'না, আমি দুঃখিত, দোস্ত,' বলল রানা। 'কী যে হয়েছে, মেজাজ ঠিক রাখতে পারছি না। গভর্নর পুরানো একজন শুভানুধ্যায়ী ছিলেন, তিনি খুন হলেন; তারপর খুনী নিজের মাথায় গুলি করল...এই রহস্যের মাথামুণ্ডু কিছুই আমি বুঝতে পারছি না।'

'আমি প্রচুর তথ্য নিয়ে এসেছি—বস্ পাঠিয়েছেন—কাল অফিসে গেলে তোর কমপিউটারে পাবি সব।'

এই সময় বারে দু'জন লোক ঢুকল। মুখ তুলে তাকাল রানা, সঙ্গে সঙ্গে গম্ভীর হয়ে উঠল চেহারা। দু'জনের মধ্যে লম্বা লোকটা রানা আর সোহেলকে দেখতে পেল, নাটকীয় ভঙ্গিতে থেমে স্যালুট করল ওদেরকে।

'ওহ্‌হো! কী সাংঘাতিক! আমি মাসুদ রানা আর সোহেল আহমেদকে দেখছি না তো?'

'মন্টি বেলফোর,' কৃত্রিম উৎসাহ দেখিয়ে বলল রানা। 'লং টাইম।'

গ্রুপ ক্যাপটেন মন্টি বেলফোর অত্যন্ত সুদর্শন। তার কাঁধ দুটো অস্বাভাবিক চওড়া। ছ'ফুট এক ইঞ্চি লম্বা। মাথায় ঝলমল করছে ছোট করে ছাঁটা প্রায় সোনালি চুল। একই রঙের পুরু গোঁফ উপরের ঠোঁট ঢেকে রেখেছে। চোখ দুটো ঠাণ্ডা নীল। আবহাওয়া-লাঞ্ছিত চেহারা, তাকালেই বোঝা যায় রোদ-বৃষ্টি-ঝড় মাথায় করে দীর্ঘ দিন বাইরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। চোয়াল দুটো চৌকো আর শক্ত। শারীরিক গঠন রানার মতই, বয়সও প্রায় এক।

ওদের টেবিলের দিকে এগিয়ে আসবার সময় ডান হাতটা বাড়িয়ে ধরল বেলফোর। রানার হাতটা গায়ের জোরে পিষল সে, এম আর নাইনকে ওদের চির-প্রতিদ্বন্দ্বিতার কথা মনে করিয়ে দিল।

'কেমন আছ, রানা?' জিজ্ঞেস করল বেলফোর।

'ভাল,' রানার সংক্ষিপ্ত উত্তর।

'কী জানি কী করে ভাল থাকো,' বিদ্রূপের সুরে কথাটা বলে কৃত্রিম একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল বেলফোর। 'ব্রিটিশ সিক্রেট সার্ভিস তো শুনি নামকাওয়াস্তে উপদেষ্টা বানিয়ে রেখেছে তোমাকে।'

নিঃশব্দে হাসল রানা। 'ওটা আমার অনারারি পোস্ট, ইডিয়েট!'

'হাঃ-হা! বেতনও তাহলে দেয় না?'

'কেন দেবে? আমি তো কাজ করি না, কেবল বুদ্ধি দিই।'

'কী বুদ্ধি?' ভুরু কুঁচকাল মন্টি বেলফোর।

'কী করে তোমাদের মধ্যে থেকে বেইমানগুলোকে খুঁজে বের করা যায়, সেই বুদ্ধি।'

একটু যেন থমকে গেল বেলফোর। তারপর টিটকারীর হাসি হাসল। বলল, 'তোমার বোলচাল আর কমল না, রানা। চাপা পিটিয়েই ভাবছ পার হয়ে যাবে ভবের নদী।'

বেলফোরের সঙ্গের ভদ্রলোক পিছন থেকে সামনে চলে এলেন। বয়স এখনও চল্লিশ পেরোয়নি। ছোটখাট মানুষ, রোগা, চোখে চশমা। নাকটা খাড়া, ভুরু খুব ঘন। খেয়াল করে দেখলে পাখির সঙ্গে চেহারার মিল খুঁজে পাওয়া যাবে।

'ইনি হচ্ছেন আমার পার্টনার, ডক্টর হিউগো ভেনিনি,' বলল বেলফোর। 'কমনওয়েলথ ডিফেন্স অ্যান্ড রিসার্চ ফ্যাসিলিটিজ-এ আছেন। ডক্টর ভেনিনি, আপনার সামনে মাসুদ রানা আর ওর বন্ধু সোহেল আহমেদ উপস্থিত।'

'আপনি বিএসএস-এর সঙ্গে আছেন? সত্যি ? হাউ ডু ইউ ডু!' রানার সঙ্গে অত্যন্ত উষ্ণ করমর্দন করলেন ডক্টর ভেনিনি।

পরিচয় পর্ব শেষ হতে সোহেল জানতে চাইল, 'তোমরা কি আমাদের সঙ্গে বসবে, মন্টি? তাহলে ড্রিঙ্ক দিতে বলি।'

ডক্টর ভেনিনি আর বেলফোর চেয়ার টেনে বসল।

'তুমি বোধহয় জানো না। না, কি করে জানবে।' মাথা নাড়ছে বেলফোর। রানাকে প্রশ্ন করবার সময় দিয়ে চুপ করে থাকল সে।

রানা তার সস্তা নাটকীয় আচরণের এ-টু-জেড সব জানে, কাজেই চুপ করে থেকে তাকে বিব্রত করবার সুযোগটা হাত ছাড়া করল না।

অবশেষে বাধ্য হয়ে আবার নিজের কথার খেই ধরে মুখ খুলতে হলো বেলফোরকে। 'আমি রয়্যাল এয়ারফোর্স-এর তরফ থেকে সিডিআরএফ-এর একটা প্রজেক্টে লিয়েইজন অফিসার হিসাবে দায়িত্ব পালন করছি। ডক্টর ভেনিনি কমনওয়েলথ ডিফেন্স রিসার্চ ফ্যাসিলিটিজের অ্যারোনটিক্স ডিভিশনে আছেন। ওদের টপ ইঞ্জিনিয়ার। ওখানে উনি যা করেন তার প্রায় সবই ক্লাসিফায়েড।'

'আমাদেরকে বলতে পারো। কাকপক্ষীও টের পাবে না,' বলল রানা।

'এমনিতেই তোমরা খুব শিগ্‌গির জানতে পারবে, আমার ধারণা। তাই না, ডক্টর?'

জিন আর টনিকে চুমুক দিচ্ছিলেন ডক্টর ভেনিনি। 'উম্‌ম্? ওহ্, হ্যাঁ, তাই। খেলাধুলো শেষ করে হককে অবশ্যই একটা ফোন করতে হবে আমার। আমরা প্রায় উতরে গেছি।'

'উতরে গেছ কিসে?' বেলফোরকে জিজ্ঞেস করল রানা।

'তোমরা জানো না,' এবার বেলফোর সোহেলের দিকেও চট করে একবার তাকাল, 'তবে আমার ধারণা তোমাদের বস্ নিশ্চয়ই খবর রাখেন।'

'একটু আভাস দিতে পারো না?' এই প্রথম মুখ খুলল সোহেল।

বেলফোরের চৌকোমুখে চওড়া হাসি ফুটল। 'সাজিদুল হকের নাম শুনেছ?

'কেন শুনব না। উনি পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ অ্যারোনটিক্স ফিজিসিস্ট।'

সাজিদুল হকের নাম শুনে এবার মাথা ঝাঁকাল সোহেলও। 'হ্যাঁ, ব্যাপারটা জানি আমরা, মন্টি। শুধু জানতাম না যে তুমি এর সঙ্গে জড়িত।'

'এই প্রজেক্টকে আমি জীবনের চেয়েও বড় করে দেখি,' সগর্বে বলল বেলফোর।

কার প্রজেক্ট, কী নিয়ে, জীবনের চেয়ে বড় করে দেখবার অধিকার কারও আছে কিনা ইত্যাদি অনেক প্রশ্ন ভিড় করে এল রানার মনে। তবে ঝামেলা চায় না

বলে চুপ করেই থাকল।

'ডক্টর সাজিদুল হক আমার বস্,' বললেন ডক্টর ভেনিনি।

গুরুত্বটা অনুধাবন করছে রানা। ডক্টর সাজিদুল হকের মত মহীরুহের সঙ্গে কাজ করতে হলে খুলির ভিতর প্রচুর পরিমাণে হলুদ পদার্থ থাকতে হবে। দেখে যা-ই মনে হোক, ডক্টর ভেনিনি নিশ্চয়ই প্রতিভাবান মানুষ। তবে মন্টি বেলফোরকে রানা কখনোই খুব একটা গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করেনি। তার গ্রেট-গ্র্যান্ডফাদার একজন পর্তুগীজ ছিলেন, বিয়ে করেন ধনাঢ্য এক ইংলিশ মিলিটারি ফ্যামিলিতে।

'হাতে আজ আমার প্রচুর সময়,' রানাকে বলল বেলফোর। 'যে-সব খেলায় তোমাকে আমি সেই অক্সফোর্ডে হারিয়েছি, এসো, আজও একবার করে হারিয়ে রেকর্ডগুলো ঠিক রাখি। রাজি?'

'আগে মনে করিয়ে দাও কী কী খেলায় তোমার কাছে হেরেছি আমি,' রানার কণ্ঠস্বরে চ্যালেঞ্জ।

'প্রথমে ধরো দাবা...'

'সবাই জানে প্রথম বছর আমি চ্যাম্পিয়ান হয়েছিলাম। পরের বছর প্রতিযোগিতায় নাম লেখাইনি, চ্যাম্পিয়ান হয়েছিল সোহেল। তুমি আমাদের ধারেকাছেও ছিলে না।'

'আমি টুর্নামেন্টের কথা বলছি না।'

'ও। হ্যাঁ, প্র্যাকটিস ম্যাচে তোমাকে আমরা মাঝেমধ্যে জিততে দিতাম, কারণ জিতলেই তুমি আমাদেরকে গাঁটের পয়সা খরচ করে সাপার খাওয়াতে।'

'এখন তুমি যদি এভাবে হেরেও হার স্বীকার না করো, আমার কিছু বলার নেই। জানি তাসের কথা তুললেও তুমি বলবে...'

'না, তাসে তোমার সঙ্গে কখনোই আমি জিততে পারিনি,' স্বীকার করল রানা। 'কারণ প্রতিবার চুরি করতে তুমি।'

'জানতাম, এ-কথাই বলবে তুমি।' হাসছে বেলফোর, এতটুকু অপ্রতিভ নয়। 'আর সাঁতারে?'

'দশবারে তুমি যদি চারবার জিতে থাকো, আমি জিতেছি ছ'বার।'

'ঘোড়দৌড়ে?'

'তুমি যদি ছ'বার জিতে থাকো তো আমিও চারবার জিতেছি।'

নাটকীয় ভঙ্গিতে গোঁফে মোচড় দিল বেলফোর। 'আর মাউন্টিনিয়ারিঙ-এ?'

'ইক্সকারশানে গিয়ে মাত্র দু'বার আমরা পাহাড়ে চড়েছিলাম। হ্যাঁ, দু'বারই আমাকে অনেক পিছনে ফেলে চূড়ায় উঠেছিলে তুমি। কিন্তু রাইফেল শূটিং-এ প্রতিবার প্রথম হয়েছি আমি।'

'আমি দ্বিতীয়,' বলল সোহেল। 'বেলফোর তৃতীয়।'

পাহাড়ে চড়বার প্রসঙ্গটা ধরে রাখতে চেয়ে বেলফোর বলল, 'হিমালয়টা তোমাদের, অথচ কখনও শুনিনি ওটায় উঠবার চেষ্টা করেছ তুমি। আমি এভারেস্ট জয় করেছি, রানা। একবার নয়, দু'বার।'

'কংগ্রাচুলেশন্স, মন্টি—অবশ্য কথাটা যদি সত্যি হয় আর কি।'

'বোঝা গেল এক সময় গভীর বন্ধুত্ব ছিল আপনাদের মধ্যে,' অনেকক্ষণ পর মুখ খুললেন ডক্টর ভেনিনি। 'যাকে হরিহর আত্মা না কী যেন বলে–ঠিক? তা না হলে এভাবে কেউ কাউকে খোঁচা মেরে কথা বলতেন না।'

'না, ঠিক উল্টো, ডক্টর ভেনিনি। আমরা যে দুই বছর অক্সফোর্ডে পড়েছি, সমস্ত বিষয়ে পরস্পরের মধ্যে তিক্ত প্রতিদ্বন্দ্বিতা লেগেই থাকত।' হাসল বেলফোর, 'কিছু কিছু বিষয়ে রানা হয়তো আমার প্রায় সমান ছিল, তবে বাকি সব কিছুতে ওর চেয়ে অনেক ভাল ছিলাম আমি। এখনও তাই আছি। যেমন, উদাহরণ দিই–ও কি ফাইটার নিয়ে গিয়ে কোনও দেশে বোমা ফেলে এসেছে?' মাথা নাড়ল। 'আমি ফেলেছি–ফকল্যান্ডে। ও কি সেভেন সামিট জয় করেছে?'

'সেভেন সামিট?'

'সাত মহাদেশের সবচেয়ে উঁচু সাতটা পাহাড়চূড়া আমি জয় করেছি।'

'এটা সত্যি একটা বিরল কৃতিত্ব,' স্বীকার করল রানা। 'তবে ফকল্যান্ডে বোমা ফেলে আসার কথাটা আমাকে যা বলেছ বলেছ, আর কাউকে বোলো না। জবরদখল করা একটা দ্বীপে নিরীহ মানুষ খুন করে আসাটা দুনিয়ার কেউ ভাল চোখে দেখে না। এখন তো এ প্রসঙ্গে টু-শব্দ করাও বোকামি, বিশেষ করে ইরাকে যখন প্রতিদিন তোমরা পাল্টা খুন হচ্ছ।'

'কিসের সঙ্গে কি, পান্তাভাতে ঘি–,' প্রসঙ্গটা হালকা করতে চেয়ে সহাস্যে রানার পিঠ চাপড়ে দিল বেলফোর। 'অতীত রোমন্থন বাদ দাও তো। এসো, টেবিল টেনিসে তোমাকে তিন গেম হারিয়ে নিই, তারপর লেকে সাঁতার কাটার সময় মনের সাধ মিটিয়ে নাকানিচোবানি খাওয়ানো যাবে।'

সোহেল বাধা দেওয়ার আগেই রানা বলল, 'দেখা যাবে কে কাকে হারায় বা নাকানিচোবানি খাওয়ায়।' শয়তানটাকে ভাল একটা শিক্ষা দেওয়ার জন্য অস্থিরতা অনুভব করছে ও।

'তুমি আমার চিরশত্রু,' বলল বেলফোর। 'কাজেই জানো যে বিনা লাভে কোন কাজে আমি হাত দিই না। কত করে বাজি, বলো?'

'একশো পাউন্ড।'

'আরে ছো। একশো পাউন্ড একটা টাকা হলো! দুনিয়া জোড়া এজেন্সি চালাচ্ছ, মাসে মিলিয়ন মিলিয়ন আয় করো, হাত আরেকটু লম্বা করো, রানা! পাঁচ হাজার পাউন্ড আমার জন্যে বেশি হয়ে যায়–ঠিক আছে, যাও, এক হাজার পাউন্ড। সাঁতারেও কিন্তু তাই, ঠিক আছে?'

'ঠিক আছে,' বলল রানা। 'তবে তোমাকে আরও একবার ভেবে দেখার অনুরোধ করছি। প্রতিযোগী সোহেল হলে আমি রাজি হওয়ার আগে একশো একবার ভেবে দেখতাম, আমার ব্যাপারে তোমারও তাই করা দরকার বলে মনে করি।'

'কে, সোহেল? কার সঙ্গে কার তুলনা করো, রানা? ওর তো একটা হাতই নেই। আমি ওকে...'

'শাট আপ, ইউ ব্লাডি সোয়াইন!' লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল রানা। কিন্তু পিঠে সোহেলের গুঁতো খেয়ে মুহূর্তে সামলে নিল নিজেকে। শান্ত গলায় বলল,

'সোহেলের কাছে আমি দশের নীচে গেম খাই, দেখা যাক তোমার কেরামতি!'

প্রথম গেমটা খুব খারাপ ভাবে হারল রানা। ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ নয়, মুখে খই ফুটিয়ে সান্ত্বনা দিল বেলফোর, একই সঙ্গে মুখে ফেনা তুলে ফেলল উৎসাহ দিতে গিয়ে। দ্বিতীয় গেমটাও রানা হারছে। 'তোমার আসলে পিংপঙের ন্যাকটা আসেনি কোনদিন,' বলল বেলফোর, সুর পাল্টে গেছে তার। 'টাকাটার জন্যে দুঃখ কোরো না–আমার চেয়ে খারাপ খেলে এমন কারও কাছ থেকে জিতে নিয়ো। অবশ্য…এমন বোকা তুমি পাবে কোথায়, খেলতে না জানলেও এত টাকা বাজি ধরতে চাইবে?'

হারতে হারতেও কেন যেন হারছে না রানা। একটু একটু করে বাড়ছে ওর পয়েন্ট। দু'জনের পয়েন্ট এক সময় সমান-সমান হলো। বেলফোরের মুখে কথা নেই। কিছুতেই বাগে আনতে পারছে না সে রানাকে। চরম উত্তেজনার মধ্যে শেষ পর্যন্ত ডিউসে জিতল রানা গেমটা।

'হঠাৎ খুন করার মধ্যে মজা নেই,' একটু ঘাবড়ে গেলেও বোলচাল ছাড়েনি বেলফোর। 'মজা আছে একটু-একটু করে কষ্ট দিয়ে মারার মধ্যে। বুঝলে, তোমার মনে জেতার লোভ জাগিয়ে দিলাম, রানা। এবার হারাতে বেশি মজা লাগবে।'

রানা চুপচাপ। শুরু হলো তৃতীয় এবং শেষ গেম। বেলফোর কোন পয়েন্টই সংগ্রহ করতে পারছে না। এইট-নিল চলছে। সমস্ত নৈপুণ্য আর দক্ষতা কাজে লাগিয়ে টপ-স্পিন আর স্ম্যাশ করছে, কিন্তু দেখা যাচ্ছে সে-বল অনায়াসে ফিরিয়ে দিচ্ছে রানা। এক-পয়েন্ট দু-পয়েন্ট করে এগিয়েই যাচ্ছে ঠাণ্ডা মাথায়। রাগ নয়, বিদ্বেষ নয়, বেলফোর প্রবল বিস্ময়ে আক্রান্ত। এমন হচ্ছে কী করে? কেন?

এসব প্রশ্নের উত্তর সোহেলের জানা আছে। প্রায় ছ'মাস হলো বিভিন্ন ক্লাবে ওরা দুই বন্ধু সুযোগ পেলেই পিংপং খেলছে। অর্থাৎ রানার প্রায় নিয়মিত প্র্যাকটিস হয়, বেলফোরের হয় না।

শেষ গেমটা একেবারে যা-তা ভাবে হারল বেলফোর। একটু আগে ওর বলা কথাগুলো আর স্মরণ করিয়ে দিল না রানা। স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে, অপমানে চোখমুখ টকটকে লাল হয়ে উঠেছে। তা স্বত্ত্বেও মুক্তোর মত সাদা দাঁত দেখিয়ে কংগ্র্যাচুলেট করতে হলো রানাকে। 'সত্যি তোমার উন্নতি হয়েছে। আমি আসলে খেলিইনি, মুগ্ধ হয়ে শুধু তোমার খেলাই দেখলাম।'

'মূল্য বোধহয় একটু বেশি দিতে হলো,' বলল রানা, কাটা ঘায়ে নুনের ছিটা দিয়ে। 'এক হাজার পাউন্ড তো অনেক টাকা।'

চেক বই বের করে খসখস করে টাকার অঙ্কটা লিখে দ্রুত সই করল বেলফোর, তারপর ছিঁড়ে রানার দিকে বাড়িয়ে ধরে বলল, 'দেয়াই হচ্ছে ফিরিয়ে নেয়ার জন্যে।'

'মানে?' চেকে চোখ বুলিয়ে রানা দেখল এই ক্লাবেই সংশ্লিষ্ট ব্যাঙ্কের একটা শাখা আছে।

'ভুলে গেছ, এখনও একটা খেলা বাকি? চলো লেকে যাই।'

বেলফোর আর ডক্টর ভেনিনির পিছু নিল রানা, কী একটা কাজে আরেক

দিকে চলে গেল সোহেল। বিকেলের লেক, চারপাশে প্রচুর লোকজন বসে আছে বা হাঁটাহাঁটি করছে। ওরা একটা প্রতিযোগিতায় নামতে যাচ্ছে শুনে সবার মধ্যেই প্রবল উৎসাহ আর উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ল। অনেকেই সাঁতরাচ্ছিল, প্রতিযোগিতার কথা শুনে ঝপাঝপ আরও অনেকে নেমে পড়ল পানিতে। লকার খুলে ট্রাঙ্ক বের করে পরে নিল বেলফোর আর রানা। ঠিক হলো মোট পাঁচশো মিটার সাঁতরাবে ওরা। আড়াইশো মিটার দূরে একটা ডিঙ্গি নৌকা রাখা হলো। ওটা ছুঁয়ে যে আগে তীরে ফিরে আসতে পারবে সেই হবে বিজয়ী।

'ফ্রি স্টাইল, তো?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'যে-কোনও স্টাইল,' বলল বেলফোর। 'ব্যাক-স্ট্রোক, ব্রেস্ট-স্ট্রোক, বাটারফ্লাই–কোনও বাধা নেই, তোমার যা খুশি।'

সোহেল ফিরে এসে খুব উৎসাহ দিল রানাকে। শুরুতে রানাও বেশ ভাল করল। বেলফোরকে পিছনে ফেলতে না পারলেও, একেবারে আঠার মত লেগে থাকল পিছনে। ডিঙ্গি নৌকা যখন পঞ্চাশ মিটার দূরে, দেখা গেল দু'জন পাশাপাশি সাঁতরাচ্ছে–যাকে বলে সেয়ানে সেয়ানে লড়াই চলছে; কেহ কারে নাহি জিনে সমানে সমান। কিন্তু এই দক্ষতা আর মান রানা ধরে রাখতে পারল না। ধীরে ধীরে, একটু একটু করে, পিছিয়ে পড়ছে ও। নৌকা ছুঁয়ে ফিরতি পথ ধরল বেলফোর। দশ সেকেন্ড পর রানাও।

কোন-কোনও প্রতিযোগিতায় এক সেকেন্ডের দশভাগের এক ভাগ সময়ও তাৎপর্যপূর্ণ, মারাত্মক তারতম্য সৃষ্টি করে। দশ সেকেন্ড পিছিয়ে থাকা মানে জিতবার কোন সম্ভাবনাই বলতে গেলে নেই, যদি না রানা মাঝখানের ব্যবধান কমিয়ে আনতে পারে। কিন্তু কমাবে কী, সেটা আরও বাড়ছে। কারও আর বুঝতে বাকি থাকল না যে রানা হারছে। আরও অনেক সাঁতারুর ভিড়ে নিজেকে লুকিয়ে ফেলল রানা–সবাই বুঝল লজ্জা পেয়েছে।

ঘাড় ফিরিয়ে বারবার পিছন দিকে তাকিয়ে দেখছে বেলফোর, আর কৃত্রিম বিস্ময়ের সঙ্গে হাতের উল্টোপিঠ দিয়ে চোখ রগড়াবার ভঙ্গি করছে। মুখে হাসি আর ধরে না তার। তারপর অলস ভঙ্গিতে চিৎ সাঁতার শুরু করল–রানাকে তার বিশ্বাস নেই, শেষ মুহূর্তে যদি কাছে চলে আসে!

লেকের পার আর যখন মাত্র বিশ মিটার দূরে, নিজেকে সিধে করে নিয়ে ব্রেস্ট স্ট্রোক শুরু করবার সিদ্ধান্ত নিল বেলফোর। সিধে মাত্র হয়েছে, সামনে চোখ পড়তে ভূত দেখবার মতই চমকে উঠল সে।

রানা শুধু তীরেই পৌঁছায়নি, ডাঙায় উঠে তোয়ালে দিয়ে গা মুছছে।

'এর মানে?' পারে পৌঁছে কোমরে হাত রেখে জানতে চাইল বেলফোর। 'তুমি এখানে এলে কীভাবে?'

'কীভাবে এলাম মানে?' রানা হেসে উঠল। 'সাঁতার দিয়ে এলাম।'

'অসম্ভব! আমি বিশ্বাস করি না!' চেঁচামেচি শুরু করে দিল বেলফোর। 'তুমি আমার চেয়ে অন্তত পঁচিশ মিটার পিছিয়ে ছিলে। এক সময় তোমাকে আমি দেখতেই পাচ্ছিলাম না। এই অবস্থায় তুমি আমার আগে চলে আসো কীভাবে?'

'তাহলে তমিই বলো কীভাবে এলাম।'

'তুমি পারে উঠে, লেকের কিনারা ধরে ছুটে এসেছ। এ না হয়েই যায় না।'

'চারদিকে এত মানুষ, এরা নিশ্চয়ই এত বড় একটা ঘটনা দেখেছে? কই, কেউ কিছু বলছে না কেন?'

'তুমিই তা হলে ব্যাখ্যা করো,' রাগে কাঁপছে বেলফোর। 'তবে দ্বিতীয়বার বলো না যে সাঁতরে এসেছ। আমি বিশ্বাস করব না।'

'পানির ওপর দিয়ে নয়, মন্টি,' বলল রানা। 'আমি পৌঁছেছি ডুব-সাঁতার দিয়ে। সবাই দেখেছে, বুঝলে। বিশ্বাস না হলে জিজ্ঞেস করে দেখতে পারো।'

আশপাশে প্রচুর লোকের ভিড়। তারা মাথা ঝাঁকিয়ে আর বিড়বিড় করে রানার বক্তব্য সমর্থন করল।

'এটা চিটিং! তুমি আমাকে চিট করেছ!' আবার চিৎকার জুড়ে দিল বেলফোর। 'রানা, আমার চেক তুমি আমাকে ফেরত দাও। সাঁতারে আমি জিতেছি, কাজেই তোমার কাছে এক হাজার পাউন্ড পাওনা হয়েছে আমার।'

'কী আশ্চর্য! তোমার কী মাথা খারাপ হলো? কীভাবে তুমি জিতলে সেটা ব্যাখ্যা করতে হবে না? আমিই বা কখন তোমার সঙ্গে চিট করলাম?' আকাশ থেকে পড়া মানুষ বলে মনে হচ্ছে রানাকে।

'ডুব-সাঁতার দেয়ার কথা বলা হয়নি!' গর্জে উঠল বেলফোর। 'এটা তোমার নোংরা একটা কৌশল। তুমি কোথায়, কত কাছে আছ আমাকে তা দেখতে দাওনি। এটা চিটিং! ভাল চাও তো চেক ফেরত দাও, রানা। তা না হলে ব্যাঙ্কে ফোন করে প্রেসিডেন্টকে আমি টাকা দিতে নিষেধ করব।' খুলে রাখা কোটের পকেট থেকে একটা মোবাইল বেরিয়ে এল তার হাতে।

'একটু দেরি হয়ে গেছে, মন্টি,' বলল রানা, হাসছে। 'আমরা পানিতে নামবার আগেই সোহেল চেকটা ভাঙিয়ে ফেলেছে। তুমি নিজের মুখে বলেছ যে-কোনও রকম সাঁতার দেয়ার স্বাধীনতা আছে আমার। হেরে গিয়ে এখন যদি তুমি তোমার কথা ওল্টাতে চাও...'

এই সময় ক্লাবের প্রেসিডেন্ট রবার্ট ক্লিফোর্ড ভিড় ঠেলে এগিয়ে এলেন। অত্যন্ত ব্যক্তিত্বসম্পন্ন মানুষ, প্রায় সবাই তাঁকে সমীহ করে। লেকের পারে একটা নীরবতা নেমে এল। প্রথমে রানার সঙ্গে হ্যান্ডশেক করলেন তিনি। 'কংগ্রাচুলেশন্স, মিস্টার রানা। আমার চোখে বিনকিউলার থাকায় বিরল দৃশ্যটা থেকে আমি বঞ্চিত হইনি। পঞ্চাশ মিটার ডুব-সাঁতার, অক্সিজেন বটল ছাড়া, এই প্রথম দেখলাম জীবনে।'

রানার কাঁধ চাপড়ে দিয়ে ঘুরলেন তিনি। 'মিস্টার বেলফোর।' বেলফোরের হাত ধরে ঝাঁকাচ্ছেন। 'আমি বলব এ আপনার গৌরবময় পরাজয়। আপনি জিতেছেন, এই বোধ লালন করে কোন লাভ নেই, কারণ এক সময় আপনি নিজেই তা আর বিশ্বাস করবেন না। তারচেয়ে পরাজয়টাকে বড় করে দেখুন, ভাবুন হারটা হয়েছে বিশ্বমানের একজন সাঁতারুর কাছে। এ-ও ভুলবেন না যে প্রথম ল্যাপে আপনি এগিয়ে ছিলেন। আসুন, আজ আপনারা আমার সঙ্গে ডিনার খাবেন।'

চারদিকে ভিড়, লোকজন তাকিয়ে আছে; পরিস্থিতি অনুকূল নয় বুঝতে পেরে

চওড়া কাঁধ ঝাঁকিয়ে জোর করে একটু হাসল বেলফোর। তবে চাপা গলায় হাস্যরত রানাকে হুমকি দিতে ছাড়ল না: 'সাবধান, রানা! তোমার হাসি আমি মুছে দেব!'

'আমার টাকাগুলো দিয়ে, না কি তার আগেই?' আরও বিস্তৃত হল রানার হাসি।

তিন

কমনওয়েলথ ডিফেন্স অ্যান্ড রিসার্চ ফ্যাসিলিটিজ, সিডিআরএফ, একটা রাজনৈতিক নীতিমালার অধীনে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে ব্রিটিশ সরকারের অনুদানে পরিচালিত হয়। শুধু কমনওয়েলথ-এর সদস্য রাষ্ট্রের বিজ্ঞানীরা এখানে গবেষণা করতে পারেন। সাধারণত বিজ্ঞানীরা এখানে গবেষণা করতে চেয়ে আবেদনপত্র জমা দেন, আবার অনেক সময় প্রতিষ্ঠানের তরফ থেকে বিশেষ কোন বিজ্ঞানীকে আমন্ত্রণও জানানো হয়। যে-কোন গবেষণা সফল হলে, অর্থাৎ গুরুত্বপূর্ণ কিছু আবিষ্কৃত হলে, সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞানী সেটার ফর্মুলা বা প্রোটোটাইপ ব্রিটিশ সরকারের কাছে বিক্রি করতে পারেন, যদি তারা কিনতে আগ্রহী হয়।

ব্রিটিশ সরকার আগ্রহী হলেও আবিষ্কারটির মূল্য নিরূপণের জন্য আনুষ্ঠানিক আলোচনার একটা ব্যাপার আছে। দরে না পোষালে বিজ্ঞানী তাঁর আবিষ্কার নিয়ে নিজের দেশে চলে যেতে পারেন, কিংবা অন্য কোন আগ্রহী দেশ বা প্রতিষ্ঠানের কাছে বিক্রি করে দিতে পারেন। তবে বিজ্ঞানীকে যে-সব সুযোগ-সুবিধে দেওয়া হয়েছে তার একটা আনুমানিক মূল্য ধরা হয়, সেটা পরিশোধ না করা পর্যন্ত বিজ্ঞানী তাঁর ফর্মুলা বা প্রোটোটাইপ সিডিআরএফ-এর ল্যাব থেকে বাইরে নিয়ে যেতে পারবেন না। ল্যাব ও কমপাউন্ডের সিকিউরিটি অত্যন্ত কড়া। সিডিআরএফ-এর এরকম ল্যাব ফ্যাসিলিটি একটা নয়, ইংল্যান্ডের বিভিন্ন জায়গায় বেশ কয়েকটা ছড়িয়ে আছে। তার মধ্যে একটা হলো ফ্লীট-এ।

ফ্লীট ছোট একটা গ্রাম, ফার্নবারা থেকে খুব একটা দূরে নয়। গ্রামটার আশপাশে প্রচুর ইন্ডাস্ট্রিয়াল কমপ্লেক্স আর ওয়্যারহাউস আছে, তাই একটা রেলস্টেশনও আছে, সকাল-বিকাল লন্ডন থেকে ট্রেনে আসা-যাওয়া করা যায়। সিডিআরএফ-এর এই ফার্নবারায় যে প্রজেক্টটা নিয়ে কাজ চলছে সেটাকে অত্যন্ত গোপন আর গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচনা করা হয়, সেজন্য এমন একটা ওয়্যারহাউসের ভিতর ল্যাবটা তৈরি করা হয়েছে যেটাকে দেখে সবাই ভাববে পরিত্যক্ত।

এটা ওয়্যারহাউসটার বাইরের চেহারা। পেরেক দিয়ে কাঠের তক্তা লাগিয়ে সবগুলো জানালা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। খানিক পরপর সাইনবোর্ড পাওয়া যাবে, তাতে লেখা–বিনা অনুমতিতে প্রবেশ নিষেধ। প্রতিটি দরজায় তালা দেওয়া। বাইরেটা সবসময় নির্জন আর অন্ধকার। মেইন রোডগুলো থেকে যথেষ্ট

দূরে হওয়ায় ফ্লীট-এর বাসিন্দারা কেউ আসলে খেয়ালই করেনি যে একদিন হঠাৎ তাদের এলাকার একটা দালান আগের চেয়ে অনেক পুরানো আর নোংরা হয়ে উঠেছে। কিন্তু বাস্তবে দালানটায় ঢুকবার জন্য গোপন একটা প্রবেশপথ আছে, আছে বিশ ফুট চওড়া আর পাঁচশো ফুট লম্বা একটা আঁকাবাঁকা উইন্ড-টানেল, ফাউন্ড্রী ইকুইপমেন্ট, অটোক্লেইভ নামে একটা সীলড্ প্রেশার ভেসেল; আরও আছে ছোটখাট একটা রিসার্চ টিম-এর উপযোগী অফিস কামরা আর ল্যাব, সেই টিম-এর নেতৃত্বে রয়েছেন বিখ্যাত অ্যারোনটিক্স ফিজিসিস্ট ও ইঞ্জিনিয়ার ডক্টর সাজিদুল হক।

বছর দুয়েক আগে অক্সফোর্ড থেকে ডক্টর হককে এক রকম ভাগিয়েই নিয়ে এসেছে সিডিআরএফ। অক্সফোর্ডে তিনি শুধু অধ্যাপনা করছিলেন না, অবসর সময়ে নিজস্ব একটা প্রজেক্টে গবেষণাও করছিলেন। সেই গবেষণার বিষয়টা কী জানবার পর সিডিআরএফ কর্তৃপক্ষ ডক্টর হককে নিজেদের ল্যাবে পাওয়ার জন্য আদাজল খেয়ে লাগেন। ডক্টর হক সিরামিক্স-এ একজন এক্সপার্ট, বিশেষ করে এয়ারক্রাফট ফিউজিলাজের জন্য 'স্মার্ট স্কিনস'-এর ডিজাইন তৈরিতে তাঁর জুড়ি নেই।

ডক্টর হকের বয়স পঞ্চান্ন। অত্যন্ত ভদ্র এবং অভিজাত মানুষ। চিরকুমার তিনি, দেশে বা বিদেশে তাঁর কোন পিছু টান নেই। প্রথম জীবনে সেনাবাহিনীতে ছিলেন, স্বাধীনতা যুদ্ধে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত লড়েছেন। দেশ স্বাধীন হবার পর হৃৎপিণ্ড থেকে ফিসফাস আওয়াজ সহ অন্যান্য লক্ষণ তাঁকে অ্যাকটিভ সার্ভিস থেকে সরে আসতে বাধ্য করে। ব্রিটেনে এসে ডাক্তার দেখালে তাঁরা রায় দেন: 'উনি কোনদিন চল্লিশে পা দেবেন না।'

তাঁদের সবাইকে বোকা বানিয়ে আজও বহাল তবিয়তে বেঁচে আছেন তিনি, অক্সফোর্ড থেকে লেখাপড়া শেষ করে অক্সফোর্ডেই শিক্ষকতা করেছেন একটানা দীর্ঘ বহু বছর।

সিডিআরএফ-এর সঙ্গে একটা চুক্তি হয়েছে ডক্টর হকের; তাঁর গবেষণা সফল হলে ফর্মুলাটার স্বত্ব পাবে বাংলাদেশ সরকার, আর বাংলাদেশ যদি সেটা বিক্রি করবার সিদ্ধান্ত নেয় তাহলে প্রস্তাবটা প্রথমে দিতে হবে ব্রিটিশ সরকারকে।

আজ রাতটা ডক্টর হকের জীবনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ওয়ান-এইটথ্ স্কেল প্রোটোটাইপ-এর উপর টেস্টটা যদি পজিটিভ হয়, আর স্কিন-সেভেনটিন সত্যি সফল হয়, তাহলে প্রায় নিশ্চিত ভাবে ধরে নেওয়া চলে যে তিনি নোবেল প্রাইজ পেতে যাচ্ছেন।

স্কিন-ফিফটিন বলা যায় সাফল্যের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে গিয়েছিল। বাধা হয়ে দাঁড়ায় কিছু ছোটখাট ত্রুটি। পরিমাপযোগ্য অটোক্লেইভ মেটিরিয়াল বিল্ট-ইন ফটো ইলেকট্রলাইসিস-এ সম্ভাব্য ত্রুটি দেখিয়ে দিয়েছে, যেটার কাজ অপব্যবহার রোধ করবার জন্য স্কিন-এর রেজিস্ট্যান্স বদলানো। ইমপিডেন্স সেনসিটিভিটি ছিল দুর্বল। হতাশ না হয়ে ডক্টর হক তাঁর অ্যাসিস্ট্যান্ট ডক্টর হিউগো ভেনিনির সঙ্গে পরামর্শ করে সিদ্ধান্ত নিলেন কাজ বন্ধ করা চলবে না। এটা তিন মাস আগের ঘটনা। যেটাকে তাঁরা এক হপ্তার টুকটাক মেরামতির কাজ ভেবেছিলেন সেটা হয়ে

দাঁড়াল বড় ধরনের ওভারহল; আর ছাই-পাঁশ থেকে বেরিয়ে এল স্কিন-সিক্সটিন।

ডক্টর হকের বিবেচনায় ফর্মুলার ওই বিশেষ সংস্করণটা তাঁর সেরা কাজগুলোর মধ্যে একটা। টিমের সদস্যরা তো উল্লাস ধরে রাখতে না পেরে নিজেদেরকে সফল বলে ঘোষণাই দিয়ে ফেলছিল, কিন্তু কয়েকটা কী টেস্টের একটায় প্রোটোটাইপ স্কিন ব্যর্থ হয়। মেটিরিয়াল-এর রেডিও ফ্রিকোয়েন্সি অবাধ ও উন্মুক্ত থাকা সত্ত্বেও, একটা অ্যাপারচার-এর মধ্যে দিয়ে ট্র্যান্সমিট বা রিসিভ করতে সফল হয়নি একটা সেনসর। অস্বীকার করবার উপায় নেই যে ভুলভাল ছিল, তবে এ-ও ঠিক যে লক্ষের এত কাছে আগে কখনও তাঁরা পৌঁছাননি। সবচেয়ে কঠিন বাধা তো সব সময় একটাই—অটোক্লেইভ মেটিরিয়ালকে কীভাবে পরিমাপ বা ভাগ করলে এক্সট্রিম পজিশনেও প্রোটোটাইপ মডেল তৈরি এবং টেস্ট করা যাবে। আরও এক মাস লাগল স্কিন-সিক্সটিনকে ডক্টর হকের সন্তুষ্টি অনুসারে নিখুঁত করতে। আজ তিনি স্কিন-সেভেনটিন-এর প্রোটোটাইপকে নিয়ে করা টেস্ট-এর রেজাল্ট দেখবেন। এটা যদি কাজ করে, তা হলে তিনি আর তাঁর টিমের সদস্যরা যে কার্বন-ফাইবার এবং সিলিকা সিরামিক ডেভলপ্ করেছেন সেগুলো চিরকালের জন্য এভিয়েশন জগৎটাকে বদলে দেবে।

আধ-পাগলা বা খেয়ালি মানুষ হিসাবে পরিচিত ডক্টর হক তাঁর টিমকে আজকের দিনটা ছুটি দিয়েছেন, নিরিবিলিতে একা যাতে মন লাগিয়ে কাজ করতে পারেন। তবে সেকেন্ড-ইন-কমান্ড ভেনিনিকে সন্ধার দিকে আসতে বলে দিয়েছিলেন।

একটা কমপিউটার টার্মিন্যালে বসে আছেন ডক্টর হক, তুমুল গতিতে পাঞ্চ করে ডাটা ভরছেন। কামরার আরেক প্রান্ত, অটোক্লেইভ-এর পাশ থেকে তাঁকে দেখছেন ডক্টর ভেনিনি। অটোক্লেইভে স্কিন-সেভেনটিন-এর একটা প্রোটোটাইপ দেখা যাচ্ছে।

'তুমি কিন্তু বলোনি গলফ ক্লাবে সময়টা কেমন কাটল তোমার,' বললেন ডক্টর হক, এখনও টাইপ করছেন।

'দারুণ উপভোগ করেছি, সার,' বললেন ভেনিনি। 'গলফ খেলে কিছু পয়সাও জিতেছি।'

'গুড।' মাথা ঝাঁকালেন ডক্টর হক। 'দরজা থেকে আজ সবাইকে বিদায় করে দেয়ায় আশা করি তুমি কিছু মনে করোনি। আসলে এই অঙ্কগুলো একদম একা বসে মেলাবার প্রয়োজন বোধ করছিলাম। তুমি বুঝেছ, তাই না, হিউগো?'

'অবশ্যই, ডক্টর হক,' বললেন ডক্টর ভেনিনি। 'এ নিয়ে আপনি বিব্রত হবেন না, প্লিজ। সময়টা আমার সত্যি খুব ভাল কেটেছে। তবে স্বীকার করছি, গলফে আমি মন বসাতে পারিনি। খালি মনে হচ্ছিল আজই হয়তো আপনি কাজটা শেষ করে ফেলবেন।'

'ইয়ে, হিউগো,' নিজের লেখা একটা প্রোগ্রাম চালু করবার জন্য বোতামে চাপ দিয়ে চেয়ারে হেলান দিলেন ডক্টর হক, হাত দুটো শক্ত করে বুকে বেঁধে অপেক্ষা করছেন, 'আর কয়েক মিনিটের মধ্যেই জানতে পারব আমরা, তাই না?'

ডিম্বাকার অটোক্লেইভের গায়ে নার্ভাস ভঙ্গিতে আঙুল নাচাচ্ছেন ডক্টর

ভেনিনি। ডাইভাররা যে-ধরনের প্রেশার চেম্বার ব্যবহার করে, অটোক্লেইভটা সেরকম দেখতে। 'এই অপেক্ষায় থাকাটা ভয়ঙ্কর লাগছে, সার। উত্তেজনায় ঠাস করে মাথাটাই না আমার ফেটে যায়!' তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে ঘড়ির দিকে তাকালেন। ফিজিসিস্ট ভদ্রলোকের চেহারায় পাখিসুলভ বৈশিষ্ট্য উদ্বেগ আর উত্তেজনার মুহূর্তে আরও বেশি করে চোখে লাগে। তাঁর চুলে খাড়া হবার একটা ঝোঁক দেখা দেয়, সেই সঙ্গে নিজের অজান্তে মাথাটা ঝাঁকাতে থাকেন। ডক্টর হক ধরে নিলেন তাঁর সহকারী কোন ধরনের খিঁচুনিতে আক্রান্ত হয়েছে।

'মিনিটের কাঁটার দিকে তাকিয়ে থাকলে সময়কে আরও অলস বলে মনে হবে।' হেসে উঠলেন ডক্টর হক। 'বিশ্বাস করতে কষ্ট হয় আমরা শুরু করার পর দু'বছর কেটে গেছে।'

চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়লেন ভেনিনি, ডক্টর হকের দিকে হেঁটে এলেন, তারপর তাঁর কাঁধের উপর দিয়ে সামনে তাকালেন। দু'জনেই দেখছেন দ্রুতবেগে মনিটরে ফুটে উঠছে অঙ্ক, জ্যামিতিক চিহ্ন, নকশা ইত্যাদি।

'হিউগো, ম্যাক-এর কাছে গিয়ে কলকাঠি নাড়ো,' নির্দেশ দিলেন ডক্টর হক।

ফিরে এসে অটোক্লেইভ চেম্বারের টেমপারেচার লেভেল অ্যাডজাস্ট করলেন ডক্টর ভেনিনি।

পরবর্তী দশ মিনিট কেউ কোন কথা বললেন না। প্রিন্টার থেকে ফুটো করা দীর্ঘ কাগজ বেরিয়ে আসছে; গায়ে সমীকরণ, হরফ, সংখ্যা আর সঙ্কেত গিজগিজ করছে।

স্কিন-সেভেনটিন।

মেশিনের কাজ শেষ হতে সামনের দিকে ঝুঁকে মনিটরে তাকালেন ডক্টর হক, এক চিলতে হাসি খেলা করছে ঠোঁটে। বড় করে একটা শ্বাস নিলেন তিনি, তারপর রিভলভিং চেয়ার ঘুরিয়ে তাঁর সহকারীর মুখোমুখি হলেন। 'ডক্টর হিউগো ভেনিনি। স্কিন-সেভেনটিন ইজ আ সাকসেস। ইট হ্যাজ প্যাসড্ এভরি টেস্ট।'

চওড়া হাসিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল ডক্টর ভেনিনির মুখ। 'কংগ্রাচুলেশান্স! মাই গড, সার, দিস ইজ ব্লাডি মার্ভেলাস! আমি জানতাম, মিস্টার হক, এ আপনি করেই ছাড়বেন।' ডক্টর হকের কাঁধ আঁকড়ে ধরলেন তিনি।

'আরে কী বলো,' সবিনয়ে বললেন ডক্টর সাজিদুল হক। 'এ কী আমার একার সাফল্য। তোমাদের সবার কাছ থেকে হেলপ পেয়েছি, এমনকী ফার্নবারার লোকজনও কম সাহায্য করেনি। এর সবটা আমি একা করিনি।'

'তবে আমাদের সবার সই করা চুক্তিতে বলা হয়েছে সমস্ত কৃতিত্ব একা আপনিই পাবেন,' ডক্টর ভেনিনি কথাটা তাঁকে মনে করিয়ে দিলেন।

'ইয়ে, হ্যাঁ, তা হয়েছে বটে!' হেসে উঠলেন ডক্টর হক। 'ওহে, আমরা কী একটু গলা ভেজাব? রিফ্রিজারেটারে একটা ওয়াইনের বোতল বোধহয় আছে। সবাইকে বাড়ি পাঠিয়ে দিয়ে এখন দুঃখ লাগছে, বুঝলে। মনে হচ্ছে আমাদের গোটা টিম এখানে থাকা উচিত ছিল।'

ছুটি পাওয়ায় সবাই আমরা কৃতজ্ঞ, মিস্টার হক। মিস্টার লছমন আর মিসেস মাধুরী লং ড্রাইভে বেড়াতে চলে গেছেন। বড়য়া আর সঞ্জয় যে যার বউকে নিয়ে

বোর্ডিং স্কুলে গেছে ছেলেমেয়েদের দেখতে। তবে সবার কানেই খবরটা পৌঁছে যাবে।

ডেস্ক ছেড়ে উঠে কিচেনের দিকে এগোলেন ডক্টর হক।

'এখনই ওটা একটা ডিস্কে সেভ করা উচিত নয়?' জিজ্ঞেস করলেন ভেনিনি।

'ঠিক বলেছ,' বলে আবার ডেস্কের কাছে ফিরে এলেন ডক্টর হক। স্কিন-সেভেনটিন ফর্মুলার সবটুকু হার্ডডিস্কে সেভ করলেন, তারপর সিডি রাইটারে খালি একটা কমপ্যাক্ট ডিস্ক ঢুকিয়ে কপি করলেন। সিডিটা চালিয়ে দেখে নিশ্চিন্ত হলেন, তারপর ওটা বের করে একটা জুয়েল বক্সে ভরলেন। এবার নির্দ্বিধায় মুছে ফেললেন হার্ড ডিস্কের কপিটা। ডেস্ক থেকে লাল মার্কার তুলে ঢাকনির উপর লিখলেন: স্কিন-সেভেনটিন গোল্ড মাস্টার। 'আমি বরং এটা সেফে ভরে রাখি, তা হলে আর হারিয়ে যাবার ভয় থাকবে না,' বললেন তিনি। 'পরে ধীরেসুস্থে আরও কপি তৈরি করা যাবে।'

'আগে যান তো, গলা ভেজাবার ব্যবস্থা করুন!' সহাস্যে আবদার জানালেন ডক্টর ভেনিনি। 'এখানে আমি আর আপনি ছাড়া আর আছেটা কে। সেফে পরে রাখলেও, কী যেন বলে সঞ্জয়...মহাভারত অশুদ্ধ হবে না।'

কয়েক সেকেন্ডের জন্য নিজেকে বোকা মনে হলো, তারপর তীক্ষ্ণ বিবেচনা বোধ ডক্টর হককে নরম হতে বাধা দিল। 'না, চট করে জিনিসটা তুলেই রাখি।'

দেয়ালে গাঁথা চব্বিশ ইঞ্চি সেফটার দিকে এগোলেন তিনি। কম্বিনেশন লক সাবধানে ঘুরিয়ে দরজা খুললেন, জুয়েল বক্সটা ভিতরে রেখে দিলেন যত্ন করে। 'এবার ওয়াইন,' বললেন তিনি, সেফের দরজা বন্ধ করে আবার কিচেনের দিকে হাঁটছেন। সামনের অফিসে কলিংবেল বেজে ওঠায় দাঁড়াতে হলো তাঁকে। ভুরু কুঁচকে ডক্টর ভেনিনির দিকে তাকালেন তিনি। 'এ সময়...কে হতে পারে বলো তো?'

ইন্টারকম অন করলেন ডক্টর ভেনিনি। 'ইয়েস?'

একটা গমগমে কণ্ঠস্বর ভেসে এল: 'আমি বেলফোর। কোড ক্লিয়ারেন্স ৯৯৯১ স্কিন।'

ডক্টর হক অবাক। 'ও তো বলেনি যে আজ রাতে আসবে। কী চায়?'

'আমি কী ওকে ঢুকতে বাধা দেব?' জিজ্ঞেস করলেন ডক্টর ভেনিনি।

'না-না, ঢুকতে দাও। রয়্যাল এয়ার ফোর্স থেকে পাঠানো লিয়েইজন অফিসার; এখানকার কর্মকর্তারা ওকে খুব খাতির করে,' বললেন সাজিদুল হক। 'তবে আজকের এই আনন্দময় মুহূর্তটা ওর সঙ্গে আমি কাটাতে চাইনি। ছেলেটাকে আমার বেয়াড়া কিসিমের লাগে।'

ভেনিনি একটা বোতামে চাপ দিলেন।

দালানের পিছনের পাঁচিল অল্প একটু ফাঁক হলো, কোনরকমে একজন মানুষ গলতে পারবে। ফাঁক দিয়ে ঢুকলে পাওয়া যাবে একটা প্যাসেজ, প্যাসেজটা পৌঁছে দেবে নির্জন, খালি একটা আন্ডারগ্রাউন্ড ফ্লোরে–ধুলো আর মাকড়সার জালে ভর্তি। এরপর একটা সিঁড়ি। সিঁড়ির মাথায় ফলস্ ওয়াল। ওখানে একটা ইলেকট্রিক্যাল ফিক্সচার ঝুলছে, সেটা সামান্য ঘোরালে একজন ভিজিটর পাঁচিলটা

ফাঁক করে সিডিআরএফ-এর ল্যাবরেটরিতে ঢুকতে পারবে। বেলফোর এখানে বেশ কয়েকবারই এসেছে, কাজেই পথটা তার চেনা। কয়েক মুহূর্ত পর চেয়ার ছেড়ে ল্যাবের দরজা খুলে দিলেন ডক্টর ভেনিনি।

গ্রুপ ক্যাপটেন মন্টি বেলফোর পুরোদস্তুর ইউনিফর্ম পরে এসেছে, হাতে ছোট একটা কালো বাক্স। লম্বা-চওড়া আর স্বাস্থ্যবান হওয়ায় এমনিতেই মনে হয় কর্তৃত্ব ফলাচ্ছে, তার উপর আরএএফ-এর ইউনিফর্ম পরলে পরিবেশে তটস্থ একটা ভাব চলে আসে। সুশিক্ষিত, সুশৃংখল একজন ব্রিটিশ অফিসারকে যেমন দেখাবার কথা–তীক্ষ্ণ, সচেতন, দৃঢ় আর দক্ষই দেখাচ্ছে তাকে।

'গুড ইভিনিং, জেন্টেলমেন,' বলল সে। 'এভাবে বিরক্ত করার জন্যে সত্যি দুঃখিত, তবে আমাকে কয়েকটা নতুন অর্ডার দিয়ে পাঠানো হয়েছে। সে-সব আমি ব্যাখ্যা করছি, তার আগে আপনি আমাকে আপনার টেস্ট রেজাল্ট সম্পর্কে বলুন, ডক্টর হক।'

'নতুন অর্ডার?' ডক্টর সাজিদুল হক বিমূঢ়। 'কী বলতে চাও তুমি? তুমি জানলেই বা কীভাবে আজ রাতে আমরা টেস্ট করছি?' ঘাড় ফিরিয়ে ডক্টর ভেনিনির দিকে তাকালেন তিনি।

মাথা নাড়বার সময় ভেনিনির চকচকে চোখ জোড়া আকারে বড় হলো।

'ডক্টর ভেনিনি আমাকে কিছু বলেননি,' জবাব দিল বেলফোর। 'আমি জানতাম। জানাই তো আমার কাজ।' কালো বাক্সটা একটা কাউন্টারে রাখল সে।

ডক্টর হককে অনিশ্চিত দেখাচ্ছে। গত এক বছরে বেশ কয়েকবারই অফিসে এসেছে বেলফোর, কিন্তু প্রতিবারই দিনের বেলা, এবং নির্দিষ্ট প্রশাসনিক কর্মসূচি অনুসারে। 'ঠিক আছে,' বললেন তিনি। 'কিন্তু ব্যাপারটাকে আমি নিয়মের বাইরে বলেই গণ্য করছি।'

'ডক্টর হক, আপনি আমাদের সবার নমস্য ব্যক্তি,' বলল বেলফোর। 'সবাই আমরা আপনার ভক্ত, এবং স্নেহ পাওয়ার জন্যে কাঙাল। আপনার এই বিরল সাফল্যে আমিও তো ইমোশন্যালি ইনভলভড্, তাই না? এটা তো আমাদেরও একটা প্রজেক্ট, বলুন?'

'বেশ,' কাঁধ ঝাঁকালেন ডক্টর হক, ঘাড় ফিরিয়ে ভেনিনির দিকে তাকালেন। 'হিউগো, আমাদের ভক্তকে খবরটা বলছ না কেন, এইমাত্র যেটা আমরা জানলাম।'

ভেনিনি এক গাল হেসে বেলফোরের দিকে তাকালেন। 'আমরা সফল। ডক্টর হক সফল। স্কিন-সেভেনটিন ইজ আ সাকসেস।'

'অবিশ্বাস্য!' বলল বেলফোর। 'ওয়েল ডান, ডক্টর হক। এরকম একটা খবর শুনে উৎসব না করলে চলে না। যে ওয়াইনের কথা বলছিলেন সেটা কোথায়?'

কিচেনের দিকে হাত তুললেন ডক্টর হক। 'ওটা ওখা–' অকস্মাৎ থেমে গিয়ে বেলফোরের দিকে তাকালেন। 'তুমি জানলে কীভাবে আমি ওয়াইন সম্পর্কে কিছু বলেছি কি না?'

জ্যাকেটের ভিতর ডান হাত ভরে একটা নাইনএমএম ব্রাউনিং হাই-পাওয়ার পিস্তল বের করল বেলফোর। তার বাঁ হাতে বেরিয়ে এসেছে কালো রঙের ছোট

একটা চৌকো জিনিস, ছোট্ট অ্যান্টেনা সহ। 'বুঝতেই পারছেন, আপনাদের কথাবার্তা সব আমি শুনতে পেয়েছি,' বলল সে। 'এটা টু-চ্যানেল ইউএইচএফ রিসিভার। ট্র্যান্সমিটারটা কোথায় বলুন তো? ওদিকে, ডক্টর ভেনিনির হাতঘড়িতে। আমি সারাক্ষণ এই দালানের বাইরেই ছিলাম, শুনছিলাম আপনারা কে কী বলেন। অপেক্ষা করছিলাম কখন শুনব আপনার টেস্ট সফল হয়েছে। ডক্টর ভেনিনি নিশ্চিত ছিলেন, আজ রাতে আপনি সোনা প্রসব করবেনই। করেছেনও।'

ডক্টর হক তাঁর অ্যাসিস্ট্যান্টের দিকে তাকালেন, কিন্তু বেঈমানটা মুখ তুলে গুরুর চোখের দিকে এত তাড়াতাড়ি তাকাতে পারল না।

'এ আমার বোধগম্য হচ্ছে না,' ডক্টর হক বললেন। 'কী ঘটছে এখানে? হিউগো?'

'দুঃখিত, ডক্টর হক,' বলল ভেনিনি।

ডক্টর হককে নড়বার সুযোগ না দিয়ে বেলফোর তাঁর ডান উরুতে গুলি করল। আর্তনাদ করে উঠে মেঝেতে পড়ে গেলেন সাজিদুল হক। অসহ্য ব্যথায় চোখে অন্ধকার দেখছেন, শরীরটা কাঠের মেঝেতে মোচড় খাচ্ছে। পায়ের বিরাট গর্ত থেকে হড়হড় করে রক্ত বেরুচ্ছে।

তাঁর সামনে শান্তভাবে দাঁড়িয়ে আছে বেলফোর; বলল, 'হু-ম্-ম্-ম্, ব্যাড লাক, অ্যাঁ, ডক্টর? শুনুন, এবার বলি কী সেই নতুন অর্ডার। স্কিন-সেভেনটিনের ফর্মুলার দায়িত্ব নেবেন ডক্টর হিউগো ভেনিনি। তাঁকে নিশ্চিত হতে হবে এখানে বা অন্য কোথাও যেন আর কোন কপি না থাকে। অর্ডার মত সব হলো কি না তা আমাকে দেখতে বলা হয়েছে।' অস্ত্রটা ভেনিনির হাতে ধরিয়ে দিল সে। 'কাউলা বুড়োটাকে আপনার হাতে তুলে দিলাম।'

ডক্টর হকের পাশে গুড়ি মেরে বসল ভেনিনি। বস বা গুরুর মাথায় পিস্তলের মাজল ঠেকাল সে। 'সত্যি দুঃখিত, সার, সেফের কম্বিনেশনটা বলতে হবে আপনাকে। ওই ডিস্কটা আমার না পেলে চলবে না।'

প্রচণ্ড ব্যথায় নরকযন্ত্রণা ভোগ করছেন ডক্টর হক, তারপরও বলতে চেষ্টা করলেন: 'তু-তুমি···রে-বেঈমান!'

'আরে সার, থামুন,' বলল ভেনিনি। 'এভাবে নেবেন না। আমি দেখব এরপরও যাতে স্কিন-সেভেনটিন ডেভলপ করার কৃতিত্বটা আপনিই পান। ভেবে দেখুন, আপনি ব্যাচেলার মানুষ; ফর্মুলাটা বিক্রি করে যে টাকা পেতেন সেটা দিয়ে কি করবার ছিল এই বয়েসে? নিজের দেশকে ওটা দান করতেন? তাতেই বা কী লাভ হত, বলুন? বাংলাদেশ কী আগামী পঞ্চাশ বছরেও একটা প্লেন তৈরি করতে পারবে?'

'গো টু হেল!' ডক্টর হক চিৎকার করে বললেন।

একটা নিঃশ্বাস ফেলে সিধে হলো ভেনিনি। ভারসাম্য রক্ষার জন্য একটা কাউন্টারের কিনারা আঁকড়ে ধরল সে, তারপর ডক্টর হকের আহত উরুর উপর জুতো তুলল। 'কম্বিনেশনটা বলবেন?' শেষবারের মত জিজ্ঞেস করল সে।

কথা না বলে চোখে ঘৃণা নিয়ে তাকিয়ে থাকলেন সাজিদুল হক। তাঁর তাজা ক্ষতটার উপর এক পায়ে দাঁড়াল ভেনিনি। ডক্টর হকের আর্ত চিৎকারে কামরাটা

কেঁপে উঠল।

'হ্যাঁ-হ্যাঁ, চেঁচান–যত খুশি গলা ফাটান,' বলল ভেনিনি। 'কেউ আপনার চিৎকার শুনতে পাবে না। ওয়্যারহাউস বন্ধ। আমাদের সামনে সারাটা রাত পড়ে আছে, আর কে না জানে যে মারের চেয়ে বড় ওষুধ আজ পর্যন্ত আবিষ্কার হয়নি।' ক্ষতটার উপর আবার জুতোসুদ্ধ পা তুলে ধীরে ধীরে চাপ বাড়াতে লাগল সে।

গা জ্বালানো অলস একটা ভঙ্গিতে পাশেই দাঁড়িয়ে আছে বেলফোর। কমপিউটারের মনিটর পরীক্ষা করছে সে, স্ক্রিনে ফুটে থাকা হায়ার্যাগ্লিফিক্স-এর অর্থ বুঝবার চেষ্টা।

দু'মিনিটের মধ্যেই কম্বিনেশন নম্বরটা পেয়ে গেল ভেনিনি। বিজ্ঞানীর শরীরটা কুঁকড়ে, ভাঁজ খেয়ে মেঝেতে ভ্রূণের আকৃতি পেয়েছে, অনবরত ফোঁপাচ্ছেন ডক্টর হক। জুতোয় লাগা রক্ত তাঁর ট্রাউজারে ঘষে-ঘষে মুছল ভেনিনি, তারপর সেফের সামনে চলে গেল। কম্বিনেশন নম্বর ভুল দেননি ডক্টর হক, ওটা খুলতে মাত্র কয়েক সেকেন্ড সময় লাগল তার। সেফের ভিতর থেকে প্রথমে স্কিন-সেভেনটিনের ডিস্কটা বের করল সে। তারপর একে একে বের করল স্পেসিফিকেশন-এর প্রিভিয়াস ভার্সনগুলোর সমস্ত ব্যাকআপ কপি। মাস্টার ডিস্ক ছাড়া সবকিছু একটা প্লাস্টিক ব্যাগে ভরল সে, তারপর ফিজিসিস্ট-এর ডেস্কের সামনে এসে নির্দিষ্ট কিছু ফাইল ফোল্ডারের খোঁজে সমস্ত জিনিস এলোমেলো করে দিল। যা খুঁজছিল পেল সে, সেগুলোর সঙ্গে নতুন সমস্ত প্রিন্ট আউটও ব্যাগে ভরল।

'ভাল করে দেখে নিন, কিছুরই যেন কোন কপি থেকে না যায়,' বলল বেলফোর।

ডক্টর হকের কাছে ফিরে এসে হাঁটু গাড়ল ভেনিনি। 'সার, আমাদেরকে নিশ্চিত হতে হবে ফর্মুলাটার কোন চিহ্নমাত্র যেন এখানে রয়ে না যায়। দয়া করে বলুন, বাড়িতে কি কোনও কপি রেখেছেন? ব্যাকআপগুলো কোথায়?'

'সমস্ত ব্যাকআপ…অক্সফোর্ড আর সিডিআরএফ-এ…' কথা বলতে কষ্ট হচ্ছে বিজ্ঞানীর।

ভেনিনি ঘাড় ফিরিয়ে বেলফোরের দিকে তাকাল। মাথা ঝাঁকিয়ে বেলফোর বলল, 'হ্যাঁ, ওগুলো আগেই আমি পেয়েছি। সব নষ্ট করা হয়েছে।'

'আপনার বাড়িতে তা হলে কিছুই নেই?' আরেকবার জানতে চাইল ভেনিনি।

মাথা নাড়লেন ডক্টর হক। 'প্লিজ…' বিড় বিড় করছেন। 'আমার একজন ডাক্তার দরকার…'

'এখন আর তার সময় নেই, সার,' বলল ভেনিনি। সিধে হয়ে নিজের ডেস্কের দিকে হেঁটে এল সে। শান্ত ভাবে গোছগাছ শুরু করল; নিজের ব্যক্তিগত জিনিস, কাজে লাগতে পারে এমন কিছু ফাইল ফোল্ডার ব্রাউন রঙের একটা ব্রিফকেসে ভরল। এসময় ডক্টর হকের কাতর গলা আরও কর্কশ হয়ে উঠল, গোঙাচ্ছেন।

কয়েক মিনিট পর বেলফোর বলল, 'আহ্, ঈশ্বরের দোহাই, ডক্টর ভেনিনি! শালা বুড়োটাকে এভাবে ফেলে রাখছেন কেন?'

হাতের কাজ থামিয়ে ডক্টর হকের দিকে তাকাল ভেনিনি। গম্ভীর হলো

বেঈমানের চেহারা, তারপর আপনমনে মাথা ঝাঁকিয়ে হেঁটে এসে ডক্টর হকের সামনে দাঁড়াল। হাতে করে পিস্তলটা নিয়েই এসেছে, গুরুর মাথা লক্ষ্য করে তুলল সেটা।

'প্রচুর খেটেছেন আপনি, সেজন্যে ধন্যবাদ, সার,' বলল সে। একটাই গুলি করল। বন্ধ হয়ে গেল গোঙানি। এবার পিস্তলটা কাউন্টারে রেখে ব্রিফকেস থেকে লম্বা একটা ড্যাগার বের করল।

বেলফোর তার দিকে তাকিয়ে আছে।

গুড়ি মেরে বসল ভেনিনি, যথাসম্ভব চেষ্টা করছে কাপড়ে যাতে রক্ত না লাগে; ডক্টর হকের মাথার চুল খামচে ধরে পিছন দিকে টানল যাতে গলাটা কায়দা মত পায়। ছুরির ফলা লাশের চামড়ায় ঠেকিয়ে তৈরি হলো সে, এই সময় প্রতিবাদের সুরে বেলফোর জিজ্ঞেস করল, 'এটা কি না করলেই নয়?'

ভেনিনি জবাব দিল, 'এটাই আমাদের রীতি। জানি এই পর্যায়ে ব্যাপারটাকে অনাবশ্যক মনে হচ্ছে, কিন্তু আমিও তো হুকুমের দাসমাত্র।' ক্ষিপ্র বেগে এক কান থেকে আরেক কান পর্যন্ত ডক্টর হকের গলাটা কেটে ফেলল সে। কাজটা শেষ করে লাশের মাথা ছেড়ে দিল, চেহারা বিকৃত করে পিছিয়ে এল এক পা। ঝুঁকল, ডক্টর হকের ট্রাউজারে মুছল ছুরির ফলাটা। ছুরি রেখে দিয়ে কাউন্টার থেকে পিস্তলটা তুলল, তারপর বাড়িয়ে ধরল বেলফোরের দিকে। সবশেষে পকেট থেকে বাম হাত বের করে লাশের পেটের উপর রাখল একটা সোনার চাকতি।

অস্ত্রটা নিয়ে হোলস্টারে গুঁজল বেলফোর। 'ডক্টর, হার্ড ড্রাইভ থেকে সমস্ত ফাইল মুছে ফেলতে হবে। কিছুই যেন না থাকে। মাস্টার ডিস্কটা আমাকে দিন।'

ডিস্কটা বেলফোরের হাতে ধরিয়ে দিয়ে কমপিউটারে কাজ শুরু করল ভেনিনি। সঙ্গে করে নিয়ে আসা কালো বাক্সটা খুলল বেলফোর। জিনিসটা অদ্ভুতদর্শন, তবে যন্ত্র হিসাবে অত্যন্ত কাজের—এতে আছে একটা ল্যাপটপ কমপিউটার, সিডি-রম ড্রাইভ, মাইক্রোডট ক্যামেরা আর ডেভলপার। ডিস্কটা মেশিনে ঢোকাল সে, খুদে নবগুলো অ্যাডজাস্ট করে বন্ধ করে দিল কাভারটা। একটা বোতামে চাপ দিয়ে ডিস্কের ফাইল হার্ড ড্রাইভে কপি করল। বোতাম টিপে আরও কিছু কমান্ড দিল বেলফোর, ডেভলপারের কিনারা থেকে সাবধানে টেনে নিল একটা গ্লাস স্লাইড। ট্রেতে রাখল স্লাইডটা, সেটার উপর একটা ম্যাগনিফায়ার ধরল। অতি ক্ষুদ্র একটা মাইক্রোডট, পজিটিভ-টাইপ ফিল্মে তৈরি হয়েছে, খালি চোখে আসলে অদৃশ্যই, এই মুহূর্তে কাঁচটার উপর রয়েছে। কালো বাক্স থেকে পাতলা, স্বচ্ছ এক টুকরো ফিল্ম বের করল বেলফোর, গ্লাস স্লাইডে সযত্নে চেপে ধরল সেটা। মাইক্রোডট স্লাইড থেকে ফিল্মে চলে এসেছে। ফিল্মটা প্লাস্টিক এনভেলাপে ভরে সীল করল সে। এবার মাস্টার ডিস্কটা মেশিন থেকে বের করে মেঝেতে ফেলে জুতো দিয়ে মাড়িয়ে ভেঙে ফেলল।

বেলফোরের পরবর্তী কাজটা ভেনিনকে অবাক করল। অটোক্লেইভ খুলে স্কিন-সেভেনটিন প্রোটোটাইপ বের করল বেলফোর—রাবারের মত ছোট একটা জিনিস, স্পেসিমিন ট্রে-র উপর লম্বা হয়ে আছে। সেটা ডক্টর হকের জ্যাকেটের পকেটে রেখে দিল সে। 'ব্যস!' জোরে একটা নিঃশ্বাস ফেলল। 'স্কিন-

সেভেনটিনের একমাত্র রেকর্ড এখন শুধু এই মাইক্রোডটে রইল। এটার খুব যত্ন নেবেন।'

বেলফোরের বাড়ানো হাত থেকে এনভেলাপটা নিয়ে ভেনিনি বলল, 'ঠিক, এই হার্ড ড্রাইভ সম্পূর্ণ খালি।' এনভেলাপটা ব্রিফকেসে ভরে রাখল সে। 'যাই, আমি পেট্রল নিয়ে আসি।'

হঠাৎ হেসে উঠল বেলফোর।

চমকে উঠে তার দিকে তাকাল ভেনিন। 'কী হলো?'

'না, মানে, ভাবছি–পুড়ে ছাই হয়ে গেলেও, এটা নিশ্চয়ই বোঝা যাবে যে লাশটা দ্বিখণ্ডিত করা হয়েছিল। কিন্তু সোনার চাকতিটা? ওটা কী গলে যাবে না?'

'তোমাকে তো বললামই, হুকুম পালন করছি আমি,' বলে ল্যাব থেকে বেরিয়ে এল ভেনিনি। সিঁড়ি বেয়ে নীচে নেমে অফিস স্পেস্-এর পিছনে একটা স্টোরেজ ক্লজিটে ঢুকল সে। এখানে আগেই পেট্রলের দুটো ক্যান নিয়ে এসে রেখেছে সে, প্রতিটি পাঁচ গ্যালনের। ক্যান দুটো নিয়ে ল্যাবে ফিরে এল, খুলল একটা, তারপর হড় হড় করে মেঝে আর ফার্নিচারে ঢালল।

ব্যাকআপ কপি আর প্রিন্টআউট ভর্তি ব্যাগটা ডক্টর হকের লাশের পাশেই রেখেছে বেলফোর। 'খেয়াল রাখবেন, কমপিউটার আর অটোক্লেইভ যেন ভাল করে পেট্রলে ভেজে,' বলল সে, দ্বিতীয় ক্যানটা নিয়ে ল্যাবের আরেক মাথায় চলে এসেছে। লাশ আর প্রোটোটাইপে বেশি করে পেট্রল ঢালল। ক্যান দুটো প্রায় খালি না করে থামল না বিশ্বাসঘাতকরা।

বেলফোর ছোঁ দিয়ে কালো বাক্সটা তুলে নিল। ভেনিনি হাতে ঝোলাল তার ব্রিফকেস। সিঁড়ি বেয়ে নামবার সময় পিছু হটছে তারা, এখনও পেট্রল ঢালছে। খালি গ্রাউন্ড লেভেল হয়ে অন্ধকার দরজার কাছে পৌঁছে গেল দু'জন, এবার শূন্য ক্যান দুটো ফেলে দিল। দেয়ালের গায়ে বসানো এক সেট বোতামে চাপ দিল ভেনিনি, দরজা খুলে গেল। ইতোমধ্যে পকেট থেকে রুমাল বের করে লাইটার জ্বেলে তাতে আগুন ধরিয়েছে বেলফোর। শান্ত ভঙ্গিতে জ্বলন্ত রুমালটা নিজের পিছন দিকে ছুঁড়ে দিল সে। সঙ্গে সঙ্গে জ্বলে উঠল পেট্রল। চোখের পলকে ছড়িয়ে পড়ছে কমলা শিখা।

নিজের পিছনে দরজাটা বন্ধ করে দিল বেলফোর, শান্তভাবে হেঁটে এসে একটা বিএমডব্লিউ ৭৫০-এ চড়ল। দালানটা থেকে মাত্র বিশ গজ দূরে পার্ক করা রয়েছে গাড়িটা। হুইলের পিছনে বেলফোর বসেছে। লন্ডনের দিকে ছুটল গাড়ি। কেউ ওদেরকে দেখল না।

পাঁচ মিনিটের মধ্যেই দমকল বাহিনীকে সতর্ক করা হলো, কিন্তু তারপরও অনেক দেরি হয়ে গেছে। আগুনের শিখা ইতোমধ্যে লাবরেটরিকে পুরোপুরি গ্রাস করে ফেলেছে। পেট্রল তো ওখানেই বেশি ঢালা হয়েছিল। দালানটা পরিণত হলো মস্ত এক অগ্নিকুণ্ডে। দমকল বাহিনীর লোকেরা তাদের সাধ্যের মধ্যে সম্ভাব্য সবকিছু করল, কিন্তু বৃথাই। মাত্র পনেরো মিনিটের মধ্যে ফ্লীট-এর গোপন কমনওয়েলথ ডিফেন্স অ্যান্ড রিসার্চ ফ্যাসিলিটিজ সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে গেল।

বিএমডব্লিউ ছুটছে, ভেনিনি একটা মোবাইল ফোনের দিকে হাত বাড়াল:

'আমাকে আমার হেডকোয়ার্টারের সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে।'

তার বাহুতে একটা হাত রাখল বেলফোর। 'আমার মোবাইল নয়, স্টেশন থেকে পে ফোন ব্যবহার করবেন।'

ভেনিনিকে ওয়াটারলু স্টেশনে নামিয়ে দিল বেলফোর। ভেনিনির সঙ্গে এখন ব্রিফকেস ছাড়াও একটা ব্যাগ রয়েছে। এই ব্যাগটা আগে থেকেই গাড়ির ট্রাঙ্কে ছিল। ব্রাসেলসগামী ইউরোস্টার-এর একটা টিকিট কেনা আছে, আজকের মত এটাই ইউরোস্টারের শেষ যাত্রা। ট্রেনে চড়বার আগে একটা ফোন বুদে ঢুকে মরক্কোর বিশেষ একটা নম্বরে ডায়াল করল ভেনিনি।

অপরপ্রান্ত থেকে সাড়া পাওয়ার অপেক্ষায় রয়েছে সে, মনে মনে একটা হিসাব কষছে স্কিন-সেভেনটিন তাকে কী পরিমাণ টাকা এনে দেবে।

অবশেষে অপরপ্রান্তে কেউ এল। 'ইয়েস?'

'লন্ডন থেকে পাইথন। প্রথম পর্ব ভালভাবে শেষ হয়েছে। ওটা আমার কাছে। শুরু হতে যাচ্ছে দ্বিতীয় পর্ব।'

'ওয়ান্ডারফুল। মেসেজটা আমি রিলে করছি। আপনার জন্যে শেরাটনের একটা স্যুইট বুক করা আছে, ডেভিড নোলান নামে।'

'রাইট।' যোগাযোগ কেটে দিল ভেনিনি।

চার

রানা এজেন্সি, লন্ডন শাখা। কমপিউটারাইজড্ এনসাইক্লো-পিডিয়ার নাম দেওয়া হয়েছে 'ভিজুয়াল লাইব্রেরি', ওটার সঙ্গে সংযুক্ত ওয়াল-সাইজড্ মনিটরের সামনে বসে জিএম অর্থাৎ 'গ্রুপ অভ মার্সেনারি'র ইতিহাস জেনে নিচ্ছে রানা।

জিএম একটা কমার্শিয়াল টেরোরিস্ট গ্রুপ। এদের কর্মকাণ্ড শুরু হয় প্রকাশ্যে নির্দোষ বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে। প্রথম বিজ্ঞাপনটা ছাপা হয় 'হায়ার্ড গান' নামে একটা মার্কিন পত্রিকায়। তার ভাষা ছিল এরকম: 'বীরভোগ্যা বসুন্ধরা! গ্রুপ অভ মার্সেনারিতে যোগ দিয়ে বীরত্ব প্রদর্শনের সুযোগ নিন। দুনিয়াটা ঘুরে দেখুন! লাখ লাখ ডলার কামান!' পরে এ-ধরনের বিজ্ঞাপন আমেরিকার আর ইউরোপের প্রায় সব প্রধান পত্রিকায় ছাপা হয়েছে। জিএম আসলে কার্ট হাসলার নামে একজন এক্স-মেরিনের উর্বর মস্তিষ্কের ফসল। লোকটা একসময় লাস ভেগাসে সিকিউরিটি গার্ডের চাকরি করত।

মনিটর স্ক্রীনে হাসলারের ফটো দেখা গেল। দু'হাজার সালে তার বয়স ছিল ছত্রিশ। কামানো মাথা। কপালে উলকি হিসাবে স্বস্তিকা আঁকা। তার নেতৃত্বে একটা মিছিল মারমুখী হয়ে ওঠায় পুলিশ বেশ কিছু মার্সেনারিকে গ্রেফতার করে। বছরের শেষ দিকে নেতৃত্ব নিয়ে গণ্ডগোল দেখা দেয়, দু'হাজার এক সালের মার্চ মাসে খুন হয় হাসলার। জিএম-এর হাল ধরে একজন সাবেক মার্কিন জেনারেল—সাইমন পাওয়ারস্। তাঁর নেতৃত্বেই জিএম পুরোপুরি আন্ডারগ্রাউন্ডে

চলে যায়। এবং সুসংগঠিত হয়ে ওঠে। পাওয়ারস্ মাফিয়ার আদলে প্রশাসনিক স্তর তৈরি করে ক্ষমতা ভাগ করে দেয়। সবার উপরে একজন ম্যানেজার ব প্রেসিডেন্ট, তাঁর নীচে তিন বা চারজন বিশ্বস্ত লেফটেন্যান্ট। এই লেফটেন্যান্টর প্রত্যেকে ডাকাত, কিডন্যাপার, ভাড়াটে খুনী, ব্ল্যাকমেইলার, ঋণ খেলাপি, নারী ব্যবসায়ী, ড্রাগ স্মাগলার, আর্মস ডিলারসহ সম্ভাব্য সব জাতের অপরাধীদের নিয়ে দুনিয়া জোড়া বিশাল একেকটা নেটওঅর্ক নিয়ন্ত্রণ করে।

তথ্য আহরণের এই পর্যায়ে বাধা পেল রানা। ডেস্কে তিনটে টেলিফোন সেট তার মধ্যে লাল অর্থাৎ বিসিআই হেডকোয়ার্টার, ঢাকার সঙ্গে হটলাইনটা বাজছে আর ফ্ল্যাশ করছে। স্বভাবতই পালস্ রেট বেড়ে গেল রানার, জানে চীফ স্বয়ং ফোন করেছেন।

একটা মাত্র টোকায় কমপিউটার বন্ধ করে ফোনের রিসিভার তুলল রানা। 'জী?'

'খুব বড় একটা দুঃসংবাদ, এমআর নাইন,' বিসিআই চীফ রাহাত খানের গম্ভীর সম্বোধন শুনে রানার বুকের রক্ত ছলকে উঠল। 'খবরটা তুমি পাওনি, কারণ এখনও মিডিয়াকে কিছু জানাচ্ছে না ওরা। বিজ্ঞানী ডক্টর সাজিদুল হকের নাম শুনেছ তো? হি ইজ ডেড–ব্রুটালি মার্ডারড্।'

হতভম্ব রানার মুখে কথা সরছে না। 'ডেড?' বসের বলা কথাই পুনরাবৃত্তি করল। 'মার্ডারড্?'

'এটা এদেশের বিরাট এক ক্ষতি,' বললেন মেজর জেনারেল (অবসরপ্রাপ্ত) রাহাত খান। 'দেশ একজন সাধু ব্যক্তি, জন্মভূমির প্রতি কর্তব্যনিষ্ঠ, সাধক, হবু নোবেল লরিয়েটকে হারিয়েছে। ওঁর গবেষণার সাবজেক্ট সম্পর্কে তোমার কোন ধারণা আছে?'

'সোহেল বলছিল অ্যারোপ্লেনের স্পিড নিয়ে কাজ করছিলেন...'

'হ্যাঁ। তবে ভাসা ভাসা ধারণা থাকলে চলবে না, বিস্তারিত জানতে হবে তোমাকে,' বাধা দিয়ে বললেন রাহাত খান। 'প্রথম কথা, সিডিআরএফ-এ তাঁর গবেষণা থেকে যে জিনিসটা আবিষ্কৃত হয়েছে সেটার স্বত্ব বাংলাদেশের। ব্রিটিশ সিক্রেট সার্ভিসের চীফ মার্ভিন লংফেলো কাল রাতেই আমাকে ফোন করে জানিয়েছেন, ফর্মুলাটা নাকি পাওয়া যাচ্ছে না। আমার জানা মতে কাল রাতে শুরু হওবার পর ওঁদের ম্যারাথন মীটিংটা এখনও চলছে। তিনি আমাকে কথা দিয়েছেন, ঠিক কীভাবে কী ঘটেছে পরিষ্কার ধারণা পাওয়ার পর তোমাকে ডেকে সব বুঝিয়ে বলবেন।'

'সার, ওরা কি আমাকে ওদের কোন অ্যাসাইনমেন্টের দায়িত্ব নিতে বলবে?'

'জানি না। বলতে পারে। যদি বলে, নিশ্চয়ই ফর্মুলাটা উদ্ধার করে দিতে বলবে। কিন্তু এই একই অ্যাসাইনমেন্ট বিসিআইএ-র কাছে থেকে তুমি তো আগেই পেয়ে গেছ, কাজেই ওদের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করা ছাড়া উপায় কী তোমার।'

'জী?'

'আহা, ওদেরকে এই কথাই বলবে আর কি,' রানা বুঝতে দেরি করছে

দেখে ধমক দিলেন বস্। 'ও, হ্যাঁ, অ্যাসাইনমেন্ট তুমি একটা পাচ্ছ, ওদের মীটিং থেকে ফেরার পর।'

'জী-সার, বুঝেছি।'

'তোমার রিপোর্ট পাওয়ার জন্যে আমি অপেক্ষায় থাকব। টেকনিশিয়ানরা প্রস্তুতি নেয়ার সময় পেলে একটা টেলি-কনফারেন্সের আয়োজন করা হতে পারে।' যোগাযোগ কেটে দিলেন তিনি।

ঠিক সেই মুহূর্তে সাদা ফোনটা বেজে উঠল। বিএসএস চীফ মার্ভিন লংফেলো ফোন করেছেন।

'কাল রাতে আমাদের দেশের বিরুদ্ধে ইন্ডাস্ট্রিয়াল এসপিওনাজ এবং সন্ত্রাসী তৎপরতা চালানো হয়েছে,' ভাষণ দিতে উঠে এভাবেই শুরু করলেন ব্রিটেনের প্রতিরক্ষামন্ত্রী। বিএসএস ব্রিফিংরুমে প্রায় একশোর মত কর্মকর্তা জড়ো হয়েছেন। কয়েকজন মন্ত্রী, সেক্রেটারি, বিভিন্ন গোয়েন্দা সংস্থার প্রধান বা উপপ্রধান, এয়ারমার্শাল, এমফিফটিন-এর হেড, এস-এর চীফ, কমনওয়েলথ-এর কয়েকজন ব্রিটিশ কর্মকর্তা, ইন্টারপোল ডিরেক্টর আর রয়্যাল এয়ারফোর্সের তরফ থেকে গ্রুপ ক্যাপটেন মন্টি বেলফোরকে চিনতে পারল রানা। মার্ভিন লংফেলো সভাপতিত্ব করছেন।

এরই মধ্যে দু'একজনের বক্তব্য শুনবার দুর্ভাগ্য রানার হয়েছে। শুনে এত দুঃখেও হাসি পেয়েছে ওর। বক্তাদের কাণ্ড-জ্ঞান বা লজ্জা, দুটোরই ভারী অভাব। কী চুরি গেছে সেটা নিয়ে সবাই খুব মাতামাতি করছে অথচ জিনিসটা কে আবিষ্কার করলেন, তিনি কোথাকার লোক, জিনিসটার স্বত্ব কার এসব নিয়ে ভুলেও কেউ একটা টুঁ-শব্দ করছে না।

'স্কিন-সেভেনটিন নামে টপ সিক্রেট ফর্মুলা সিডিআরএফ-এর একটা গোপন রিসার্চ ফ্যাসিলিটি থেকে চুরি গেছে। ওটা ফ্লীট-এর একটা রিসার্চ ফ্যাসিলিটিতে ছিল। দায়ী অপরাধীদের ধরা এবং ফর্মুলাটা উদ্ধার করা গ্রেট ব্রিটেনের জন্যে অত্যন্ত জরুরী। মার্লোন উডকক, সিডিআরএফ-এর ডিরেক্টর, ব্যাপারটার গুরুত্ব ব্যাখ্যা করবেন।'

উডকক ছোটখাট মানুষ, বয়স হবে পঞ্চাশ। শুরু করলেন তিনি: 'ওটা সিডিআরএফ ডেভলপ করছিল প্রকারান্তরে রয়্যাল এয়ারফোর্সের জন্যেই,' এতগুলো মান্যগণ্য ও প্রভাবশালী লোকজনের সামনে ডাহা মিথ্যে কথা বলতে এতটুকু বাধছে না তাঁরও। 'এটা তো গ্রেট ব্রিটেনের অনেক পুরানো একটা লক্ষ্য যে অন্যান্য সব রাষ্ট্রের আগে এমন একটা এয়ারক্রাফট মেটিরিয়াল আবিষ্কার করা যেটা মাক সেভেন স্পিড সহ্য করতে বা ওই স্পিডে প্রেশার রেজিস্ট করতে পারবে।

'এখনও ধরা ছোঁয়ার বাইরে স্রেফ একটা স্বপ্ন এই মাক সেভেন, এরোস্পেস শিল্পে জাদুর একটা কাঠি। অথচ সবাই আমরা জানি যে ওরকম স্পিডে একটা প্লেন চালাতে যে পাওয়ার লাগবে তা সাপ্লাই করা সম্ভব, সম্ভব সে-ধরনের একটা এয়ারফ্রেম তৈরি করাও।

'এই জাদুর কাঠি তৈরি হলে সিভিল, এবং বিশেষ করে মিলিটারি এভিয়েশন-এর লাভ বলে শেষ করা যাবে না। আপনারা লন্ডন থেকে নিউ ইয়র্কে বেড়াতে যেতে পারবেন চল্লিশ মিনিটে। কিংবা তিনটে দেশে বোমা ফেলে আসতে পারবেন আধঘণ্টার মধ্যে।

'বাধাটা কোথায় ছিল? বাধা একটাই–স্পিড অত বেশি হলে শুধু অ্যাটমস্‌ফেরিক ডাস্ট বা ধুলোই প্লেনের ত্বক তোবড়াতে আর ছিঁড়ে ফেলতে যথেষ্ট। এই সংকট এড়াবার উপায় পাওয়া গেছে ফ্লুইড ডায়ন্যামিক্স-এর বিজ্ঞানে। কোন বস্তু ফ্লুইডের ভেতর দিয়ে রওনা হলে নিজের চারদিকে একটা বাউন্ডারি লেয়ার বা সীমানা স্তর তৈরি করে, যেটা অব্যর্থভাবে ফ্লুইডের এলিমেন্ট পথ থেকে ঠেলে সরিয়ে দেয়, তৈরি করে একটা 'টানেল এফেক্ট'। এই টানেল দিয়েই বস্তু অপেক্ষাকৃত অবাধে আসা-যাওয়া করে। বিজ্ঞানের কাছ থেকে প্লেনের জন্যে এমন একটা "স্মার্ট স্কিন" মেটিরিয়াল চাওয়া হচ্ছিল যেটা ওই বাউন্ডারি লেয়ার প্রসারিত আর পরিবর্তন করতে পারবে, নিখুঁতভাবে গঠন করবে অনুকূল অ্যারোডাইনামিক কনফিগারেশান, যার ভিতর দিয়ে প্লেনটা উড়বে। এই মেটিরিয়াল হতে পারে একটা কার্বন-ফাইবার আর সিলিকা সিরামিক। কিন্তু কার্বন-ফাইবার আর সিলিকা যেহেতু সহজে পরস্পরের সঙ্গে আটকায় না, তাই সিডিআরএফ-এর একজন বিজ্ঞানী গত দু'বছর ধরে গবেষণা করে একটা হট প্লাজমা বন্ডিং প্রসেস উদ্ভাবন করেছেন।'

মনিটরের বিশাল স্ক্রীনে স্লাইড আসতে দেখা গেল। প্রথমটা ডক্টর সাজিদুল হকের একটা ফটো।

'ডক্টর সাজিদুল হক। উনি এই সাবজেক্ট নিয়ে অক্সফোর্ডে গবেষণা করছিলেন। তাঁকে আমরা সিডিআরএফ-এ ডেকে নিই। ফ্লীট-এর একটা ওয়্যারহাউসে ছিল তাঁর গোপন ল্যাব। গতকাল তিনি তাঁর ফর্মুলা সাফল্যের সঙ্গে শেষ করেছেন–কিংবা বলা উচিত আমরা তাই বিশ্বাস করি। এটা অমূল্য একটা সম্পদ; এর জন্য কয়েক বিলিয়ন পাউন্ড দাম হাঁকা যেতে পারে।'

স্লাইড বদলে গেল। ফ্লীট ওয়্যারহাউসের ভিতরের দৃশ্য দেখা যাচ্ছে।

'কাল রাত একুশ ঘণ্টার কিছু পর ফ্লীট ল্যাবে কেউ চুরি করে ঢুকেছিল। গোটা ফ্যাসিলিটি পুড়িয়ে ছাই করে ফেলা হয়েছে। সমস্ত সরঞ্জামে এবং রেকর্ড ধ্বংস হয়ে গেছে, প্রায় কিছুই উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি। অবশ্য কাপুরুষতা এবং নির্মমতার শিকার ডক্টর হকের অবশিষ্টাংশ পেয়েছি আমরা। তাঁর পায়ে আর মাথায় গুলি করা হয়েছে। স্কিন-সেভেনটিন, তাঁর তৈরি স্পেসিফিকেশান সহ গায়েব হয়ে গেছে। চোরেরা ফর্মুলাটার আগের সংস্করণগুলোও অক্সফোর্ড আর সিডিআরএফ-এর ফার্নবারা ফ্যাসিলিটি থেকে সরিয়ে নিয়ে গেছে। দুঃখের সঙ্গে বলতে বাধ্য হচ্ছি, এ থেকে পরিষ্কার বোঝা যায়, এই হত্যাকাণ্ড আর চুরির সঙ্গে সিডিআরএফ-এর কেউ না কেউ জড়িত।'

স্লাইড আবার বদলাল। এবার ডক্টর হিউগো ভেনিনির ফটো দেখা যাচ্ছে।

'ইনি ডক্টর হিউগো ভেনিনি, ডক্টর সাজিদুল হকের ডান হাত হিসেবে কাজ করছিলেন। টিমের বাকি সদস্যকে দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে খবর দিয়ে আনা

হয়েছে, তাঁরা সবাই এখন এই মীটিঙে উপস্থিত আছেন। কাল ডক্টর হক তাঁদের সবাইকে ছুটি দিয়ে দিয়েছিলেন, কারণ স্কেইলেবল প্রোটোটাইপটার ফাইন্যাল টেস্ট তিনি একা করতে চেয়েছিলেন। আমরা জানি যে ডক্টর হক একটা নির্দেশ দিয়েছিলেন ডক্টর ভেনিনি যাতে রাত ন'টার দিকে ল্যাবে আসেন। সেই নির্দেশ অনুসারে তিনি গিয়েছিলেন কিনা আমরা জানি না, তবে খুবই উদ্বেগের সঙ্গে লক্ষ করছি যে ডক্টর ভেনিনি এখনও নিখোঁজ রয়েছেন। অনেক খোঁজা হয়েছে, কিন্তু কোথাও তাঁকে পাওয়া যায়নি।'

'কী আশ্চর্য, তাই না,' ঝুঁকে সামনের সারির চেয়ারে বসা বেলফোরের কানের কাছে ফিসফিস করল রানা, 'কালই তো তাঁকে তোমার সঙ্গে ক্লাবে দেখলাম।'

'হ্যাঁ,' জবাব দিল বেলফোর। 'গোটা ব্যাপারটা খুবই বিদঘুটে লাগছে আমার।'

মার্লোন উড়কক বললেন, 'স্মার্ট স্কিন প্রজেক্টে আরএএফ লিয়েইজন, গ্রুপ ক্যাপটেন মন্টি বেলফোরকে স্টেজে আসার আহ্বান জানাচ্ছি আমি।'

শান্ত অথচ আড়ষ্ট ভঙ্গিতে চেয়ার ছেড়ে উঠে কামরার সামনে উঁচু জায়গাটায় গিয়ে দাঁড়াল বেলফোর। কেউ তাকে কিছু জিজ্ঞেস করবার আগে সে নিজেই শুরু করল, 'সবাইকে ধন্যবাদ। কোন প্রশ্নের জবাব দেওয়ার আগে আমি একটা শোক প্রস্তাব তুলছি—আসুন, এক মিনিট নীরবতা পালন করে ডক্টর সাজিদুল হকের আত্মার প্রতি সবাই আমরা শ্রদ্ধা জানাই।'

তার কথা শুনে সবাই দাঁড়িয়ে পড়ল। নীরবতা পালনের পর আবার তার গলা শোনা গেল: 'এবার, মিস্টার মার্ভিন লংফেলো এবং অন্যান্য কর্মকর্তাদের হাতে নিজেকে আমি তুলে দিচ্ছি।'

ব্রিটিশ সিক্রেট সার্ভিসের চীফ মার্ভিন লংফেলোই প্রথমে তাকে প্রশ্ন করলেন, 'গ্রুপ ক্যাপটেন, আমরা শুনলাম কাল তোমাকে ডক্টর ভেনিনির সঙ্গে দেখা গেছে।'

'ইয়েস, সার,' জবাব দিল বেলফোর। 'তাঁর সঙ্গে কাল আমি লর্ড লিফটন ক্লাবে গলফ খেলেছি। বিকেল পাঁচটার দিকে পরস্পরের কাছ থেকে বিদায় নিই আমরা।'

'তিনি কী তাঁর প্ল্যান সম্পর্কে তোমাকে কোন আভাস দিয়েছিলেন?'

'না, সার। তবে আমি জানতাম যে ডক্টর হক তাঁর টিমকে কাল ছুটি দিয়েছেন। ডক্টর ভেনিনি বলছিলেন, ডক্টর হক স্কিন-সেভেনটিন শেষ করার খুব কাছে পৌঁছে গেছেন। ডক্টর হকের কাছ থেকে ভাল-মন্দ একটা খবর পাওয়ার জন্যে ভয়ানক অস্থির হয়ে ছিলেন তিনি। কী ঘটছে জানার জন্যে ক্লাব থেকে দু'বার ফোনও করেন। রাতে ল্যাবে তাঁর যাবার কথা ছিল, কিন্তু তবু তিনি ধৈর্য ধরতে পারছিলেন না।'

'ডক্টর ভেনিনিকে তুমি কতটুকু চেনো?' ডিএসএস চীফ জানতে চাইলেন।

'খুব একটা ঘনিষ্ঠভাবে নয়। তবে প্রশাসনিক কাজে গত দু'বছর ধরে প্রায় প্রতিদিনই তাঁর সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ হয়েছে। আমার কাজ ছিল স্মার্ট স্কিন প্রজেক্ট সুপারভাইজ করা। এক পর্যায়ে আমরা জানতে পারি দু'জনেরই গলফ খেলার শখ আছে। এটুকুই। কাল নিয়ে তৃতীয়বার একসঙ্গে খেলেছি আমরা।'

একের পর এক বহু প্রশ্নই করা হলো তাকে, শান্ত দৃঢ়তার সঙ্গে প্রতিটি প্রশ্নের জবাব দিয়ে নিজেকে সন্দেহের ঊর্ধ্বে রাখতে সমর্থ হলো বেলফোর। একঘণ্টা ধরে জেরা চলল, শেষ দিকে মার্ভিন লংফেলো জানতে চাইলেন, 'তোমার কোন ধারণা আছে এই মুহূর্তে কোথায় থাকতে পারেন ডক্টর ভেনিনি?'

'দুঃখিত—না।'

'তোমার কী মনে হয়, এ-ধরনের একটা কাজ তাঁর পক্ষে করা সম্ভব?'

জবাব দেওয়ার আগে চিন্তা করতে দেখা গেল বেলফোরকে: 'না, আমার তা মনে হয় না। তাঁকে আমার সবসময় শান্ত, নিজের ভেতর গুটিয়ে থাকা, অত্যন্ত মেধাবী একজন মানুষ বলে মনে হয়েছে। তাঁর দেহ-মনে কোথাও একবিন্দু ভায়োলেন্স আছে, এ আমি বিশ্বাস করতে পারি না। আমার বরং ধারণা, ডক্টর হকের মত ডক্টর ভেনিনির ভাগ্যেও মর্মান্তিক কিছু ঘটেছে।'

মনিটরের স্ক্রিনে এবার একটুকরো কাগজ দেখা গেল। একটা ফ্যাক্স পেপার। তাতে লেখা:

'স্কিন প্রজেক্টের প্রতি শুভেচ্ছা রইল। আপনার সাফল্যের ব্যাপারে আমরা খুব উৎসাহী। গ্রুপ অভ মার্সেনারি।'

শিরদাঁড়ায় শিরশিরে একটা অনুভূতি হলো রানার।

বেলফোর এখনও বলে যাচ্ছে। 'এই জিএম সম্পর্কে বেশি কিছু আমি জানি না, মাত্র আজ সকালে ওদের সাম্প্রতিক তৎপরতা সম্পর্কে আমাকে ব্রিফ করা হয়েছে। আমার ধারণা, এ-ধরনের কাজ ওদের পক্ষে সম্ভব। আর কোন প্রশ্ন, সার?'

সিদ্ধান্ত হলো, প্রশ্নোত্তর পর্ব আবার শুরু হবে লাঞ্চের পর। ডক্টর হকের টিমের সব সদস্যকেই একে একে জেরা করা হবে। রানার মনে একটা প্রশ্ন জেগেছে, সেটা উচ্চারণ করবার সুযোগ পাওয়া গেল মার্ভিন লংফেলো ওকে নিজের চেম্বারে লাঞ্চ খেতে আমন্ত্রণ জানাতে। সময়ের অভাবে লাঞ্চের আমন্ত্রণ রক্ষা করতে পারছে না বলে ক্ষমা চেয়ে নিল রানা, তবে দু'মিনিট বসে বিষয়টা নিয়ে আলাপ করতে রাজি হলো।

চেম্বারে ঢুকে বসতে না বসতে রানা নাটকীয় একটা ভূমিকা নিল: 'আমার যদি দেখার ভুল না হয়, আপনাকে একটু বিব্রত দেখাচ্ছে, মিস্টার লংফেলো। কারণটা আপনি ব্যাখ্যা করবেন, নাকি আমি আন্দাজ করব?'

একটু হকচকিয়ে গেলেন বিএসএস চীফ। 'গো অ্যাহেড।'

'এত লোক এত কথা বলল, কিন্তু কেউ ভুলেও একবার উল্লেখ করলে না যে সমস্ত কৃতিত্ব ডক্টর হকের প্রাপ্য বা ফর্মুলাটার স্বত্ব তিনি বাংলাদেশেকে দিয়ে গেছেন।'

'হ্যাঁ, সে কথাই ভাবছিলাম বটে,' ম্লানমুখে স্বীকার করলেন মার্ভিন লংফেলো। 'একটু পরই তোমার বসের সঙ্গে আমার কথা হবে, আমি তখন দুঃখ প্রকাশ করব। আসলে সবাই ওরা ইল-ইনফর্মড—আসল কথাটা জানে না। তো যাক। আমি শুনলাম, তুমি নাকি কাল গ্রুপ ক্যাপটেন মন্টি বেলফোরের সঙ্গে পিংপং খেলেছ আর সাঁতার কেটেছ। সে সময় তোমার সঙ্গে মিস্টার সোহেল আর

বেলফোরের সঙ্গে ডক্টর ভেনিনি ছিলেন।'

'হ্যাঁ।'

'তোমার ধারণাটা আমি জানতে চাই।'

কাঁধ ঝাঁকাল রানা। 'আমি অন্ধকারে। ডক্টর ভেনিনি সম্পর্কে বেলফোরের ধারণা বোধহয় ঠিকই আছে, এই টাইপের মানুষ এ-ধরনের কাজ করতে পারেন বলে বিশ্বাস হয় না। আমার সন্দেহের তালিকায় বেলফোর বরং অনেক ওপরে।

মার্ভিন লংফেলো যেন বিস্ময়ের একটা ধাক্কা খেলেন: 'কী বলছ! কেন?'

'কারণ সে লোভী আর কাণ্ডজ্ঞানহীন গোঁয়ার।'

রানার জবাব বিএসএস চীফ গ্রহণযোগ্য বলে মনে করলেন না। 'তোমাদের প্রতিদ্বন্দ্বিতা সম্পর্কে আমার জানা আছে,' বললেন তিনি। 'প্লিজ, রানা, এই ব্যাপারটায় ব্যক্তিগত রেষারেষির যেন কোন ভূমিকা না থাকে।'

'আমি ওসব ভুলে গিয়েই বলছি, বেলফোর মানুষ ভাল নয়।'

'গ্রুপ ক্যাপটেন বেলফোর অত্যন্ত দক্ষ একজন অফিসার। যুদ্ধে কৃতিত্বের জন্যে জাতীয় বীর হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে। তুমি নিশ্চয়ই তার পর্বত আরোহণের সাফল্য সম্পর্কেও খবর রাখো?'

'রাখি। তারপরও বলব, বেলফোরকে আমি মানুষ বলে মনে করি না।'

'তোমার এই ধারণা যথাযথ গুরুত্ব পাবে,' প্রতিশ্রুতি দেওয়ার সুরে বললেন বিএসএস চীফ। 'এবার বলো, কেমন আছ? খুব ব্যস্ত নাকি?'

'আমার একটা প্রশ্ন আছে, মিস্টার লংফেলো।'

'হ্যাঁ, বলো।'

'নৃশংস একটা হত্যাকাণ্ড ঘটে গেছে,' বলল রানা। 'চুরি গেছে যুগান্তকারী একটা আবিষ্কারের ফর্মুলা। সবার আগে জেরা করার কথা সিকিউরিটির লোকজনকে, তাই না। অথচ তাদের কাউকেই তো মীটিঙে দেখলাম না।'

'ওদেরকে ইন্টারোগেটর টিম এই বিল্ডিঙেরই অন্য অংশে জেরা করছে, রানা,' বললেন লংফেলো। 'কাল রাত থেকেই শুরু হয়েছে। কিন্তু কেউ বলতে পারছে না সমস্ত ইলেকট্রনিক্স সার্ভেইলান্স ইকুইপমেন্ট কীভাবে অফ হয়ে গিয়েছিল।'

'ও।'

'তুমি কিন্তু আমার প্রশ্নের জবাব দাওনি, রানা।'

'জী, খুবই ব্যস্ত, মিস্টার লংফেলো,' বলল রানা, চেয়ার ছেড়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। 'বস্ আমাকে একটা অ্যাসাইনমেন্টে পাঠাবেন। সম্ভবত আমাদের ফর্মুলাটা আমাকে উদ্ধার করতে যেতে হবে।' বিএসএস চীফের বাড়িয়ে দেওয়া হাতটা ধরে ঝাঁকাল ও, তারপর বিদায় নিয়ে বেরিয়ে এল তাঁর চেম্বার থেকে।

এজেন্সিতে ফিরে রানা জানতে পারল, এদিক থেকে সুইচ অন করলেই রাহাত খান আর সোহেলের সঙ্গে ওর টেলি-কনফারেন্স শুরু হতে পারে। বস্ বিসিআইএ-র হেডকোয়ার্টার ঢাকায় রয়েছেন, সোহেল রয়েছে ইন্টারপোল-এর স্যাটেলাইট কমিউনিকেশন সেন্টারে। বোতামে চাপ দিতেই রানার বিয়াল্লিশ ইঞ্চি টিভি

মনিটরের অর্ধেকটায় রাহাত খানকে দেখা গেল, টেলিফোনে কার সঙ্গে যেন কথা বলছেন, চোখে-মুখে রাত্রি জাগরণের ছাপ। স্ক্রীনের বাকি অর্ধেকে সোহেলকে দেখা যাচ্ছে, একটা সুসজ্জিত কমিউনিকেশনরুমে বসে আছে, হাতে একটা বেশ বড় সাইজের ফটোগ্রাফ।

রাহাত খান ফোনের আলাপ শেষ করে ওদের দু'জনের উদ্দেশে বললেন, 'হ্যাঁ, কার কী বলার আছে শুনি। প্রথমে রানা।'

বিএসএস হেডকোয়ার্টারে কী ঘটেছে তার একটা সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিল রানা। শুনে রাহাত খান কোন মন্তব্য করলেন না, শুধু বললেন, 'মিস্টার লংফেলোর সঙ্গে আমারও আলাপ হয়েছে। এবার সোহেল।'

হাতের ফটোগ্রাফটা ক্যামেরার দিকে তুলে ধরল সোহেল। 'এই ছবিটায় ডক্টর হিউগো ভেনিনি রয়েছেন, সার–এইট-বাই-টেন গ্লসি ব্ল্যাক-অ্যান্ড-হোয়াইট ফটোগ্রাফ।' লাইনে দাঁড়ানো কয়েকজন লোকের মধ্যে ভেনিনিকেও দেখা যাচ্ছে ছবিটায়, সঙ্গে একটা ব্যাগ আর ব্রিফকেস। 'এটা তোলা হয়েছে কাল রাত সাড়ে দশটার দিকে, ওয়াটারলু স্টেশনের গোপন ক্যামেরায়, ইউরোস্টার টার্মিন্যালে। ডক্টর হিউগো ব্রাসেলসের উদ্দেশে ছেড়ে যাওয়া শেষ ট্রেনটায় উঠছেন। ছবিটা স্কটল্যান্ডইয়ার্ড ইন্টারপোলকে দিয়েছে, আমি ইন্টারপোলের কমিউনিকেশন ফ্যাসিলিটিজ থেকে একটা কপি করিয়ে নিয়েছি।'

'উনি বেলজিয়ামে যাবেন কেন?' জানতে চাইল রানা।

'বলা মুশকিল। ওখানকার রানা এজেন্সিকে সতর্ক করা হয়েছে। দেখা যাক তারা কী রিপোর্ট পাঠায়। তবে স্কিন-সেভেনটিন যে ইংল্যান্ডে নেই এটা ধরে নেয়া চলে।'

এরপর রাহাত খান কথা বললেন। 'এমআরনাইন, তুমি ব্রাসেলসে যাচ্ছ। তোমার কাজ হলো ডক্টর ভেনিনিকে খুঁজে বের করা। স্কিন-সেভেনটিন যদি তাঁর কাছে থাকে, যে-কোন মূল্যে সংগ্রহ করবে ওটা। কথাটা তোমাকে আরেকবার মনে করিয়ে দিচ্ছি, ফর্মুলাটার স্বত্ব আমাদের, কাজেই পাওয়া মাত্র সোজা বাংলাদেশে নিয়ে চলে আসবে। এটাই তোমার অ্যাসাইনমেন্ট। এনি কোশ্চেন?'

'জী-না, সার।'

'গুড লাক।'

টিভি মনিটর থেকে রাহাত খান অদৃশ্য হয়ে গেলেন।

পাঁচ

রানা অ্যাসাইনমেন্ট পাওয়ার কমবেশি বারো ঘণ্টা আগে শয়তান ভেনিনি ব্রাসেলসের মিডি স্টেশনে পৌঁছে একটা ট্যাক্সি নিয়ে হোটেল শেরাটনের উদ্দেশে রওনা হলো। শরীরটা ক্লান্ত তার, মনটা সন্ত্রস্ত; অপারেশনের দ্বিতীয় পর্ব যত তাড়াতাড়ি সম্ভব শেষ করে চেকটা হাতে পেতে চায়, তারপর দক্ষিণ প্রশান্ত

মহাসাগরের অখ্যাত কোন দ্বীপে গিয়ে লুকিয়ে থাকবে কিছুদিন।

'আউই, মঁশিয়ে?' রিসেপশনিস্ট জানতে চাইল।

একটু তোতলাল ভেনিনি। 'দুঃখিত, আমি শুধু ইংরেজি বলতে পারি।'

রিসেপশনিস্ট মিষ্টি হেসে ভাষা বদলাল। 'বলুন আপনার জন্যে আমি কী করতে পারি, সার?'

'আমার জন্যে একটা স্যুইট রিজার্ভ করা আছে। ডেভিড নোলান।'

বোতাম টিপে কমপিউটার দেখল তরুণী। 'হ্যাঁ, মিস্টার নোলান। আপনার স্যুইটের জন্যে অগ্রিম টাকা দেয়া হয়েছে। ক'রাত থাকবেন, প্লিজ?'

'ঠিক জানি না। সম্ভবত তিন রাত।'

'ঠিক আছে, পরে জানালেও চলবে। আপনার লাগেজ?'

'সঙ্গে যা দেখছেন,' বলে রেজিস্ট্রেশন কার্ডে মিথ্যে তথ্য লিখে স্যুইটের চাবি সংগ্রহ করল। চারতলার ১০০১ নম্বর স্যুইট দেওয়া হয়েছে তাকে। হাত নেড়ে পোর্টারকে দূরে সরিয়ে দিল সে, ব্যাগ আর ব্রিফকেস নিয়ে এলিভেটরে চড়ল।

নিজের স্যুইটে পৌঁছে বিরাট একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়ল ভেনিনি। এখন পর্যন্ত সব ঠিকঠাক আছে। কেউ পিছু নিয়েছে বলে মনে হয়নি তার। স্টেশনে বা হোটেলে সন্দেহজনক কোন চরিত্রকে ঘুরঘুর করতে দেখা যায়নি। সে বোধহয় সত্যিই পার পেয়ে যাবে।

সিটিংরুমে এসে মিনিবারের সামনে বসল ভেনিনি। বেশ অনেক দিন পর আজ তার নিজেকে আত্মবিশ্বাসী লাগছে। সরাসরি বোতল থেকে দু'ঢোক ভোদকা খেল। 'শালার বেটা শালা হিউগো, ভাল দাঁও মেরেছিস!' আদর করে নিজেকে গালি দিল সে। 'তোর চোদ্দপুরুষ সারা জীবন পায়ের ওপর পা তুলে বসে খেলেও এত টাকা শেষ করতে পারবে না। হাহ্-হাহ্-হাহ্!'

ট্যাক্সি ড্রাইভার একাধারে বিস্মিত ও কৌতূহলী, মাঝরাতের পর একজন লোক ডাক্তারের চেম্বারে যেতে চাইবে কেন! 'ওরা বন্ধ হয়ে গেছে, ওরা বন্ধ হয়ে গেছে,' ভুল ইংরেজিতে বলল সে।

'ডাক্তার আমার জন্যে অপেক্ষা করছেন,' বলল ভেনিনি। ড্রাইভারের হাতে এক হাজার বেলজিয়ান ফ্রাঙ্ক গুঁজে দিল। 'এটা রাখো। তোমার ভাড়া মেটাব ওখানে পৌঁছাবার পর। ওখানে কিছুক্ষণ তোমাকে অপেক্ষাও করতে হবে।'

কাঁধ ঝাঁকিয়ে টাকাটা পকেটে ভরল ড্রাইভার। প্যাসেঞ্জারকে নিয়ে হিপোড্রোম-এর কাছে ফ্রাঙ্কলিন-রুজভেল্ট অ্যাভিনিউয়ে চলে এল সে। ট্যাক্সি থেকে নেমে ডাক্তার বার্ন র‍্যানডলফ্-এর বাড়ির সদর দরজায় নক করল ভেনিনি। তরুণ ফ্লেমিশ কার্ডিওলজিস্ট বার্ন র‍্যানডলফ তাঁর বাড়িতেই প্র্যাকটিস করেন।

'আসুন,' ডাক্তার নিজেই দরজা খুলে দিয়ে একপাশে সরে দাঁড়ালেন। ভেতরে ঢুকে তাঁর পিছু নিয়ে রোগীদের ওয়েটিংরুমে চলে এল ভেনিনি, সেখান থেকে বড়সড় একটা ইগজ্যামিনেশানরুমে। ইগজ্যামিনিং টেবিলের পাশে কাঠের বড় একটা ডেস্ক, বুকশেলফ, ইকুইপমেন্ট ভর্তি ট্রে, লেড ওয়াল পার্টিশানসহ এক্স-রে মেশিন ইত্যাদি দেখা যাচ্ছে।

'আমাদের রোগী অপারেশনের জন্যে তৈরি?' জানতে চাইল ভেনিনি।

ডাক্তার র‍্যানডলফ্ মাথা ঝাঁকালেন। 'কাল সকাল আটটায় সার্জারি। যাতে কোন ভুল না করি, রাতে আমার ভাল ঘুম হওয়া দরকার।' মুখে কাঁপা কাঁপা নার্ভাস হাসি।

'কোন রকম ভুল করা চলবে না। এবার বলুন, ঠিক কীভাবে কী করতে যাচ্ছেন।'

ডেস্ক থেকে কিছু স্টেশনারি নিয়ে একটা মানুষের ধড় আঁকলেন ডাক্তার র‍্যানডলফ। তারপর সেটার বাম বুকের উপর ছোট একটা চৌকো ঘর আঁকলেন। 'পেসমেকারটা এখানে ঢোকানো হবে। স্রেফ একটা রুটিন অপারেশন। তিন থেকে চার ঘণ্টা লাগবে, কিংবা আরও কম।'

'সেদিনই কি রোগী বাড়ি ফিরতে পারবে?'

'তা পারবে, তবে আমি বলব একটা রাত হাসপাতালে থেকে গেলে ভাল হয়।'

ব্যাপারটা ভেনিনির পছন্দ হলো না। তার শেডিউল খুব টাইট। 'পথের ধকল কতটুকু সইতে পারবে? প্লেনে চড়তে পারবে তো?'

'অবশ্যই,' বললেন র‍্যানডলফ। 'তাকে শুধু কয়েকটা দিন একটু সাবধানে থাকতে হবে চামড়া না শুকানো পর্যন্ত। চামড়ার পকেট, যেখানে আমরা পেসমেকারটা রাখব, সেটা খুলে যেতে পারে। ইনফেকশন দেখা দিতে পারে। আমরা চাইব না এ-ধরনের কিছু ঘটুক।'

'না,' বলল ভেনিনি। 'কিন্তু প্লেনে চড়ে অনেক দূরের পথ পাড়ি দিতে পারবে তো?'

'আমি তো না পারার কোন কারণ দেখি না।'

'গুড।' ব্রিফকেস খুলে স্কেচটা তাতে ভরল ভেনিনি। ভিতর থেকে বের করল এনভেলাপটা, যাতে স্কিন-সেভেনটিন মাইক্রোডট আছে। 'এই নিন। ওটা এক টুকরো ফিল্মে আটকানো আছে। যা-ই করুন, জিনিসটা হারাবেন না। এটা আপনার গর্দান।'

একটা ঢোক গিললেন র‍্যানডলফ্। 'জানি,' বলে ভেনিনির বাড়ানো হাত থেকে এনভেলাপটা সাবধানে নিলেন।

ব্রাসেলসের দক্ষিণের রুট দ্য লেনিক-এ ইউনিভার্সিটি হসপিটালটা। গোটা বেলজিয়ামে এটাই সবচেয়ে বড় আর আধুনিক মেডিকেল ফ্যাসিলিটিজ।

সকাল ঠিক সাতটা পঞ্চান্ন মিনিট। সবুজ ড্রেস, মাস্ক আর ক্যাপ পরে তিনতলার সার্জারিতে ঢুকলেন ডাক্তার বার্ন র‍্যানডলফ্। হাত ধুলেন, নার্সকে অনুমতি দিলেন হাতে রাবার গ্লাভস পরবার।

রোগী আটান্ন বছর বয়সী চীনা, নাম তিয়েন চাও, আগেই বিছানায় শুয়ে ওষুধের প্রভাবে ঝিমিয়ে আছে। সার্জারির জন্য রোগীকে প্রস্তুত করতে প্রায় এক ঘণ্টা লেগে গেছে।

চাওয়ের বাম দিকে, কলারবোনের একটু নীচে, লোকাল অ্যানেসথেটিক

অ্যাপ্লাই করা হলো। ড্রাগ কাজ শুরু করবে, তাই অপেক্ষায় আছেন ডাক্তার, সময়টা ইকুইপমেন্ট চেক করে কাটাচ্ছেন। পেসমেকারটা টপ লাইন 'ডিমান্ড' মডেল, তৈরি করেছে সালজার ইন্টারমেডিক্স। এর মানে, ডিভাইসটা হার্টের মতিগতি বোঝে, এবং ওটাকে শুধু তখনই উত্তেজিত করে যখন টের পায় স্বাভাবিক রেট একটা নির্দিষ্ট লেভেলের নীচে নেমে যাচ্ছে।

'রোগী তৈরি, অ্যানেসথেটিস্ট ফ্লেমিশ ভাষায় বললেন।

সাবক্লেভিয়ান ভেইনটা খুঁজে পাওয়ার জন্য বাম কালারবোনের নীচে একটা সুই ঢোকালেন ডাক্তার র‍্যানডলফ্। ওটা পাওয়ার পর সুইটার একপাশে ত্বকের নীচেটা কাটলেন। এরপর প্লাঞ্জারবিহীন সিরিঞ্জের মত দেখতে বড় একটা ডিভাইসের সাহায্যে ভেইনের মধ্য দিয়ে হার্টে পেসমেকার লেডগুলো ঢোকাতে হবে। রোগীর শরীরের ভিতর লেড যাতে দেখতে পাওয়া যায় তার জন্য ফ্লুরোস্কোপি ব্যবহার করা হচ্ছে।

কাজটা সূক্ষ্ম নৈপুণ্য আর যত্ন দাবি করে, তাই সময়সাপেক্ষ। প্রথম লেড পজিশন মত বসাতে প্রায় এক ঘণ্টা লেগে গেল। নব্বুই মিনিট পর অপারেশনের দ্বিতীয় পর্ব শুরু করবার জন্য তৈরি হলেন ডাক্তার।

লেডগুলোর ইলেকট্রিক স্ট্যাটাস চেক করে জেনে নিতে হলো হার্ট চালু রাখতে কতটুকু এনার্জি দরকার। অত্যন্ত সাবধানে ইলেকট্রিসিটি অ্যাডজাস্ট করলেন র‍্যানডলফ্, তারপর ট্রে থেকে সোনালি রঙের পেসমেকারটা হাতে নিলেন। লেডগুলো পেসমেকারের সঙ্গে জোড়া লাগানো হলো। তারপর তিনি নির্দেশ দিলেন ইকেজি-তে সব ঠিক আছে কি না দেখে নিতে।

'সব ঠিক, ডাক্তার,' নার্স বলল।

মাথা ঝাঁকিয়ে অপারেশনের দ্বিতীয় পর্ব শুরু করলেন ডাক্তার। ত্বকের নীচে যে অংশটা কেটেছিলেন তার ভিতর অত্যন্ত সাবধানে একটা 'পকেট' তৈরি করলেন, তারপর সীল করা পেসমেকারটা ঢুকিয়ে ফাঁকটা বন্ধ করে দিলেন।

'রাইট,' বললেন র‍্যানডলফ্। 'আপনার কাজ শেষ, মিস্টার তিয়েন চাও।'

চাও চোখ মিটমিট করল। 'আমি বোধ হয় ঘুমিয়ে পড়েছিলাম।'

'এখন আপনাকে আমরা রিকভারিরুমে নিয়ে যাব। বেশি নড়াচড়া করবেন না।'

চাকা লাগানো বেড চালিয়ে সার্জারি থেকে তিয়েন চাওকে বের করে নিয়ে যাওয়া হলো। গ্লাভস আর মাস্ক খুলে ওয়েটিংরুমে চলে এলেন ডাক্তার। দেখলেন একটা পত্রিকায় মুখ গুঁজে বসে আছে ভেনিনি।

ডাক্তারকে দেখে দাঁড়িয়ে পড়ল সে। 'কী খবর?'

'সব ঠিক আছে,' ডাক্তার জবাব দিলেন। 'আপনি যদি সত্যি চান তো আজ রাতেই বাড়ি ফিরতে পারবেন উনি। তবে আমি কাল সকাল পর্যন্ত রাখতে বলি এখানে।'

কয়েক সেকেন্ড চিন্তা করল ভেনিনি। 'ঠিক আছে,' গলার আওয়াজ নিচু করল সে। 'তো···জিনিসটা ঠিক কোথায় ঢোকালেন বলুন তো?'

ডাক্তার র‍্যানডলফও ফিসফিস করে জবাব দিলেন। 'পেসমেকারের ভিতর

ব্যাটারির সঙ্গে আটকানো আছে মাইক্রোডটটা। পেসমেকার সীল আর স্টেরিলাইজ তো করতেই হবে, তাই এটাই একমাত্র উপায় ছিল।'

মাথা ঝাঁকাল ভেনিনি। 'গুড । ভালই করেছেন তা হলে। আমি খুশি।'

'আপনি খুশি হওয়ায় স্বস্তি বোধ করছি। এখন তা হলে আমি ধরে নিতে পারি যে আমার দুঃস্বপ্ন শেষ হয়েছে?'

ভেনিনি হাসল, তার পাখিসুলভ চোখ চকচক করছে। 'আমি আমার বসদের সঙ্গে আজ বিকেলে কথা বলব। অবশ্যই তারা যোগাযোগ করবে। ধন্যবাদ, ডাক্তার।'

ভেনিনির গমনপথের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে থাকলেন ডাক্তার র‍্যানডলফ্। লোকটাকে তাঁর ভাল লাগেনি। জিএম-এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কাউকেই তাঁর ভাল লাগেনি। তাঁকে দিয়ে যা তারা করাতে চেয়েছিল তা তিনি করে দিয়েছেন। এখন প্রার্থনা করছেন তাঁকে যেন শান্তিতে থাকতে দেওয়া হয়।

ট্যাক্সি নিয়ে শেরাটনে ফিরল ভেনিনি, ডাইনিংরুমে বসে প্রচুর সময় নিয়ে ভাল একটা লাঞ্চের অর্ডার দিল—স্মোকড্ ঈল-এর সঙ্গে ক্রীম দেওয়া পটেটো সুপ, স্যামন, ক্যাভিয়ার, আসপ্যারাগাস আর এক বোতল ডুভেল বিয়ার। লাঞ্চ শেষে রু দ' আর্চট-এ চলে এল ভেনিনি। এটা ব্রাসেলসের রেডলাইট ডিস্ট্রিক্ট। এখানে কয়েক হাজার বেলজিয়ান ফ্রাঙ্কের বিনিময়ে সুন্দরী এক পতিতার সঙ্গে কিছুটা সময় কাটাল সে।

সেদিন সন্ধ্যায় নিজের হোটেল স্যুইটে ফিরে ভেনিনি দেখল তার ফোনের মেসেজ লাইট মিটমিট করছে। মেসেজটা শুনল সে। চিন্তায় কোঁচকানো ভুরু নিয়ে রিটার্ন কল করল তখনি।

খবর ভাল নয়।

'ড্যাম!' বিড়বিড় করল ভেনিনি। রিসিভার রেখে দিল সে, তারপর ব্রাসেলস-এর লোকাল এক কনট্যাক্ট-এর নম্বরে ডায়াল করল।

'হ্যালো?' অপরপ্রান্তে একজন ফরাসী সাড়া দিতে বলল ভেনিনি। 'আমি ফ্রেঞ্চ বুঝি না। শোনো, এদিকে আমি পাইথন, ঠিক আছে? লন্ডন অফিস থেকে এইমাত্র খবর পেলাম একটা ইন্টারন্যাশনাল ইনভেস্টিগেটিং এজেন্সির একজন ডিরেক্টর এখানে আসছে। একটা নীল রঙের জাগুয়ার এক্সকেএইট ভাড়া করেছে সে।...হ্যাঁ, আমরাই তার টার্গেট। সম্ভবত ই-নাইনটিন ধরে আসবে।...অবশ্যই ডেঞ্জারাস এলিমেন্ট! এই ধরো বারোটা থেকে দুটোর মধ্যে ব্রাসেলসে পৌঁছাবে। দেখো তার একটা ব্যবস্থা করতে পারো কি না।'

জিএম এজেন্টরা রানাকে বিএসএস হেডকোয়ার্টারে ঢুকতে দেখেছে, আর গোপন ক্যামেরায় তোলা ফটো নিজেদের কমপিউটারে আছে কিনা দেখতে গিয়ে পেয়ে গেছে ওর আসল পরিচয়।

জাগুয়ার নিয়ে এমটোয়েনটি মোটরওয়ে ধরে ডোভার আর ফোকস্টোন-এর মাঝখানে চ্যানেল টানেল-টার্মিন্যালে পৌঁছাল রানা, লে শাটল অটো-ট্র্যান্সপোর্টারে

চড়ে পঁয়ত্রিশ মিনিট পর গাড়ি নিয়ে নেমে এল ক্যালে-তে।

এরপর দক্ষিণ দিকে রওনা হয়ে লিলি-তে পৌঁছাল রানা, উঠল ই-নাইনটিন অর্থাৎ প্যারিস টু ব্রাসেলস্ অটোরুটে। গাড়িটা রেন্ট-আ-কার থেকে নিয়েছে রানা, মালিককে জানিয়েও এসেছে কোথায় যাচ্ছে। জিএম এজেন্টরা কতটা সতর্ক, এটা পরীক্ষা করতে চায় ও। দেখতে চায় কেউ ওকে অনুসরণ করে কি না।

এসপিওনাজ এমন একটা জটিল পেশা, অনেক সময় বিপদকে আহ্বান করতে হয়। তবে তার জন্য সংশ্লিষ্ট এজেন্ট যথেষ্ট প্রস্তুতিও নিয়ে রাখে। এক্ষেত্রে রানাও নিয়েছে। রেন্ট-আ-কার কোম্পানিটা রানা এজেন্সিরই গোপন একটা শাখা। যে জাগুয়ারটা নিয়ে রওনা হয়েছে সেটার কিছু গোপন বৈশিষ্ট্যের কথা একা শুধু ও-ই জানে।

সাম্প্রতিক বৃষ্টি আর রোদ ঝলমলে আবহাওয়া প্রকৃতিকে এখানে-ওখানে উজ্জ্বল সবুজ, হলুদ আর কমলা রঙের ছোপ দিয়ে নতুন করে সাজিয়েছে। খোলা রোডে সুপারচার্জার টেস্ট করবার সময় গ্রামীণ দৃশ্যগুলো তুফান বেগে পিছিয়ে যেতে দেখল রানা। নতুন একটা অ্যাসাইনমেন্ট পেয়ে বেরিয়ে পড়বার মধ্যে চরম একটা আনন্দ আর পুলক আছে, গুনগুন করে গান গাইতে ইচ্ছে করছে ওর। আরও বেশি ভাল লাগছে ইংল্যান্ড থেকে বেরিয়ে আসতে পারায়; পরিবেশটা ওর জন্য অস্বস্তিকর হয়ে উঠেছিল।

'দ্য রিঙ' থেকে এখনও বিশ মাইল দূরে জাগুয়ার, এই সময় রানা লক্ষ করল একজোড়া হাই-স্পিড মোটরসাইকেল পিছন থেকে কাছে চলে আসছে দ্রুত। প্রধান শহরকে ঘিরে থাকা ব্যস্ত রোডওয়েকে 'দ্য রিঙ' বলা হয়। মোটরসাইকেল দুটো একই রকম দেখতে–গাঢ় সবুজ কাওয়াসাকি ডাবল জেড-আর ইলেভেন হানড্রেড সুপারবাইক। অত্যন্ত শক্তিশালী দ্বিচক্রযান: যেমন ভারী, তেমনি দ্রুতগতি।

জোড়া কাওয়াসাকি জাগুয়ারের পঞ্চাশ গজের মধ্যে চলে আসতেই রানার সামনের একটা এন্ট্রান্স র‍্যাম্প থেকে হাইওয়েতে পড়ল আরেকটা মোটরসাইকেল, এটাও কাওয়াসাকি ডাবল জেড-আর ইলেভেন হানড্রেড। রানা বুঝল, আগেই ওদের রিহার্সাল দেওয়া আছে–টাইমিং বড় বেশি নিখুঁত।

শিরদাঁড়া খাড়া করে সিটে বসে আছে ও, দু'হাতের মুঠোয় শক্ত করে ধরা হুইল, স্পিড বাড়িয়ে ঘণ্টায় নব্বুই মাইলে তুলল ওর সামনে ডান লেনের কাওয়াসাকিকে ওভারটেক করবার জন্য। ট্র্যাফিক খুব একটা বেশি না হলেও এই স্পিডে ঝুঁকিটা মারাত্মক।

সেন্টার লেনে সরে এল রানা, পাশ কাটানোর সময় মোটরবাইক আরোহীর চেহারাটা যাতে দেখতে পায়। পরনের ড্রেসটাকে আর্মি ফেটিগ বলে মনে হলো, সঙ্গে অলিভ গ্রীন ক্র্যাশ হেলমেট–বাইকের সঙ্গে নিখুঁতভাবে মিলে যাচ্ছে রঙটা। এটা কি কোন ধরনের কস্টিউম? আরোহী তিনজন সম্ভবত একটা অটো শো-র অংশ, মোটেও বিপজ্জনক কিছু নয়।

সামনের কাওয়াসাকি অকস্মাৎ বাঁকা হয়ে রানার লেনে চলে এল, পাশ কাটাতে বাধা দিচ্ছে। স্পিড সত্তরে নামিয়ে আনতে বাধ্য হলো রানা, ফলে

পিছনের লোক দু'জন মাঝখানের ফাঁক কমাবার সুযোগ পেয়ে গেল।

দূরত্ব এখন মাত্র ত্রিশ ফুট, রানার সঙ্গে একই লেনে রয়েছে অনুসরণকারীরা। বাঁ দিকের শেষ লেনে সরে এল রানা, ওর দেখাদেখি প্রায় একই সঙ্গে তিন কাওয়াসাকিও তাই করল, ওগুলোকে যেন রিমোট কন্ট্রোলের সাহায্যে চালানো হচ্ছে।

এখন আর রানার মনে কোন সন্দেহ নেই, প্রফেশন্যাল একদল লোককে ওর ব্যবস্থা করতে পাঠানো হয়েছে। আবার লেন বদল করল ও; প্রথমে ফিরে এল সেন্টারে, তারপর সর্ব ডানে। বাইক তিনটেও অনুকরণ করল ওকে।

রিয়ার ভিউ মিররে চোখ রেখে পিছনের দুই আরোহীকে দেখছে রানা, এই সময় একটা উইন্ডশীল্ডের নীচে হঠাৎ খানিকটা কালো ধোঁয়া উড়তে দেখল। তারপর জাগুয়ারের পিছনে কয়েকটা কঠিন ঝাঁকি অনুভব করল।

রানার চোয়ালের হাড় শক্ত আর উঁচু হয়ে উঠল। ওর পেট্রল ট্যাংক লক্ষ্য করে মেশিন গানের গুলি ছুঁড়েছে বেজন্মাটা।

আরোহী দু'জন সবিস্ময়ে পরস্পরে দিকে তাকাল, যেন জিজ্ঞেস করছে: 'গাড়িটা বিস্ফোরিত হয়নি কেন?' ক্ষীণ হলেও, মুচকি একটু হাসল রানা। জাগুয়ারের বডি কেবল অভেদ্যই নয়, বুলেটকে ধাক্কা দিয়ে ফিরিয়ে দেয়।

হেডসেটের মাধ্যমে পরস্পরের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারছে, আরোহীরা এবার নতুন স্ট্র্যাটিজির জন্য তৈরি হলো। রানার পিছনের এক লোক ডানহাতি লেনে চলে এসে স্পিড বাড়িয়ে দিল, জাগুয়ারের পাশে পৌঁছাতে চায়। রানার দিকে তাকিয়ে মুখ নাড়ল সে, সন্দেহ নেই অপ্রীতিকর কোনও বিশেষণে ভূষিত করল ওকে।

দ্রুত ডানদিকে হুইল ঘোরাল রানা, সোজা মোটরসাইকেলে চড়াও হবে। কাওয়াসাকি ছিটকে রাস্তা থেকে নেমে গেল, কাত হয়ে ঘাসের উপর পড়ল, থামল একশো ফুট ডিগবাজি খাওয়ার পর। আগেই নেমে পড়েছিল, তবু লোকটা গুরুতর চোট পেয়েছে, তোবড়ানো বাইকটাও আর চলবে না।

জাগুয়ারের স্পিড বাড়িয়ে দিয়ে মন্থরগতি ট্র্যাফিককে অনেকটা পিছনে ফেলে এল রানা। বাকি বাইক দুটোও খানিকটা পিছিয়ে পড়ল। হাতে কিছুটা নিরুপদ্রব সময় পেয়ে বেলজিয়ান পুলিশকে মোবাইল ফোনে একটা খবর দেবে কি না ভাবল একবার।

রানাকে ধরবার জন্য মরিয়া হয়ে ছুটে আসছে আবার বাইক দুটো। রাস্তার একটা জায়গায় পৌঁছে দেখা গেল মেরামতের জন্য সর্বদক্ষিণের লেনটা বেশ কিছু দূর বন্ধ রাখা হয়েছে। লেন মাত্র দুটো হওয়ায় ট্র্যাফিকের ভিড় স্বভাবতই খুব বেশি। এরকম ভিড়ের মধ্যে যথাসম্ভব দ্রুত জাগুয়ার ছুটিয়ে এসে রানা দেখল দুটো লেনেই বাধা হয়ে আছে দশ চাকাঅলা একটা করে লরি। লরির ড্রাইভাররা নিরাপত্তার কথা ভুলে গিয়ে পরস্পরের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় মেতে উঠেছে, কে কার আগে যেতে পারে। ঘন ঘন হর্ন বাজাল রানা, আশা করল যে-কোন একটা লরি লেন বদল করবে। ওর সামনের লরির ড্রাইভার জায়গা তো ছাড়লই না, বরং নিজের হর্ন বাজিয়ে চ্যালেঞ্জের সঙ্গে জানিয়ে দিল যা পারো করো গিয়ে।

'ডিফেন্স সিস্টেমস্ অন,' বলে উঠল রানা। গাড়ির ফোন, অডিও, লাইট আর উইপন কণ্ঠস্বরের সাহায্যে অ্যাকটিভেট করবার একটা সিস্টেম ইনস্টল করা হয়েছে জাগুয়ারে। ড্যাশবোর্ডের টেলিম্যাটিক্স স্ক্রিনে একটা আইকন ফ্ল্যাশ করছে, জানিয়ে দিচ্ছে ওর নির্দেশ পালন করা হয়েছে।

'অ্যাকটিভেট ফ্লাইং স্কাউট,' বলা মাত্র স্কাউটের আউটলাইন, ছোট মডেল এয়ারপ্লেন আকৃতির একটা ডিভাইস হাজির হলো স্ক্রিনে। চেসিসের তলায় ওটার বাসা, রানার হুকুম পেলে গাড়ির তলা থেকে উড়বে, পৌঁছাবে ওর পছন্দমত অলটিচ্যুডে। জয়স্টিক-এর সাহায্যে নিয়ন্ত্রণ করতে হয়।

ডিসপ্লে বদলে গেল, স্ক্রিনে এখন লেখা রয়েছে: স্কাউট রেডি।

'লঞ্চ স্কাউট,' আদেশ করল রানা। জাগুয়ারের পিছনে হঠাৎ হু-উ-উ-উ-স্ করে আওয়াজের সঙ্গে ফায়ারিং পজিশন থেকে ইজেক্ট হলো স্কাউট। বাদুড় আকৃতির ভেহিকেল স্যাঁৎ করে বেরিয়ে এসে আকাশে উঠে গেল, তারপর এমনভাবে ঘুরল যাতে জাগুয়ারের উপরে এবং সমান্তরাল একটা রেখায় থাকে। বাইক দুটোর আরোহীরা দৃশ্যটা দেখেও নিজেদের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছে না। স্কাউটের দিকে হাত তুলে চিৎকার করে কী যেন বলল একজন তার সঙ্গীকে।

রানার এক হাত হুইলে, অপর হাত জয়স্টিক অপারেট করছে। স্কাউটকে সামনে পাঠাল ও, স্পিড বাড়িয়ে দিল যাতে তাড়াতাড়ি লরি দুটোর পাশে পৌঁছায়। ড্রাইভার দু'জন এখনও তুমুল প্রতিযোগিতায় মেতে আছে।

স্পিড না কমিয়ে স্কাউটকে ধীরে ধীরে নীচে নামাল রানা। চঞ্চল খঞ্জনা পাখির মত, খুদে প্লেনটা ঝটপট পজিশন নিল, এই মুহূর্তে দুটো লরির মাঝখানে দরজা বা ডোর লেভেলে উড়ছে। ডান পাশের লরির ড্রাইভার বাম পাশে তাকাতে দেখতে পেল তার জানালার ঠিক বাইরেই অদ্ভুতদর্শন একটা ডিভাইস। হঠাৎ হাঁপিয়ে উঠল সে, হাত কেঁপে যাওয়ায় রাস্তা ছেড়ে বেরিয়ে যেতে চাইল লরি, শেষ মুহূর্তে কোন মতে সিধে করে নিল চাকা।

গাড়ির মত স্কাউটও আর্মারে মোড়া, আর এই বিশেষ ধরনের আর্মার গুঁতো মারবার কাজে খুব ভাল। জয়স্টিক এত জোরে ঘোরাল রানা, খুদে প্লেন ওটার ডানা দিয়ে ড্রাইভারের জানালা ভেঙে চুরমার করে দিল। লরির নিয়ন্ত্রণ পুরোপুরি হারিয়ে ফেলল ড্রাইভার। স্কাউটকে তাড়াতাড়ি উপরে তুলে নিয়েছে রানা। রাস্তা থেকে নেমে গেল লরিটা, ঘাসে মোড়া নরম মাটিতে চাকার দাগ ফুটিয়ে কিনারা দিয়ে নেমে গেল অগভীর খাদে।

এটা পুলিশের দৃষ্টি কাড়বে, ভাবল রানা। স্পিড বাড়িয়ে দ্বিতীয় লরিটাকে পাশ কাটাল ও, ড্রাইভার স্পিড চল্লিশে নামিয়ে এনেছে। লোকটা সশস্ত্র। স্কাউট, ইতোমধ্যে, জাগুয়ারের মাথার উপর ফিরে এসেছে।

সামনে বিস্তৃত খানিকটা রাস্তা প্রায় ফাঁকা পড়ে আছে। স্পিড বাড়াল রানা, আশা করছে পিছনের বাইক দুটোও ফাঁকা জায়গায় চলে আসবে। একটু পরই দেখতে পেল লরিটাকে পাশ কাটাচ্ছে জোড়া কাওয়াসাকি, যেটাকে পিছনে ফেলে এসেছে ও। দুটোর মধ্যে একটা কাওয়াসাকি দ্রুত কাছে চলে আসছে, অপরটা একটু পিছিয়ে পড়েছে।

'প্রিপেয়ার সিলিকন ফ্লুইড বম্,' বলল রানা।

কাওয়াসাকি জাগুয়ারের পিছনে পজিশন নিয়ে আবার মেশিন গান থেকে গুলি চালাল। গাড়ির পিছনে বুলেট লাগছে। 'লঞ্চবম্!' নির্দেশ দিল ও।

কমপ্যাক্ট ডিস্ক সাইজের একটা ডিভাইস। বাম্পার থেকে ড্রপ খেয়ে রাস্তায় গড়াল। দেখতে পেয়ে এড়াবার চেষ্টা করল রাইডার, কিন্তু সময় পেল না। প্রচণ্ড শব্দে বিস্ফোরিত হলো ডিভাইসটা, কাওয়াসাকি আর তার আরোহীর ছিন্নভিন্ন অংশ উড়িয়ে দিল শূন্যে। কালো ধোঁয়া, পোড়া ধাতব বস্তু আর দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হাড় মাংস ছড়িয়ে পড়ল হাইওয়ের উপর।

দ্বিতীয় রাইডার বাঁ লেনে সরে গেল, আঁকাবাঁকা একটা পথ তৈরি করে আবর্জনাগুলোকে এড়াল, রানার পিছু ছাড়তে রাজি নয়। বাইক সিধে করে নিয়ে সে-ও গুলি করল মেশিন গান থেকে।

'রেডিরিয়ার লেযার,' বলল রানা। স্ক্রিনে আইকন ফ্ল্যাশ করছে।

কাওয়াসাকি কাছে চলে আসছে, বুলেট ছুটছে ঝাঁকে ঝাঁকে। পিছনের একটা টায়ার ফুটো হলো, তবে চিন্তার কিছু নেই, জাগুয়ারে সেলফ-সিলিং টায়ার লাগানো আছে। টায়ারে ছিদ্র হলে আপনা-আপনি বুজে যাবে সেটা।

'এক সেকেন্ড লেযার-ফ্ল্যাশের জন্যে কাউন্ট শুরু,' বলল রানা। 'এক...দুই...তিন।'

আকস্মিক উজ্জ্বল আলো ওর পিছনের রাইডারকে বিভ্রান্তিতে ফেলে দিল। প্রথমে ভাবল রোদ, জাগুয়ারের পিছনের মেটালে লেগে প্রতিফলিত হয়েছে। মুহূর্তের জন্য অন্ধ হলেও, হ্যান্ডেলবার দুটো শক্ত করে ধরে থাকল সে, আশা করছে কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে দৃষ্টিশক্তি ফিরে পাবে। কিন্তু তারপরই শুরু হলো ব্যথা। চোখ দুটো জ্বলে উঠল, যেন গরম করা লাল লোহার সিক দিয়ে পোড়ানো হচ্ছে। তারপর অন্ধকার ছাড়া আর কিছু থাকল না। লেযার ফ্ল্যাশ তার চোখের রেটিনা চিরকালের জন্য পুড়িয়ে দিয়েছে।

রিয়ার ভিউ মিররে কাওয়াসাকিটাকে দেখতে পেল রানা, গার্ডরেইল ভেঙে ডিগবাজি খেল শূন্যে, তারপর খানিকটা হড়কে আরেক রাস্তায় উঠে পড়ল। আট-দশটা হর্ন একযোগে বেজে উঠল, সেই সঙ্গে একাধিক ট্রাক আর কার ব্রেক কষায় চাকার সঙ্গে কংক্রিটের ঘর্ষণে গা রি-রি করা আওয়াজ উঠল। ভাঙাচোরা কাওয়াসাকি রাস্তায় থাকলে কী ঘটত বলা মুশকিল। রেইলিং ভেঙে কিনারা থেকে লাফ দিল সেটা, পড়ল একশো ফুট নীচে।

রানা শুনতে পেল দূরের সাইরেন কাছে চলে আসছে। শহর, অর্থাৎ ওর উল্টোদিক থেকে আসছে পুলিশ কার।

'প্রিপেয়ার টু ডক স্কাউট,' নির্দেশ দিল রানা, ডিভাইসটা জাগুয়ারের পিছনে নিজের আস্তানায় ফিরে এল। ঠিক এই সময় 'দ্য রিঙ'-এ ঢুকল গাড়ি। হেভি ট্র্যাফিকের ভিতরে মিশে গিয়ে জাগুয়ার নিরাপদে একে একে পাশ কাটিয়ে আসছে পাওয়ার প্লান্ট, কার ডিলারশিপ, বিজনেস পার্ক ইত্যাদি। পথে আর কিছু ঘটল না।

রোদ ঝলমলে বসন্তের একটা মিষ্টি দিন; গ্র্যান্ডপ্যালেসের কাছে একটা

গ্যারেজে গাড়িটা রাখল রানা। বেলা দুটো বাজতে চলেছে। গ্যারেজ থেকে বেরিয়ে এসে সানগ্লাস পরল, রানা এজেন্সির ব্রাসেলস্ শাখার প্রধান ওনিডা লিৎসা ওকে যাতে চিনতে পারে। রু দু শেনি-তে ট্যুরিস্টদের যেন মেলা বসেছে, প্রায় সবার হাতে ক্যামেরা। দূরে, চৌরাস্তার একধারে, চুপচাপ দাঁড়িয়ে লোকজনের উপর চোখ বুলাচ্ছে আকর্ষণীয় ফিগার নিয়ে এক স্বর্ণকেশী তরুণী; ফটোয় দেখা লিৎসার চেহারার সঙ্গে প্রচুর মিল। বয়স পঁচিশ থেকে ত্রিশের মধ্যে। ওনিনা লিৎসা প্রকাশ্য পেশায় একজন ফ্যাশন মডেল। গুপ্তচরবৃত্তি বা গোয়েন্দাগিরি তার গোপন প্রেম।

একটু ঘুর পথ ধরে তার পাশে এসে দাঁড়াল রানা। 'আমার কি একজন গাইড দরকার, ব্রাসেলস্ শহরটা যদি ঘুরেফিরে দেখতে চাই?' সানগ্লাস খুলে ফেলল রানা, তারপর আবার পরল।

মেয়েটাও নিজের সানগ্লাস খুলল। তার নীল চোখে ঝিকিয়ে উঠল রোদ। ডান হাতটা বাড়িয়ে দিয়ে ইংরেজিতে বলল, 'আমি ওনিনা লিৎসা।' ফিক করে হেসে ফেলল সে। তারপর চেষ্টা করল বাংলা বলতে: 'হামি কিন্টু মাসুড ভায়-টায় বলটে পারবে না, বস্।'

হেসে ফেলল রানা। 'তা না পারলে। তবে বস্ বলারও দরকার নেই, মিস্টার বা মঁশিয়ে রানা বললেও চলবে।'

'মিস্টারই বলি, তবে আমার ভাসা ফ্লেমিশ। আপনি ডাচ জানেন?'

'জানি, তবে অল্প। আমার হোটেল যেন কোন্‌টা?'

'শেরাটন।'

'চিনব,' বলল রানা। 'আগেও ওখানে থেকেছি।'

'আমাদের টর্গেটও ওখানে উঠেছে, মিস্টার রানা।'

'অ্যাঁ...তাই?'

'প্রথমে আপনি আমার ফ্ল্যাটে চলুন, ঢাকা থেকে আসা একটা ফ্যাক্স মেসেজ দেখবেন। বেশি হাঁটতে হবে না, কাছেই। মাঝেমধ্যে ওটাকে আমরা গোপন অফিস বা সেফ হাউস হিসেবেও কাজে লাগাই।'

পেন্টাইট রু দো বাউচারস্ পার হয়ে এল ওরা। কাছেই বিখ্যাত ফোক পাপেট শোকেস 'থিয়েটার টুনি'। পাশে একটা পেস্ট্রি শপ। সেঁকা খাবার-দাবারের গন্ধে জায়গাটা ভুর ভুর করছে।

'ক্রীম দেয়া এক টুকরো কেক চলবে?' জানতে চাইল লিৎসা।

মৃদু হেসে রানা বলল, 'পরে দেখা যাবে।'

কাউন্টারের পিছনের মেয়েটিকে ফ্লেমিশ ভাষায় কিছু বলল লিৎসা, তারপর একটা দরজা দিয়ে রানাকে নিয়ে চলে এল কিচেনে। সারা শরীরে ঘাম, এক লোক ট্রে ভর্তি রোলস আভনে ভরছে। আরেক দরজা দিয়ে ছোট্ট একটা প্যাসেজে বেরুল ওরা, শেষ মাথার সিঁড়ি বেয়ে উঠে এল তিনতলার চিলেকোঠায়।

দু'কামরার ছোট একটা ফ্ল্যাট। পিছনের ঘরটা অফিস-কমপিউটার, ফাইল কেবিনেট, ফ্যাক্স মেশিন, কপিয়ার, টেলিফোন ইত্যাদি যা যা দরকার সবই আছে। কালার টিভিটা বেডরুমে। দেয়ালগুলো পর্দা দিয়ে মোড়া।

'কিছু দিই?'

খোলা দরজা দিয়ে ছোট্ট কিচেনের দিকে তাকাল রানা। 'কফি, যদি পারো।' লিৎসার পিছু নিয়ে কিচেনের দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে হেলান দিল চৌকাঠে, হাত দুটো বুকে ভাঁজ করা। 'ওরা জানে আমি ব্রাসেলসে আসছি। রাস্তায় তিনটে কাওয়াসাকি বাধা দিতে চেষ্টা করেছিল।'

'তাই?' গ্যাসের চুলোয় কফির পানি চড়িয়ে ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল লিৎসা। 'জিএম-এর নেটওঅর্ক আমাদের এজেন্সির চেয়ে বেশি ছড়ানো। তবে ওরা যেমন আপনার গতিবিধির ওপর নজর রাখছে, আমরাও ওদের লোককে চোখে চোখে রাখছি।' হাত তুলে রানার পিছনটা দেখাল সে। 'ডেস্কের ওপরের দেরাজটা খুলুন, ফ্যাক্স মেসেজটা সামনেই পাবেন।'

অফিসে ফিরে এসে মেসেজটা বের করল রানা। বিসিআই হেডকোয়ার্টার থেকে রাহাত খানের পাঠানো মেসেজ: 'লিৎসা যখন ভেনিনিকে পেয়ে গেছে, এখন তুমি লোকটার গতিবিধি লক্ষ করো। আই রিপিট, গতিবিধি লক্ষ করো। আমরা জানতে চাই কে তাকে নির্দেশ দিচ্ছে, কার সঙ্গে তার কাজকর্ম। স্কিন-সেভেনটিন তার সঙ্গেই আছে, তা নাহলে ব্রিটেন ত্যাগ করত না। যে-কোন মূল্যে ফর্মুলাটা পেতে হবে তোমাকে।'

অফিসে ঢুকে রানার হাতে একটা ধূমায়িত কাপ ধরিয়ে দিল লিৎসা। গরম কফিতে চুমুক দিয়ে রানা বলল, 'তো বলো, ভেনিনি সম্পর্কে কী জানার আছে আমার।'

'এজেন্সির লন্ডন শাখা আমাদেরকে সতর্ক করে দেয়ার পর আমি মিডি টার্মিন্যাল-এর ইমিগ্রেশনে রুটিন চেক করতে যাই। ওদের ক্যামেরায় ধরা পড়ে গেছে ভেনিনি, তবে নাম বদলে ডেভিড নোলান রেখেছে। এরপর নাম ধরে খোঁজ নিতে জানা গেল কোন হোটেলে উঠেছে।

'শেরাটনের বাইরের একটা কাফেতে অপেক্ষায় থাকি আমি। লোকটা অবশেষে কাল রাতে ডিনারের পর বেরুল।' একটু বিব্রত দেখাল মেয়েটাকে। 'এমন এক জায়গায় থামল যেখানে যৌন সেবা কেনাবেচা হয়।'

'তারপর?'

'অনেক রাতে হোটেলে ফিরে আসে। একজন বেলবয়কে কিছু টাকা দিয়ে আমার পেজার-এ ফোন করতে বলি, যদি দেখে নোলান বেরিয়ে যাচ্ছে। আজ সকালে ট্যাক্সি নিয়ে কোথাও গেছে···পিছু নিয়েও হারিয়ে ফেলেছি। তবে হোটেল ছেড়ে দেয়নি।'

'তারমানে যা খুশি তাই করার জন্যে সব মিলিয়ে প্রায় চব্বিশ ঘণ্টা হাতে পেয়েছে ভেনিনি।'

'হ্যাঁ, তা বলতে পারেন।'

'আর ঠিক এই মুহূর্তে হয়তো কারও সঙ্গে কোন চুক্তিতে আসছে সে।'

'অসম্ভব নয়।'

'চলো, এখনি বেরিয়ে পড়ি,' বলল রানা, পা বাড়াল দরজার দিকে। 'আমি লোকটার ঘরে ঢুকব।'

ছয়

গ্যারেজ থেকে জাগুয়ার নিয়ে হোটেলে চলে এল রানা। প্রাসাদতুল্য বিশাল দালানটার উল্টোদিকের সাইডওয়াক কাফেতে আগের মতই একটা চেয়ার নিয়ে বসেছে লিৎসা। প্ল্যানটা হলো, রানা যখন ভিতরে থাকবে লিৎসা তখন নজর রাখবে সামনের দিকটায়।

রিসেপশন ডেস্কে নাম রেজিস্ট্রি করল রানা। ছ'তলার একটা স্যুইট দেওয়া হয়েছে ওকে। বিছানার উপর রেখে ব্যাগটা খুলল ও, ভিতর থেকেই ইলেকট্রিক টুথব্রাশটা বের করল। টান দিয়ে ব্রাশ খুলে ফেলল, তারপর স্ক্রুর প্যাঁচ ঘুরিয়ে আলাদা করল ডিভাইসটার নীচের অংশ। তিনটে সি-সেল ব্যাটারির পাশে সরু, আড়ষ্ট এক প্রস্থ তার দেখা যাচ্ছে। এই ইলেকট্রিক পিক খুব সহজে তালা খুলতে পারে। জিনিসটা জ্যাকেটের পকেটে ভরে হাত বাড়িয়ে ফোনের রিসিভার তুলল রানা, অপারেটরকে বলল ডেভিড নোলানের স্যুইটের সঙ্গে যোগাযোগ করিয়ে দিতে। স্যুইট থেকে কেউ সাড়া দিল না। ভাল। এটাই রানা চেয়েছিল।

প্রিয় অস্ত্র ওয়ালথারের ম্যাগাজিন চেক করল রানা, তারপর শোল্ডার হোলস্টারে ভরে নিয়ে বেরিয়ে এল স্যুইট থেকে। চওড়া সিঁড়ি বেয়ে দুই ফ্লোর নিচে নেমে উঁকি দিয়ে করিডরটা দেখল। কেউ কোথাও নেই। দ্রুত ১০০১ নম্বর স্যুইটের সামনে চলে এসে নক করল। কেউ সাড়া দিচ্ছে না। পিক গান বের করে একটা অ্যাটাচমেন্ট বাছাই করল, দরজার তালা খুলতে সময় নিল তিন সেকেন্ড।

নিজের পিছনে দরজা বন্ধ করে হল থেকে সিটিংরুমে ঢুকল রানা। ভেনিনি এখানে ব্রিফকেস ছাড়াও অন্যান্য ব্যক্তিগত জিনিস রেখে গেছে। ফোনের পাশে একটা নোটপ্যাডে সে লিখেছে–'ইউনিভার্সিটি হসপিটাল'। ব্রিফকেসটা খুলবার চেষ্টা করল রানা। কী হোলের জন্য অন্য একটা অ্যাটাচমেন্ট বেছে নিল। কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই খুলে গেল তালা।

তবে ব্রিফকেসে তেমন কিছু পাওয়া গেল না। ব্রাসেলসের একটা সিটি ম্যাপ, রেলওয়ের টাইমটেবিল, ক্যালকুলেটার, কাগজ, কলম আর এক ফিজিশিয়ানের স্টেশনারিতে আঁকা আশ্চর্য একটা স্কেচ।

স্কেচে শুধু ধড়টা দেখা যাচ্ছে, বাম বুকের উপর চৌকো একটা ঘর। স্টেশনারিতে ছাপা নাম আর ঠিকানা টুকে নিয়ে সব আবার ব্রিফকেসে ভরে রাখল রানা।

দ্রুত সার্চ করে কাবার্ডে কিছু পাওয়া গেল না। ওখান থেকে বেডরুমে চলে এল রানা। ভেনিনির সুটকেস রয়েছে ওয়ার্ড্রোবে, ঝুলিয়ে রাখা কিছু কাপড়চোপড়ের নিচে। সুটকেসটা ধরতে যাবে, দরজার বাইরে থেকে চাবি নাড়াচাড়ার ধাতব আওয়াজ ভেসে এল। দ্রুত সরে এসে ছোট্ট বাথরুমের ভিতর ঢুকে পড়ল ও। দরজা বন্ধ করল, তবে সামান্য একটু ফাঁক রেখে। তারপর

–স্টেট গ্লাস প্যানেল দিয়ে ঘেরা বাথটাবের দিকটায় চলে এল। স্যুইটের দরজা খুলবার শব্দ পেল ও, কথা বলছে তিনজন লোক।

'আপনাকে খুব সাবধানে চলাফেরা করতে হবে, মিস্টার চাও,' তিনজনের একজন বলল। ভেনিনির গলার আওয়াজ চিনতে পারল রানা। 'আপনি স্যান্ডার্সের ওপর আস্থা রাখুন, আপনাকে ঠিকই নিরাপদে প্লেনে তুলে দেবে। আপনার এখন কেমন লাগছে তাই বলুন।'

'ব্যথা নেই,' আরেক লোক বলল, স্পষ্ট চৈনিক বাচন ভঙ্গি। 'শুধু হাসলে একটু লাগে।'

রানা ভাবল–মিস্টার চাও? চীনা বোধহয়?

'স্যান্ডার্স,' বলল ভেনিনি, 'আমি এবার ব্রাসেলস্ ছেড়ে চলে যাব। আমার কাজ শেষ। তুমি মিস্টার চাও-এর পিছু নিয়ে নিশ্চিত হবে কোন রকম সমস্যা ছাড়াই প্লেনে উনি উঠতে পেরেছেন। ঠিক আছে?'

'হ্যাঁ,' জবাবটা এল ভারী একটা কণ্ঠস্বর থেকে।

'বসুন, মিস্টার চাও, আমি আমার জিনিস-পত্র গুছিয়ে নিই। ইচ্ছে হলে মিনিবার থেকে কিছু নিতে পারেন,' বলল ভেনিনি।

'না, ধন্যবাদ। আমি বরং টিভি দেখি।' সিটিংরুমের টিভিটাকে জ্যান্ত হতে শুনল রানা। স্যান্ডার্সের বাচনভঙ্গিতে মার্কিন টান আছে, সে নিগ্রো হতে পারে।

হঠাৎ রানাকে চমকে দিল লোকটা: 'আমি বাথরুমে যাব।'

'যান না, ওই তো ওদিকে,' বলল বেনিনি।

সর্বনাশ! ছোট্ট বাথরুমে লুকাবার কোনও জায়গা নেই। ঝাপসা কাঁচের ভিতর দিয়ে লোকটার প্রকাণ্ড কাঠামো দেখতে পাচ্ছে রানা। লোকটা নিগ্রোই। সে-ও ঘাড় ফিরিয়ে তাকালে নিশ্চয়ই ওকে দেখতে পাবে। বাথটাবের পাশে মাথা নিচু করে বসে রয়েছে রানা, পিস্তলটা আগেই হাতে বেরিয়ে এসেছে।

লোকটা গাঢ় রঙের টি-শার্ট আর ট্রাউজার পরে আছে। কাঁচ ঝাপসা হওয়ায় কাঠামোটা ভাঙাচোরা লাগলেও, তার কাঁধ দুটো বাঁধের মত চওড়া মনে হচ্ছে।

টয়লেটের সামনে দাঁড়িয়ে পেচ্ছাব করছে স্যান্ডার্স।

'স্যান্ডার্স?' কামরার ভিতর থেকে ডাকল ভেনিনি।

'এক মিনিট, মঁশিয়ে!' একটু চেঁচিয়ে বলল স্যান্ডার্স।

কাজটা রানা তাকে শেষ করতে দিল না। ধীরে ধীরে সিধে হলো ও, নিঃশব্দে বেরিয়ে এল কাঁচের পিছন থেকে। নিজের জলধারা পর্যবেক্ষণে এতই মগ্ন স্যান্ডার্স যে কিছুই সে খেয়াল করছে না। পিঠে পিস্তলের মাজল ঠেকতেও পেচ্ছাব বন্ধ করল না।

'কোন কথা নয়,' রানার কণ্ঠস্বর কর্কশ। 'ব্লাডার খালি করো।'

মাথা ঝাঁকাল লোকটা। কয়েক সেকেন্ড পর ব্লাডার খালি হয়ে গেল।

'হ্যাঁ-হ্যাঁ, বাকিটাও সারো–ঝাঁকি দাও, তারপর চেইন লাগাও।'

নির্দেশ পালন করল লোকটা।

'ফ্লাশ করলে ভাল হয়। অন্য কেউ ব্যবহার করতে আসতে পারে।'

হাত বাড়িয়ে কমোডের উপর বসানো স্টীল নবটার নাগাল পাওয়ার চেষ্টা

করল স্যান্ডার্স। টয়লেট ফ্লাশ জোরাল শব্দ করল। এই সুযোগে উল্টো করে ধরা পিস্তলটা তার মাথায় নামিয়ে আনল রানা।

দুর্ভাগ্যই বলতে হবে, লোকটার খুলি কামারের নেহাই-এর মত শক্ত। বিস্মিত রানা ইতস্তত করছে, সেই সুযোগটা পুরোমাত্রায় কাজে লাগিয়ে বন করে ঘুরল স্যান্ডার্স; বিশাল কাঠামোর ধাক্কা ফ্রস্টেড গ্লাস প্যানেলে ছুঁড়ে দিল রানাকে। কাচ ভেঙে ছড়িয়ে পড়ল চারদিকে। হাত থেকে খসে যাবার সময় পিস্তল থেকে একটা বুলেট বেরিয়ে গেল।

জ্যাকেটের কলার ধরে এমন অনায়াসে উপরে তুলল স্যান্ডার্স, রানা যেন কাগজের একটা খালি ব্যাগ। দু'জন এখন মুখোমুখি হওয়ায় রানা দেখল লোকটা ছ'ফুটেরও বেশি লম্বা, আর ওজনটা সম্ভবত তিনশো পাউন্ডের ধারেকাছেই হবে। কনুইয়ের উপর তার হাতের পরিধি কমপক্ষে বিশ ইঞ্চি।

'কী ঘটল?' দরজা আরেকটু খুলে বাথরুমে তাকাল ভেনিনি। আতঙ্কে এক সেকেন্ড পাথর হয়ে থাকল সে, তারপর পিছনে দাঁড়িয়ে থাকা চাও-এর দিকে ঘুরল। 'চলুন, কেটে পড়ি!'

স্যান্ডার্স এক হাতে মাথার চুল ধরে শূন্যে ঝুলিয়ে রাখল রানাকে, তারপর অপর হাত দিয়ে চোয়ালে একটা কঠিন ঘুসি মারল। আরেকবার ছিটকে পড়ল রানা, এবার ভাঙা কাঁচে ভর্তি বাথটাবের ভিতর। এরপর স্যান্ডার্স হাতির মত তার বাম পা তুলে বারবার রানার বুকে পাড় দিতে লাগল, ঠিক ঢেঁকির মত।

এক ছুটে সিটিংরুমে চলে এল ভেনিনি, সেখান থেকে বেডরুমে। ব্রিফকেস আর দু'একটা ব্যক্তিগত জিনিসই শুধু নিতে পেরেছে। 'থাকুক ওরা, আমরা পালাই!' চিৎকার করে দরজার দিকে চাওকে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে।

রানা অবশ হয়ে গেছে, প্রায় অজ্ঞান। পাঁজরে বুটের আঘাত অনুভব করছে, বুঝতে পারছে বাথটাব থেকে তাড়াতাড়ি উঠতে না পারলে লোকটা ওর বুকের খাঁচা ভেঙে ফুসফুস থেঁতলে দেবে।

ব্যথায় কাতর আর অন্ধ, শরীরের পাশটা হাতড়ে লম্বা আর চোখা একটা ভাঙা কাঁচ ধরল। বুটটা আবার নেমে আসতেই অবশিষ্ট সমস্ত শক্তি দিয়ে স্যান্ডার্সের পায়ের ডিমে মারল ওটা।

দৈত্য এত জোরে চেঁচাল, অবশ ভাবটা কাটিয়ে উঠল রানা। কাঁচ ফেলে দিয়ে দু'হাতে বুটটা ধরে ফেলল ও, তারপর ঠেলে দিল উপর দিকে। ভারসাম্য হারিয়ে বাথরুমের মেঝেতে ছিটকে পড়ল দানবটা। সিধে হলো রানা, লাফ দিয়ে বেরিয়ে এল বাথটাব থেকে। দেখল ওয়ালথারটা উল্টোদিকের কোণে পড়ে রয়েছে, দরজার কাছাকাছি।

মেঝেতে পড়ে থাকা স্যান্ডার্সকে টপকাবার জন্য সেদিকে লাফ দিল ও। কিন্তু একটা পা তুলে ল্যাং মারল স্যান্ডার্স। টয়লেটের পাশে মার্বেল পাথরের উপর মুখ থুবড়ে পড়ল রানা, টয়লেটের কিনারাটা যেন গেঁথে গেল কিডনিতে। প্রচণ্ড ব্যথায় আবার জ্ঞান হারাবার অবস্থা হলো ওর।

সিধে হলো স্যান্ডার্স, এগিয়ে এসে ঝুঁকল। রানার গলাটা দু'হাত দিয়ে ধরে চাপ দিচ্ছে। লোকটার গায়ে এত শক্তি, শুধু দম বন্ধ করে রানাকে মারতে রাজি

নয়। ওর উইন্ডপাইপ তো ভাঙবেই সে, সম্ভবত ঘাড়টাও।

ঘাড়ের উপর চাপ বাড়তে রানার চোখের মণি ঘুরে মাথার পিছন দিকে চলে গেল। সিঙ্কের পাশের কাউন্টারে ওর একটা হাত নিজে থেকেই কী যেন খুঁজছে–যা হোক কিছু একটা হলেই চলে, যেন অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করা যায়। ক্রিম ভর্তি কাঁচের ভারী একটা ক্যান পেল। সেটাই গায়ের জোরে ঠুকে দিল লোকটার নাকের উপর।

আবার চেঁচিয়ে উঠে রানাকে ছেড়ে দিল স্যান্ডার্স। সঙ্গে সঙ্গে পা দুটো বুকের কাছে তুলে সামনের দিকে লাথি মারল রানা, স্যান্ডার্সকে ছুঁড়ে দিল বাথরুমের দেয়ালে।

সিধে হয়ে দম ফেলবারও সময় পাওয়া গেল না, দেয়ালে বাড়ি খেয়ে ফিরে এল স্যান্ডার্স। ভাঙা কাঁচের টুকরোটা এখনও তার হাঁটুর পিছনে, নরম মাংসে গাঁথা। কাউন্টারে ভেনিনির যত টয়লেট সামগ্রী ছিল, হাতের ঝাপটায় সবগুলো স্যান্ডার্সের মুখের দিকে ছুঁড়ল রানা। এতে পিস্তলটার দিকে ছুটে আসবার সময় পাওয়া গেল। তবে নিগ্রোটাও ক্ষিপ্র বটে! পিস্তলে আঙুল ঠেকবার মুহূর্তে পিছন থেকে রানাকে ধাক্কা দিল সে। ধস্তাধস্তির এক পর্যায়ে দু'জনেই প্রায় বিস্ফোরিত হয়ে বেরিয়ে এল বাথরুম থেকে।

এখানে নড়াচড়ার জায়গা একটু বেশি পাচ্ছে ওরা। শরীরটাকে গড়িয়ে দিয়েছে রানা, যাতে বেডরুমের মাঝখানে পৌঁছে সিধে হতে পারে। হুঙ্কার ছেড়ে ওকে ধাওয়া করল স্যান্ডার্স।

একটা চেয়ার তুলে ছুঁড়ল রানা। মাছি তাড়াবার ভঙ্গিতে শূন্যে থাকতেই এক হাতে সেটাকে সরিয়ে দিল স্যান্ডার্স। চেয়ারটা উড়ে গিয়ে পড়ল পূর্ণ দৈর্ঘ্য আয়নায়, কাঁচটা খসে পড়ল শত টুকরো হয়ে। শত্রুর চোয়াল বরাবর মোক্ষম দুটো ঘুসি মারল রানা, কিন্তু লোকটা এতই শক্তিশালী যে কোথাও ব্যথা পেয়েছে বলে মনেই হলো না। ঘুরে গিয়ে একটা ব্যাক কিক ছুঁড়ল রানা। লাথিটা স্যান্ডার্সের মুখে লাগল। এবার প্রচণ্ড রেগে গেল সে। বিছানার মোটা আর ভারী গদিটা দু'হাতে ধরে শূন্যে তুলল, তারপর গায়ের জোরে ছুঁড়ে দিল রানাকে লক্ষ্য করে। গদির আঘাতে ড্রেসারের উপর পড়ে গেল রানা। হাতের কাছে একটা ল্যাম্প পেয়ে ধরল, লাঠির মত ব্যবহার করে লোকটার মাথায় মারতেও পারল। ল্যাম্প শেড আর বালব বিস্ফোরিত হলো।

লড়াইটা এখন সিটিংরুমে চলে এসেছে, এখানে নড়াচড়ার জায়গা আরও খানিক বেশি পাচ্ছে। ওয়াইনের খোলা একটা বোতল রয়েছে ভেজা বার-এর উপর। গলাটা মুঠোয় ভরে দেয়ালে আছাড় মেরে ভাঙল রানা সেটা, চারপাশে ছড়িয়ে পড়ল রক্তলাল তরল পদার্থ। এবার ওর হাতে একটা ধারাল অস্ত্র আছে। পরস্পরের উপর চোখ রেখে দু'জন এখন ধীরে ধীরে চক্কর দিচ্ছে। ভাঙা বোতল হাতে থাকায় স্যান্ডার্সকে আপাতত রানা দূরে সরিয়ে রাখতে পারছে।

হাসল স্যান্ডার্স। হাসিটা থামেনি, হঠাৎ রানাকে লক্ষ্য করে লাফ দিল সে। রানাও ভাঙা বোতল চালাল। ক্ষুরের মত ধারাল কিনারা আঁচড় কাটল শত্রুর মুখে, পাশাপাশি তিনটে, কোনটার গভীরতাই আধ ইঞ্চির কম নয়।

আহত বাঘের মত হুঙ্কার ছাড়ল স্যান্ডার্স।

পিছিয়ে গিয়েছিল, হঠাৎ একলাফে এগিয়ে এসে ভাঙা বোতলটা আবার চালাল রানা, এবার গাঁথার ভঙ্গিতে। পেটের ভিতর বোতলের অর্ধেকটা নিয়ে ঘুরল স্যান্ডার্স, কাঁচটা দু'হাতে ধরে আছে। পিছন থেকে পিঠে কষে একটা লাথি মারল রানা। ছিটকে টিভির উপর মাথা দিয়ে পড়ল শত্রু। চাও ওটাকে অন করে রেখে গেছে।

সচল টিভির পিকচারটিউব বিস্ফোরিত হলো, ফলে পথ পেয়ে ভিতরে সেঁধিয়ে গেল স্যান্ডার্সের মাথা। আগুনের ফুলকি মেঘের আকৃতি পেল। তারপর একরাশ কালো ধোঁয়ায় ভরে উঠল ঘর। নিগ্রোর শরীর টান টান হয়ে উঠল, তারপর শুরু হলো অদম্য কাঁপুনি। কয়েক সেকেন্ড পর নির্জীব, অসাড় হয়ে গেল সে। টেলিভিশন এখনও মাথার চারধারে ফিট করা, কার্পেটের উপর আছাড় খেল প্রকাণ্ড শরীরটা। তারপর আর নড়ল না।

নিজের শরীরে কোথায় কী ক্ষতি হয়েছে পরীক্ষা করল রানা। পিঠের নীচের ব্যথাটা প্রায় অসহ্য। পাঁজরে যেন আগুন জ্বলছে। একটা, কিংবা হয়তো দুটো হাড় ভেঙেছে। কিডনির ক্ষতি হয়নি, এ-কথা জোর দিয়ে বলা যায় না। হাত আর পায়ের বেশ কয়েক জায়গা থেকে রক্ত গড়াচ্ছে এখনও।

তবে বেঁচে আছে ও।

ফোনটা মেঝেতে পেল রানা। লিৎসার মোবাইলে একটা কল করল। সাড়া পেতে বলল, 'ভেনিনি আর এক চীনালোক এই মাত্র বেরিয়েছে। তুমি দেখেছ?'

'না। ঠিক কখন বেরুল বলুন তো?'

'কয়েক মিনিট আগে।'

'ড্যাম! তাহলে হোটেলের পিছন দিয়ে পালিয়েছে।'

'চেষ্টা করে দেখো হদিশ বের করতে পারো কি না। দশ মিনিটের মধ্যে আমার স্যুইটে ফোন করবে।'

'মিস্টার রানা, আপনি কী নীচে নামবেন?' জিজ্ঞেস করল লিৎসা।

পিঠের ব্যথাটা রানাকে একটা আচ্ছন্নতার মধ্যে ঠেলে দিচ্ছে। 'কিছুক্ষণ পর,' অনেক চেষ্টা করে শুধু এই দুটো শব্দ উচ্চারণ করতে পারল ও। ফোন রেখে দিয়ে মিনিবার খুলল। সামনে একটা হুইস্কির বোতল রয়েছে। সরাসরি বোতল থেকে বেশি না, মাত্র দু'ঢোক; সারা শরীরে উষ্ণ আরাম ছড়িয়ে পড়ল, তারপর ভোঁতা হয়ে গেল সমস্ত ব্যথা।

খোঁড়াতে খোঁড়াতে বাথরুমে এসে পিস্তলটা তুলে নিল রানা। স্যুইট থেকে বেরিয়ে এসে দেখল করিডর খালি। সিঁড়িতেও কারও সঙ্গে দেখা হলো না।

নিজের স্যুইটে ঢুকে আয়নার সামনে দাঁড়াল রানা। ডান ভুরুর ডান দিকে কুৎসিত একটা কালসিটে পড়ে গেছে। বাম চোয়ালের অনেকটা চামড়া উঠে গেছে।

শাওয়ারের নীচে দাঁড়িয়ে গরম পানি ছাড়ল রানা। ইচ্ছে হলো এখানে দাঁড়িয়েই ঘুমিয়ে পড়ে।

সাত

পরদিন সকালে লিৎসা একটা প্রাইভেট ক্লিনিকে নিয়ে গেল রানাকে।

ব্যথা আর দুঃস্বপ্ন জাগিয়ে রাখায় রাতটা খুব কষ্টে কেটেছে রানার। নানা জায়গায় ফোন করে লিৎসা প্রায় নিশ্চিত হয়েছে, ভেনিনি ব্রাসেলস ছেড়ে চলে যায়নি। কিন্তু রানা তার কথার উপর খুব একটা ভরসা করতে পারছে না। এয়ারপোর্ট আর রেলস্টেশনে লোক আছে ভাল কথা। কিন্তু সে যদি সড়ক পথে বেলজিয়াম ছাড়তে চায়।

ডাক্তার ফ্রেঞ্চ ভাষায় জানালেন, ওর পাঁজরের একটা হাড়ে চিড় ধরেছে। 'আপনার কিডনির কোন ক্ষতি হয়েছে বলে মনে হচ্ছে না, তবে প্রস্রাবের সঙ্গে রক্ত গেলে আরও টেস্টের জন্যে আসতে হবে আপনাকে।'

ওর বুকে আঁটসাঁট একটা হারনেস বেঁধে দিলেন তিনি, অন্তত এক হপ্তা পরে থাকতে হবে। বিশেষ ধরনের স্ট্র্যাপ, যখন খুশি খোলা আর পরা যায়–তবে রাতে অবশ্যই পরে শুতে হবে।

ফিরবার পথে একটা গ্যারেজ থেকে নিজের সিঁত্রো জেডএক্স বের করল লিৎসা। রানাকে পাশে বসিয়ে ছেড়ে দিল গাড়ি। 'এখন আমরা সে-ই ডাক্তারের কাছে যাব,' বলল সে। 'তাঁর সম্পর্কে খবর নিয়েছি আমি। ডাক্তার র‍্যানডলফ একজন কার্ডিওলজিস্ট। শুনলাম বেশ নাম করা মানুষই।'

দশ মিনিটের মধ্যে ডাক্তার র‍্যান্ডলফের বাড়ির সামনে সিঁত্রো থামাল লিৎসা। গাড়ি থেকে নেমে ইন্টারকমের বোতাম টিপল রানা, নিজেদের পরিচয় দিল 'পুলিশ'। দরজায় উদয় হলো একজন নার্স, জানাল ডাক্তার র‍্যানডলফ একজন রোগীর সঙ্গে কথা বলছেন।

'আমরা অপেক্ষা করব,' বলল লিৎসা, হাতব্যাগ খুলে নিজের কাগজ-পত্র দেখাল নার্সকে। নার্স ওদেরকে ওয়েটিংরুমে নিয়ে এসে বসাল।

পাশের ঘর থেকে নরম একটা পুরুষ কণ্ঠ ভেসে আসছে। কয়েক মিনিট পর বয়স্কা এক ভদ্রমহিলা চেম্বার থেকে বেরিয়ে এলেন, তাঁর পিছু নিয়ে ডাক্তারও। ফ্রেঞ্চ ভাষায় ভদ্রমহিলাকে বিদায় জানালেন তিনি, তারপর রানা আর লিৎসার দিকে ফিরলেন।

রানার অনুমতি নিয়ে লিৎসাই ডাক্তারের সঙ্গে কথা বলল: ওরা সরকারের প্রতিনিধি, তাঁকে কিছু প্রশ্ন করতে এসেছে।

সঙ্গে সঙ্গে রানা বুঝতে পারল, ভেনিনির সঙ্গে ডাক্তার জড়িত। তাঁর চোখ বড় হয়ে উঠল, একটা ঢোক গিললেন।

'আসুন।' ওদেরকে নিয়ে নিজের চেম্বারে ঢুকলেন ডাক্তার।

এবার রানা শুরু করল, 'ডাক্তার, আপনার কি মনে পড়ে এ-ধরনের কোন স্কেচ কখনও এঁকেছিলেন কিনা?' ডাক্তারের ডেস্ক থেকে একটা কলম নিয়ে

প্রেসক্রিপশন প্যাডে মানুষের একটা ধড় আঁকল। ও যখন বাম বুকের উপর চৌকো ঘরটা আঁকতে শুরু করেছে, চেয়ারে নেতিয়ে পড়ে দু'হাতে মুখ ঢাকলেন ডাক্তার র‍্যানডলফ্।

'জবাব দিন,' বলল রানা।

'আমাকে কি অ্যারেস্ট করা হচ্ছে?'

'এখনই বলতে পারছি না। সব কথা খুলে বলার ওপর আপনার ভাল-মন্দ নির্ভর করবে।'

'কিন্তু আমাকে তো আমার রোগীর গোপনীয়তাও রক্ষা করতে হবে,' বিড়বিড় করে বললেন ডাক্তার।

রানা বুঝতে পারছে। এই লোক সামান্য একটা ঘুঁটি মাত্র। হয়তো একটু ভয় দেখালে ঠিকই মুখ খুলবে। 'ডক্টর র‍্যানডলফ্, আমরা এখানে গুরুতর একটা এসপিওনাজ সমস্যা নিয়ে এসেছি। সহযোগিতা না করলে আপনাকে আমরা অ্যারেস্ট করতে বাধ্য হব। নিশ্চয়ই জানেন, এসপিওনাজ একটা মেজর ক্রাইম। অভিযোগ প্রমাণিত হলে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হবে। নিদেনপক্ষে প্র্যাকটিস করার লাইসেন্স তো হারাবেনই। এবার বলুন মুখ খুলবেন, না থানায় যাবেন?'

ডাক্তার প্রায় ফুঁপিয়ে উঠলেন: 'হ্যাঁ, অপারেশনটা আমি করেছি। করতে আমাকে বাধ্য করা হয়েছে।'

'আপনি বরং প্রথম থেকে শুরু করুন, প্লিজ,' পরামর্শ দিল লিৎসা।

ডাক্তারকে আবার ইতস্তত করতে দেখা গেল।

রানা বলল, 'ডক্টর র‍্যানডলফ্, আপনি কিন্তু মারাত্মক একটা বিপদের মধ্যেও পড়েছেন। যাদের সঙ্গে নিজেকে জড়িয়েছেন তাদের বিবেক বা দয়ামায়া বলে কিছু নেই। মানুষ খুন করা তাদের পেশা।'

গ্লাস তুলে এক ঢোক পানি খেলেন ডাক্তার। 'যদি সব কথা বলি, আপনারা আমাকে প্রোটেকশনের গ্যারান্টি দেবেন?' জানতে চাইলেন তিনি।

'সম্ভবত,' বলল রানা। 'ব্যাপারটা নির্ভর করবে কতটুকু আপনি বলবেন আর তা কী পরিমাণে সাহায্যে আসবে তার ওপর।'

মাথা ঝাঁকিয়ে শুরু করলেন ডাক্তার। 'পাঁচ···না, ছ'মাস আগে আমি ছোটখাট একটা ঝামেলায় পড়ি। ব্যাপারটা এক মহিলা পেশেন্টকে নিয়ে। আমি বিবাহিত নই; ওই মহিলা আমার প্রতি খুব আকৃষ্ট হয়ে পড়ে। আমি তার আহ্বানে সাড়া দিয়ে বড় বেশি জড়িয়ে পড়ি। তবে সে-ই আমাকে উৎসাহিত করেছিল। ব্যাপারটায় আমাদের দু'জনেরই সম্মতি ছিল।'

'বেশ।'

'কিন্তু যেভাবেই হোক, কারা যেন আমাদের ঘনিষ্ঠ মুহূর্তের ফটো তোলে—এই চেম্বারে। আমাকে ফাঁদে ফেলা হয়। পরে ওই মহিলা আমার বিরুদ্ধে রেপ আর ম্যালপ্র্যাকটিসের মামলা করে। কিন্তু আসল সত্য হলো ওই মহিলা জিএম নামে একটা অপরাধীচক্রের সদস্য।'

'বলে যান,' মাথা ঝাঁকিয়ে উৎসাহ দিল রানা।

'আপনারা ওদের সম্পর্কে জানেন?'

'হ্যাঁ। প্লিজ, ডাক্তার, আপনার কথা শেষ করুন।'

স্বস্তির একটা নিঃশ্বাস ফেললেন ডাক্তার। 'থ্যাঙ্ক গড। ভয় হচ্ছিল আপনারা না আমাকে পাগল ভাবেন। এই জিএম-এর লোকরা আমার সঙ্গে যোগাযোগ করে জানাল তাদের একটা কাজ করে দিলে রেপ আর ম্যালপ্র্যাকটিসের মামলা তুলে নেয়া হবে। তখন আমি ভেবেছিলাম শুনানি শুরু হলে কোর্টে আমি প্রমাণ করতে পারব যে মহিলাকে আমি রেপ করিনি। কাজেই তাদেরকে আমি অপমান করে তাড়িয়ে দিই। তারপর তারা কুৎসিত একটা কাজ শুরু করল।

'ডাকযোগে ফটো আসতে লাগল। ওই মহিলার সঙ্গে আমার আপত্তিকর মেলামেশার দৃশ্য ছিল সেগুলোয়। দুই কি তিন হপ্তা পর পর একটা করে প্যাকেটে ফটোগুলো আসত। সব আমি পুড়িয়ে ফেলতাম। তারপর জিএম-এর লোকেরা আবার আমার সঙ্গে যোগাযোগ করল। হুমকি দিয়ে বলল, তাদের কাজটা যদি করে না দিই, আমার হাত-পা ভেঙে পঙ্গু করে দেয়া হবে।'

'কীভাবে তারা যোগাযোগ করেছিল?'

'সব সময় ফোনে গলার আওয়াজ শুনে মনে হয়েছে লোকগুলো ফরাসী। কলগুলো লোকাল এক্সচেঞ্জ থেকে করা হয়েছে, আমি নিশ্চিত।'

'তারপর কী ঘটল?' জিজ্ঞেস করল লিৎসা।

'আমার কিছু করার ছিল, বলুন? ওদেরকে সাহায্য করতে রাজি হলাম আমি,' বললেন ডাক্তার। ঘামছেন তিনি। পানির গ্লাসটা আবার ধরার সময় দেখা গেল হাতটা থরথর করে কাঁপছে।

'কী সাহায্য?'

'আমাকে বলা হলো মিস্টার তিয়েন চাও নামে একজন চীনা ভদ্রলোক আমার কাছে আসবেন। বয়স পঞ্চান্ন, একটা পেসমেকার সত্যি তাঁর দরকারও। হার্ট রিদম ওঠা-নামা করে। ইউনিভার্সিটি হসপিটালে তাঁর অপারেশন করার নির্দেশ দেয়া হয় আমাকে।

'অপারেশনের আগের রাতে আমাকে জানানো হলো, একজন শ্বেতাঙ্গ জিম্বাবুয়েয়ান এসে আমাকে একটা মাইক্রোডট দিয়ে যাবে। ওটা থাকবে এক টুকরো ফিল্মের ওপর। আমার কাজ হবে অপারেশনের আগে পেসমেকারের ভেতর মাইক্রোডটটা ঢোকানো। ক্ষতিকর কিছু নয়, তাই কাজটা আমি করেছি।'

'এটা কবেকার ঘটনা?'

'অপারেশনটা হয়েছে আজ দু'দিন।'

'মিস্টার তিয়েন চাও-এর ফাইলটা একবার দেখব আমরা,' বলল রানা।

প্রথমে ইতস্তত করলেও, পরে মাথা ঝাঁকালেন ডাক্তার র‍্যানডলফ্। 'সেটা এখানেই আছে।' দেরাজ খুলে ছোট একটা ফাইল বের করলেন তিনি।

ফাইলটা নিয়ে পরীক্ষা করল রানা। তেমন কিছু পাওয়া গেল না। এই লোকের আসল নাম তিয়েন চাও না হবারই বেশি সম্ভাবনা। রোগীর ঠিকানার জায়গায় লেখা হয়েছে স্কাইলার্ক হোটেল।

'ওরা আপনাকে জানিয়েছে মাইক্রোডটে কী আছে?'

মাথা নাড়লেন র‍্যানডলফ্। 'আমি জানতে চাইনি।'

কথাটা বিশ্বাস করল রানা। এতটা ভয় পাওয়া একজন মানুষ মিথ্যে কথা বলতে পারে না। 'আপনি জানেন, মিস্টার চাও এখন কোথায় আছে?'

কাঁধ ঝাঁকালেন ডাক্তার র‍্যানডলফ্। 'না। ভদ্রলোক তাইওয়ানিজ হলেও, সঙ্গে মার্কিন পাসপোর্ট আছে। জিম্বাবুয়েয়ান ভদ্রলোক জানতে চাইছিলেন, অপারেশনের পর মিস্টার চাও প্লেনে দূরের পথ পাড়ি দিতে পারবেন কি না। তিনি হয়তো তাইওয়ানে বা আমেরিকায় ফিরে যাচ্ছেন।'

'আর আপনি নিশ্চিত যে কাজটা যারা আপনাকে দিয়ে করিয়েছে তারা জিএম-এর লোক?'

'হ্যাঁ।'

'জিএম মানে আপনি জানেন?'

'জানি। গ্রুপ অভ মার্সেনারি। ওরাই বলেছে।'

চেয়ার ছাড়ল রানা। 'ঠিক আছে। ডাক্তার র‍্যানডলফ্, আপনি আমাদের সঙ্গে এলে সবদিক থেকে ভাল হয়। আপনাকে আরও কিছু প্রশ্ন করা হবে, কিছু ফটোও দেখানো হবে। এটা আপনারই নিরাপত্তার জন্য। এর পিছনে সত্যি যদি জিএম থেকে থাকে, আর তারা যদি জানতে পারে আপনি মুখ খুলেছেন, আপনার বেঁচে থাকার সম্ভাবনা খুবই কম।'

'আমাকে তাহলে অ্যারেস্ট করা হচ্ছে?'

মাথা ঝাঁকাল লিৎসা। 'আপনার জন্য সেটাই ভাল হবে, ডাক্তার। আমরা আপনাকে পুলিশ স্টেশনে নিয়ে যাচ্ছি। সব জানার পর পুলিশ অফিসাররা আপনাকে নিরাপদ কোথাও সরিয়ে ফেলবে। অপরাধীরা ধরা পড়লে কোর্টে সাক্ষি দেয়ার জন্য আপনাকে দরকার হবে ওঁদের।'

'তারমানে আমাকে···টেস্টিফাই করতে হবে?'

মাথা ঝাঁকাল রানা। 'আপনিই একমাত্র ব্যক্তি যিনি প্রমাণ করতে পারবেন যে ডক্টর ভেনিনি আপনাকে মাইক্রোডটটা দিয়েছিল।'

'তিনি আমাকে তাঁর নাম বলেছেন ডেভিড নোলান।'

'ওটা তার ছদ্মনাম। আসুন, ডাক্তার। আপনি বরং নার্সকে ডেকে আজকের সব অ্যাপয়েন্টমেন্ট বাতিল করে দিন।'

পুলিশ স্টেশনটা রু মার্চে অউ শারবন-এ। রানা এজেন্সির হেড অফিস থেকে ইন্টারপোলের মাধ্যমে বেলজিয়াম পুলিশকে পরিস্থিতি সম্পর্কে এরই মধ্যে একটা ধারণা দেওয়া হয়েছে।

ডাক্তার র‍্যানডলফকে আটক রাখা হলো পরদিন প্যালাইস দে জাস্টিস-এ অনুষ্ঠিতব্য শুনানিতে অংশগ্রহণ করবার জন্য। হিউগো ভেনিনি আর তিয়েন চাও-এর বিরুদ্ধে গুপ্তচরবৃত্তির অভিযোগ বিবেচনা করবার জন্য একজন পাবলিক প্রসিকিউটরকে দায়িত্ব দেওয়া হলো। ভেনিনি আর চাওকে অ্যারেস্ট করবার একটা আদেশও ইস্যু হয়েছে।

দুপুরের পরও বেশ কিছুক্ষণ লিৎসাকে নিয়ে পুলিশ স্টেশনে থাকল রানা। ভিতরে ঢুকে একবার দেখেও এল সত্যি সত্যি ডাক্তার র‍্যানডলফকে আলাদা

একটা সেলে একা রাখা হয়েছে কি না। ইন্সপেক্টর গফনার ওদেরকে আশ্বস্ত করল, নতুন কিছু জানা গেলে সঙ্গে সঙ্গে যোগাযোগ করবে সে।

পুলিশ স্টেশন থেকে বেরুবার আগে স্কাইলার্ক হোটেলে একটা ফোন করল রানা। রিসেপশন থেকে বলা হলো, মিস্টার তিয়েন চাও হোটেল ছেড়ে চলে গেছেন।

'কাল আমরা ইন্টারপোলের ফাইল সার্চ করব,' লিৎসাকে বলল রানা। তিয়েন চাওকে কেন যেন চেনাচেনা মনে হয়েছে আমার। জানতে হবে আসলে কে সে।'

পরদিন সকাল ঠিক সাড়ে আটটায় বেলজিয়ান পুলিশ ডাক্তার র‍্যানডলফকে নিয়ে প্যালাইস দে জাস্টিস-এর উদ্দেশে রওনা হলো। রাতে যে-ই পুলিশের হাতে ধরা পড়ুক, পরদিন সকালে তাকে আদালতে হাজির করাটা আঠারোশো তিরাশি সালের শক্ত একটা আইন, এই আইন আজ পর্যন্ত লঙ্ঘন করা হয়নি।

রানার পরামর্শ ছিল ডাক্তার র‍্যানডলফকে যেন গোপনে পাঠানো হয়, কারণ সুযোগ পেলে জিএম হয়তো তাঁকে গুলি করে ফেলে দেবে। ইন্সপেক্টর গফনার শুধু দক্ষ অফিসার নন, অত্যন্ত তৎপর আর পরিশ্রমী অফিসার হিসাবে তাঁর যথেষ্ট সুনাম আছে। রানার কথা শুনে হেসে উঠে বলেছেন, তাঁরা সব রকম প্রস্তুতিই গ্রহণ করবে।

তবে আজ সকালে ইন্সপেক্টর গফনারকে পাওয়া যাচ্ছে না। তাঁকে অন্য একটা ব্যাপারে ডেকে নেয়া হয়েছে, ফলে বন্দিকে ট্র্যান্সফার করবার দায়িত্ব পেয়েছে তাঁর সহকারী সার্জেন্ট কোয়েলার।

কোয়েলার ডাক্তার র‍্যানডলফের অপরাধ সম্পর্কে কিছু জানে না। অর্থাৎ এই কেসের গুরুত্ব সম্পর্কে সে সম্পূর্ণ অজ্ঞ। ডাক্তারকে সে আরও দু'জন বন্দির সঙ্গে একটা সাধারণ পুলিশ ভ্যানে তুলে দিল। বিশেষ পরিস্থিতিতে আর্মারড্ কার ব্যবহার করা হয়, কিন্তু তাতে সময় আর লোকবল বেশি লাগে। কোয়েলার অবশ্য আর্মারড্ কারের কথা চিন্তাই করেনি।

হাতে হাতকড়া আর পায়ে লোহার চেইন পরানো হয়েছে, ডাক্তার র‍্যানডলফকে দু'জন জনডার্ম পথ দেখাল। বাকি দু'জন বন্দি ট্যুরিস্টদের টাকা-পয়সা ছিনতাই করতে গিয়ে ধরা পড়েছে: তাদেরকে আগেই তোলা হয়েছে জলপাই সবুজ মার্সিডিজ ভ্যানে।

পিছনে উঠে বসলেন ডাক্তার, অ্যারেস্ট হবার পর থেকেই নার্ভাস আর সন্ত্রস্ত হয়ে আছেন। এ ধরনের ব্যবহার পেতে অভ্যস্ত নন ভদ্রলোক। নামকরা একজন ডাক্তার তিনি! রাজধানীর অনেক প্রথম শ্রেণীর নাগরিক তাঁর রোগী! তবে তিনি আশা করছেন খুব তাড়াতাড়ি ঝামেলা মিটে যাবে, তারপরই পুলিশ তাঁকে নিরাপদ কোথাও সরিয়ে ফেলবে। তাঁর উকিল বলেছেন, সবকিছুরই সুষ্ঠু সুরাহা হতে হবে। তবে র‍্যানডলফের সন্দেহ আছে ভবিষ্যতে তিনি আর প্র্যাকটিস করতে পারবেন কি না।

ভ্যানের পিছন দিকটা একবার দেখে নিয়ে প্যাসেঞ্জার সাইডে উঠে বসল সার্জেন্ট কোয়েলার। গ্যারেজের দরজা খুলবার সংকেত দিল সে।

পুলিশ স্টেশন থেকে পাঁচ-সাতটা দালানের পর সত্তর বছরের পুরানো ছোট একটা চ্যাপেল আছে। বুরুজের একটা জানালা থেকে উঁকি দিলে রাস্তার পুরোটাই দেখতে পাওয়া যায়।

ওই জানালার পিছনে বসে রয়েছে ডক্টর হিউগো ভেনিনি। তার হাতের সিএসএস থ্রি হানড্রেড ভিএইচএফ/ইউএইচএফ রেডিও ট্রান্সসিভারটা মুখের কাছে ধরা। 'স্ট্যান্ড বাই,' বলল সে।

গ্যারেজের দরজা খুলে গেল।

'হ্যাঁ, ওরা বেরিয়ে আসছে,' আবার বলল সে। 'পাখিটাকে এদিকে পাঠিয়ে দাও।'

'ঠিক আছে, পাঠাচ্ছি,' অপরপ্রান্ত থেকে জবাব এল।

গ্যারেজ থেকে বেরিয়ে এল ভ্যান। আদালতে পৌঁছাতে দশ মিনিট লাগবে।

'সবুজ একটা ভ্যান,' রিপোর্ট করল ভেনিনি। 'সামনে দু'জন লোক। দেখে মনে হচ্ছে র‍্যানডলফের সঙ্গে আরও কেউ আছে পিছনে। ঠিক ক'জন বলতে পারছি না।'

'তাতে কিছু আসে যায়?'

ভেনিনির গলা থেকে চাপা খানিকটা হাসি বেরুল। 'নাহ্। বন্দি বন্দিই। ঠিক কি না?'

যানবাহনের ভিড় থাকায় সরু রাস্তা ধরে ধীরগতিতে এগোচ্ছে ভ্যান। এরকম সময়ে ট্র্যাফিক একটু বেশি থাকবেই। সার্জেন্ট কোয়েলারের চোখে আর কোন অস্বাভাবিকতা ধরা পড়ছে না।

ব্রাসেলস্ যেহেতু বড়সড় মেট্রোপলিটান শহর, আকাশে হেলিকপ্টারের আনাগোনা অত্যন্ত স্বাভাবিক একটা ঘটনা। রাশিয়ায় তৈরি এমআই-টোয়েনটিফোর হাইন্ড অ্যাসল্ট চপারটায় সাদা রঙ চড়ানো হয়েছে, কেউ যাতে কিছু সন্দেহ করতে না পারে।

বাঁক ঘুরে রু দো মিনি মেস-এ পড়ল ভ্যান। এটা বেশ চওড়া রাস্তা, দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে এগিয়েছে। আদালত ওদিকেই।

ভেনিনি বলল, 'পাখিটাকে আমি এখন দেখতে পাচ্ছি। সব দায়িত্ব এখন তোমার। ওভার অ্যান্ড আউট।' রেডিও অ্যান্টেনা নামিয়ে সিধে হলো সে। তরতর করে সিঁড়ি বেয়ে নীচে নামল। চ্যাপেলের পিছনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেল রাস্তায়।

এখানে সে একটা ভাড়া করা নীল রঙের মার্সিডিজ রেখে গেছে। এই মুহূর্তে ওটার প্যাসেঞ্জার সিটে পিয়েন চাও বসে রয়েছে, চোখ দুটো বন্ধ।

ড্রাইভিং সিটে উঠে বসে গাড়ি ছেড়ে দিল ভেনিনি। চোখ মেলে চাও জিজ্ঞেস করল, 'কী ঘটল?'

'কয়েক মিনিটের মধ্যে জানতে পারব,' জবাব দিল ভেনিনি।

চওড়া রাস্তায়ও আগের মত ধীরে এগোচ্ছে পুলিশ ভ্যান। অফিস আওয়ার, কে না গাড়ি বের করেছে। মাথার উপর ঝুলে থাকা হেলিকপ্টারের দিকে কারও কোন খেয়াল নেই। স্টাব উইং-এর রকেট পড-এ বত্রিশটা ৫৭এমএম প্রজেক্টাইল

থাকায়, হাইন্ড অ্যাসল্ট চপার সাধারণত ছোট লক্ষ্য বস্তুতে আঘাত হানতে ব্যর্থ হয় না কখনও।

লাল আলোয় থামতে হলো ভ্যানটাকে। কপ্টারের আওয়াজ শুনে জানালার বাইরে তাকাল ড্রাইভার। চোখ ইশারায় কোয়েলারকে ওটা দেখাল সে। আকাশের দিকে তাকাতে রোদ লেগে ধাঁধিয়ে গেল সার্জেন্টের চোখ। অস্পষ্টভাবে শুধু একটা হেলিকপ্টারই দেখতে পেল সে, সাদা রঙের।

'টিভি নিউজ চ্যানেলের কপ্টার,' বলল সে। 'ওটাকে নিয়ে তোমার দুশ্চিন্তা করতে হবে না।'

সবুজ আলো দেখে ভ্যান ছেড়ে দিল ড্রাইভার।

আকাশে, জিএম সদস্যের হাত রয়েছে ট্রিগারে; অন্যান্য যানবাহনের কাছ থেকে ভ্যানটা একটু দূরে দেখে তার মনে হলো এটাই আদর্শ সময়।

হেলিকপ্টারের তলা থেকে দুটো রকেট বেরিয়ে এল, তারপর মুহূর্তের জন্য ইতস্তত একটা ভাব দেখা গেলেও, এত দ্রুত নিচে নামল যে কেউ বুঝতে পারল না আসলে কী ঘটেছে। সবাই শুধু বুঝল যে ভ্যানটা প্রচণ্ড শক্তিতে বিস্ফোরিত হয়েছে। পথিকরা আর্তনাদ করছে। অন্যান্য গাড়ি বিস্ফোরণ আর আগুন এড়াবার চেষ্টায় একটা আরেকটার সঙ্গে ধাক্কা খেল। কয়েক মিনিট চরম বিশৃংখল অবস্থায় থাকল রাস্তাটা। ভ্যানটার অবশিষ্ট বলতে থাকল শুধু জ্বলন্ত চেসিস, কয়লায় পরিণত পাঁচটা লাশ সহ।

হাইন্ড নাক ঘুরিয়ে দক্ষিণ দিকে ছুটছে। কর্তৃপক্ষ যখন সিদ্ধান্তে পৌঁছাল যে ভ্যানের উপর হামলা হয়েছে আকাশ থেকে, তার অনেক আগে দিগন্তের ওপারে হারিয়ে গেছে হেলিকপ্টারটা।

ইতোমধ্যে মার্সিডিজ নিয়ে 'দ্য রিঙ'-এ পৌঁছে গেছে ভেনিনি। ই-নাইনটিন এগজিট-এর দিকে যাচ্ছে সে।

'প্যারিসে পৌঁছাতে কতক্ষণ লাগবে?' জানতে চাইল চাও।

'জানি না,' বলল ভেনিনি। 'আরাম করে বসে প্রাকৃতিক দৃশ্য উপভোগ করুন। আমি আপনাকে ঠিক সময় মতই প্লেনে তুলে দেব।'

'আমার কর্তারা প্ল্যানের এই পরিবর্তনে খুশি হবেন না।'

গত দু'দিন তিয়েন চাও-এর সঙ্গে থেকে ভেনিনি বুঝতে পারছে, চীনা লোকটা তাদের আয়োজনের প্রতিটি দিক সম্পর্কে অসন্তুষ্ট। ব্যাপারটা অত্যন্ত বিরক্তিকর। 'আচ্ছা, ডাক্তার ধরা পড়লে আমাদের কী করার আছে বলুন? বাধ্য হয়েই তার ব্যবস্থা করতে হলো আমাকে। সে আমাদের পরিচয় ফাঁস করে দেবে, এরকম ঝুঁকি কি নেয়া উচিত হত? জিএম বাধ্য হয়েই শেষ মুহূর্তে প্ল্যানটা বদলেছে।'

'তাই বলে তাইওয়ানের বদলে–'

চাওকে থামিয়ে দিয়ে ভেনিনি বলল, 'হ্যাঁ, ব্রাসেলস থেকে তাইওয়ানে যাবারই প্ল্যান ছিল, কিন্তু সঙ্গত কারণেই সেটা বাতিল করা হয়েছে। আমাদের দু'জনের ফটোই বেলজিয়ামের প্রতিটি ইমিগ্রেশন ডেস্কে পৌঁছে গেছে। প্লেনে ওঠার আগেই আপনি অ্যারেস্ট হয়ে যাবেন।'

মুখে যাই বলুক, ভেনিনির আত্মবিশ্বাসে চিড় ধরেছে। শেরাটন হোটেলে ওই ঘটনার পর অত্যন্ত নার্ভাস বোধ করছে সে। সবকিছু ভেঙে পড়তে যাচ্ছে। স্যান্ডার্সকে ভাড়া করা হয়েছিল চাওকে পাহারা দেওয়ার জন্য, কিন্তু সে নিজেকেই রক্ষা করতে পারেনি। মোসাদ চেয়েছিল চাওকে তাইওয়ানের প্লেনে তুলে দেওয়া হোক, কিন্তু প্ল্যান শেষ মুহূর্তে বদলাতে হয়েছে।

'আপনাকে আমার জানানো দরকার যে,' বলল ভেনিনি, 'জিএম চুক্তির শর্ত পুরোপুরি পালন করেছে। ফর্মুলাটা আমরা একটা মাইক্রো ডটে ভরেছি, মাইক্রোডটটা ভরেছি আপনার শরীরে। তাইওয়ান হয়ে তেল আবিবে যাবেন কী সিঙ্গাপুর হয়ে, সেটা আপনার সমস্যা।'

'না,' বলল চাও। 'জিএম-এর সঙ্গে আমার লোকদের কথা হয়েছে আপনারা আমাকে তাইওয়ানে তো পৌঁছে দেবেনই, ওখান থেকে আমি যাতে সিঙ্গাপুর আর শ্রীলংকা হয়ে ইজরায়েলে পৌঁছাতে পারি তার ব্যবস্থাও করবেন।'

'আমরা তাই করছিই তো। অরিজিন্যাল প্ল্যান বদলেছি? তাতে কি! নতুন প্ল্যান আরও জটিল, সময়ও বেশি নেবে, তবে তাইওয়ানে পৌঁছাবেন আপনি নিরাপদে। তারপর তো চার্টার করা প্লেন তৈরিই পাবেন। রিল্যাক্স।'

'কিন্তু বিশেষ করে ভারতে আমি একদমই যেতে চাই না,' বলল চাও।

'এ-ব্যাপারে আমার কিছু করার নেই,' বলল ভেনিনি। 'আমার সুপিরিয়ররা আমাকে এই নির্দেশ দিয়েছে। আপনাকে নিয়ে চার্লস দ্য গল এয়ারপোর্টে পৌঁছাব আমি। ওখানে আপনি নয়াদিল্লিগামী একটা প্লেনে উঠবেন। দিল্লিতে অল্প কিছু সময় থাকবেন। ওখান থেকে ধরবেন কাঠমাণ্ডু ফ্লাইট। ওটা নেপালে।'

'আমি গর্দভ নই।'

কাঁধ ঝাঁকাল ভেনিনি। 'কাঠমাণ্ডুতে আপনার সঙ্গে যোগাযোগ করা হবে। তারাই আপনাকে আপনার হোটেলে খুঁজে নেবে। এসব বিষয়ে সমস্ত তথ্য আমার দেয়া প্যাকেটে পাবেন। তারাই আপনাকে তাইওয়ান, তারপর সিঙ্গাপুর হয়ে শ্রীলঙ্কায় পৌঁছে দেয়ার ব্যবস্থা করবে। ওখান থেকে ইজরায়েলে কীভাবে যাবেন সেটা আপনার ব্যাপার।'

'গোটা জার্নিটা অত্যন্ত ক্লান্তিকর মনে হচ্ছে। ভুলবেন না যে এইমাত্র সার্জারি হয়েছে আমার।'

'তিক্ত শোনালেও কথাটা না বলে পারছি না, আপনি আরেকটু কৃতজ্ঞ বোধ করলে পারতেন,' শুকনো গলায় বলল ভেনিনি। 'জিএম শ্রীলঙ্কা পর্যন্ত আপনার নিরাপত্তার দায়িত্ব নিয়েছে স্রেফ সৌজন্যবশত। এতটা আমরা না করলেও পারতাম। আগেও যেমন বলেছি, আমাদের বাধ্যবাধকতা শেষ হয়ে গেছে ফর্মুলাটা আপনার শরীরে ঢুকিয়ে দেয়ার সঙ্গে সঙ্গে। জিএম তার মক্কেলদের সন্তুষ্ট দেখতে চায়, সেজন্যে আপনার জন্যে অতিরিক্ত আয়োজন করা হচ্ছে, আপনি যাতে নিরাপদে দেশে ফিরতে পারেন··· দুঃখিত, ইজরায়েল বোধহয় আপনার দেশ নয়–'

'কে বলল ইজরায়েল আমার দেশ নয়? আমি একজন কনভার্টেড ইহুদি, ত্রিশ বছর হলো ইজরায়েলের নাগরিকও।'

'দুঃখিত। সে যাই হোক, আমরাও চাই আপনি নিরাপদে তেল আবিবে পৌঁছান। কারণ ওখানে আপনি না পৌঁছালে তো বাকি অর্ধেক টাকা আমরা পাব না।'

'আমাকে নিয়ে অনেক কথা হয়েছে। এবার আপনাকে দু'একটা প্রশ্ন করি। আপনার দেশ যদি ব্রিটেন হয়, ওখানে তো আর এ জীবনে আপনাকে ফিরতে হচ্ছে না। যাবেনটা কোথায়? দেড়শো মিলিয়ন মার্কিন ডলার থেকে কমিশন জুটল কত?'

'আপনার বসেরা জানেন আমার দেশ জিম্বাবুয়ে। ওখানে ফিরে লুকিয়ে থাকা কঠিন নয়, তবে এখনও আমি কোন সিদ্ধান্ত নিইনি। আর, কত টাকা? সে আপনার শুনে কাজ নেই। শুনলে নিজেকে খুব নিকৃষ্ট মনে হতে পারে।'

ঘোঁৎ করে একটা বিরূপ আওয়াজ ছেড়ে চুপ করে গেল তিয়েন চাও।

বেলজিয়াম ছেড়ে ফ্রান্সে ঢুকবার সময় ভেনিনিকে বেশ একটু চিন্তিত দেখাল। চাও নেপালে পৌঁছানোর পর শুরু হবে প্ল্যানের দ্বিতীয় পর্ব। এই দ্বিতীয় পর্বে তার কোন ভূমিকা নেই, তবে প্ল্যানটা তৈরিতে সে সাহায্য করেছে। তার দায়িত্ব শেষ হয়ে যাবে চাওকে চার্লস দ্য গল এয়ারপোর্টে পৌঁছে দেওয়ার পর।

এতটা উদ্বিগ্ন সে হত না, হতে বাধ্য করছে ওই শালা এসপিওনাজ এজেন্টটা। কি যেন নাম? রানা? হ্যাঁ—মাসুদ রানা। ওটা একটা বিপদ, পিছু ছাড়বে বলে মনে হচ্ছে না।

*

লিৎসার অফিসে বসে কমপিউটার ব্যবহার করছে রানা। লিৎসার স্পেয়ার ল্যাপটপও ওটার পাশে সেট করা হয়েছে, দু'জনেই যাতে একসঙ্গে কাজ করতে পারে। রানার পাসওয়ার্ড ব্যবহার করে ইন্টারপোলের ডাটাবেসে ঢুকে পড়েছে ওরা। তিন ঘণ্টা ধরে অসংখ্য চীনা মুখ স্ক্রিনে আসছে আর যাচ্ছে, এখনও সেগুলোর কোনটার সঙ্গে তিয়েন চাও-এর চেহারা মিলছে না।

'এদের বয়স কম,' বলল রানা। 'কাজটা সংক্ষেপ করার কোন উপায় তোমার জানা আছে?'

'আপনি অ্যাকটিভ চীনা এজেন্ট সম্পর্কে জানতে চাইছেন, তাদের বয়স তো কম হবারই কথা।'

'সেক্ষেত্রে ইনঅ্যাকটিভ চাইনিজ এজেন্ট খুঁজি এসো। লোকটার বয়স পঞ্চাশের কম নয়। হয়তো রিটায়ার্ড।'

বোতামে চাপ দিয়ে কমপিউটারকে নতুন নির্দেশ দিল লিৎসা। স্ক্রিনে বয়স্ক চীনাদের চেহারা দেখা যাচ্ছে এখন।

'আমি এ থেকে এম পর্যন্ত দেখি,' বলল রানা, 'তুমি এন থেকে জেড পর্যন্ত।'

এভাবে আরও এক ঘণ্টা কাজ করল ওরা।

'তবু রক্ষে যে ইন অ্যাকটিভ এজেন্টদের সংখ্যা বেশি নয়,' বলল লিৎসা।

তার কথা রানা শুনতে পায়নি। কারণ ওর স্ক্রিনে এ-মুহূর্তে এক বয়স্ক চীনার চেহারা ফুটেছে, দেখে চেনা-চেনা লাগছে। লোকটার নাম চাও ইয়াংচু, সাবেক তাইওয়ানিজ সিক্রেট পুলিশ। উনিশশো নব্বুই সালে হার্টের অসুখ দেখা দেওয়ায়

অবসর নেয়।

'এই চাও ইয়াংচু-ই আমাদের তিয়েন চাও,' বিড়বিড় করল রানা।

'বলেন কী!'

ছবিটা বিশ বছরের পুরানো, তাই রানা তার যে চেহারা মনে রেখেছে তারচেয়ে অনেক কম বয়েসী দেখাচ্ছে তাকে। 'ডিটেইলস্' বাটনে চাপ দিতে লোকটা সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য আসতে শুরু করল।

সিক্রেট পুলিশের সদস্য হিসাবে চাও ইয়াংচু ওরফে তিয়েন চাও-এর কাজ ছিল মেইনল্যান্ড থেকে স্পাই হিসাবে আসা মাও ভক্তদের খুঁজে বের করে গলা কাটা আর রাজধানী তাইপেতে কাউকে কমিউনিস্ট বলে সন্দেহ হলে তাকে ধরে এনে ইন্টারোগেশনের নামে নির্যাতন করে মেরে ফেলা। তার নৃশংস অপরাধের তালিকা এত বড় যে পড়বার ধৈর্য হলো না রানার। ও হোঁচট খেল উনিশশো পঁচানব্বুই সালে কী ঘটেছে দেখতে গিয়ে। এ-বছর চাও নিজের জীবনে প্রায় একটা বিপ্লব ঘটিয়ে বসে–আন্ডারকভার এজেন্ট হিসাবে মোসাদে যোগ দেয়। পরবর্তী কয়েক বছর মোসাদের গুপ্তচর হিসাবে মধ্য প্রাচ্যের বেশ কয়েকটা দেশে কাজ করে সে। পরে আমেরিকা আর ইউরোপে তাকে নিয়মিত দেখা গেছে।

'ব্রিটেনের পিঠে ছুরি মারল ইজরায়েল?' বিস্মিত লিৎসার কণ্ঠে অবিশ্বাস। 'এটা কীভাবে সম্ভব?'

'যে যার স্বার্থ রক্ষা করবার জন্যে সব পারে ওরা,' বলল রানা। 'আমেরিকা চাইলে গুরুত্বপূর্ণ নতুন কোন আবিষ্কার ব্রিটেন দেবে? কিংবা উল্টোটা–ব্রিটেন চাইলে আমেরিকা?' মাথা নাড়ল ও। 'অসম্ভব! সেক্ষেত্রে যে চেয়েও পেল না সে কি চুপ করে বসে থাকবে? এ-ও অসম্ভব। যেমন করে হোক, পরিচয় গোপন করে বা তৃতীয় কোন পক্ষের মাধ্যমে, জিনিসটা পাওয়ার চেষ্টা করা হবে।'

'আপনার ধারণা এখানেও ঠিক তাই ঘটেছে, মিস্টার রানা?' জানতে চাইল লিৎসা।

'প্রায় তাই,' বলল রানা। 'তবে, তুমি যে বললে ব্রিটেনের পিঠে ইজরায়েল ছুরি মেরেছে, ব্যাপারটা তা নয়। কারণ ফর্মুলা বা আবিষ্কারটাই তো ব্রিটেনের নয়।'

'তারমানে–'

'তারমানে এটা চোরেদের প্রতিযোগিতা, লিৎসা,' বলল রানা। 'বাংলাদেশের জিনিস কেড়ে নিতে চাইছে ওরা। শুধু যে চক্ষুলজ্জার খাতিরে প্রকাশ্যে প্রতিযোগিতা করছে না, এটা ভাবা ঠিক নয়; জিনিসটা পেতে হলে পরস্পরকে খুন করতেও হতে পারে।'

'এখন তা হলে–'

'ইন্টারপোলকে এখনি সতর্ক করে দিচ্ছি আমি,' বলল রানা। 'ওরা দুনিয়ার সমস্ত ইমিগ্রেশন ডেস্কে তার ফটো পাঠিয়ে সতর্ক করে দেবে।'

চাও ইয়াংচু ওরফে তিয়েন চাও দিল্লি ফ্লাইট ধরবার জন্য কাস্টমস্ আর ইমিগ্রেশন পার হচ্ছে এই সময় ওয়েস্টার্ন এয়ারপোর্টগুলোয় তার ফটো পৌঁছাল। তবে,

ফটোটা চার্লস দ্য গল এয়ারপোর্টে সময় মত পৌঁছালেও সে ধরা পড়ত কি না সন্দেহ। ফটোর সঙ্গে পাঠানো বিভিন্ন তথ্যে ইন্টারপোল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রসঙ্গটাই উল্লেখ করেনি। আর তা হলো–তিয়েন চাও-এর এই ছবি অন্তত বিশ বছরের পুরানো।

ইন্টারপোল ছবি পাঠিয়ে কোন সুফল না পাওয়ায় বুদ্ধি করে বেলজিয়াম আর প্রতিবেশী দেশগুলোর এয়ারপোর্টের সঙ্গে যোগাযোগ করে সমস্ত ফ্লাইটের প্যাসেঞ্জোর লিস্ট চাইল। কাকতালীয়ভাবে রানা এজেন্সির বিভিন্ন শাখার এজেন্টরাও তাদের বসের নির্দেশে একই কাজ শুরু করেছে। এভাবে জানা গেল তিয়েন চাও দিল্লি যাচ্ছে। রানা এজেন্সি থেকে খবরটা পৌঁছে গেল বিসিআই হেডকোয়ার্টার ঢাকায়, আর ইন্টারপোল-এর কাছ থেকে খবর চলে গেল বিএসএস চীফ মার্ভিন লংফেলোর কাছে।

একা শুধু তিয়েন চাও-এর নয়, তার সঙ্গে হিউগো ভেনিনির ফটোও ইউরোপের সমস্ত আন্তর্জাতিক এয়ারপোর্টে পৌঁছে গেছে।

কিন্তু তাকেও কেউ ধরতে পারল না।

ভেনিনি ব্রিটিশ পাসপোর্ট ব্যবহার করল, এটা সে ক'মাস আগেই সংগ্রহ করে রেখেছে। পাসপোর্টের ফটোয় তার বয়স দশ বছর বেশি মনে হবে, চুল বেশির ভাগই পাকা, চোখের নীচে কালির দাগ, কপালের পাশে জড়ুল। অর্থাৎ এই ফটো তোলার সময় সে এভাবেই ছদ্মবেশ নিয়েছিল। আবারও সেই একই ছদ্মবেশ নিয়ে এয়ারপোর্টে হাজির হলো ভেনিনি। ইমিগ্রেশন অফিসার কোন সন্দেহই করল না, শুধু টিকিটটা দেখতে চাইল। তারপর বলল, 'মরক্কোয়? খুব গরমের মধ্যে পড়বেন।'

'হ্যাঁ, কিন্তু আমার অ্যাজমার জন্যে ভাল,' জবাব দিল ভেনিনি।

কঠিন পরীক্ষাটা অনায়াসে পার হয়ে গেল সে।

আট

লুফথানসা-র দিল্লি ফ্লাইট ভারতের আকাশ সীমায় পৌঁছানোর পর থেকেই ভাগ্য ছিনিমিনি খেলতে শুরু করল তিয়েন চাওকে নিয়ে। কন্ট্রোল টাওয়ার পাইলটকে সাবধান করে দিয়ে বলল, গোপন সূত্রে এয়ারপোর্ট সিকিউরিটি জানতে পেরেছে যে স্বাধীনতাকামী কাশ্মীরী জঙ্গিরা দিল্লি বিমানবন্দরের কয়েক জায়গায় বোমা ফিট করে রেখেছে, সেগুলো যে-কোন সময় ফাটানো হতে পারে। কাজেই, আপাতত কর্তৃপক্ষ বিমানবন্দর বন্ধ করে দিয়েছে। সংশ্লিষ্ট প্লেনগুলোকে অনুরোধ করা হচ্ছে, ওগুলো যেন আশপাশের কোন বিমানবন্দর বা পরবর্তী গন্তব্যের দিকে চলে যায়।

দিল্লি এয়ারপোর্টে রানা এজেন্সির একজন স্থানীয় এজেন্ট, তমিস্রা গুপ্ত,

কাস্টমস্ অফিসারদের অফিসে বসে লুফথানসার দিল্লি ফ্লাইটের জন্য অপেক্ষা করছিল। অফিসারদের যা বলার বলেছে সে, অফিসাররাও ইন্টারপোলের সঙ্গে যোগাযোগ করে তার বক্তব্যের সত্যতা যাচাই করে নিয়েছেন; এখন শুধু প্লেন থেকে তিয়েন চাও নামলেই হয়, কাপড়চোপড় খুলে সার্চ করা কাকে বলে দেখিয়ে দেওয়া হবে।

অফিসাররা আর তমিস্রাকে জানাল না যে তাদের অন্য এক অফিসে ব্রিটিশ সিক্রেট সার্ভিসের একজন এজেন্ট বসে আছে, সে-ও চায় তিয়েন চাওকে সার্চ করা হোক। অফিসাররা জানে সার্চ করে যাই পাওয়া যাক, সেটার মালিকানা নিয়ে বিরাট একটা গোলযোগ বাধবার আশঙ্কা আছে। অবশ্য বেআইনী জিনিস সীজ করবার অধিকার থেকে কেউই ভারতীয় কাস্টমসকে বঞ্চিত করতে পারবে না।

তারপর বিনা মেঘে বজ্রপাতের মত খবর ছড়িয়ে পড়ল এয়ারপোর্টে বোমা আছে। প্রথম এক ঘণ্টা চরম দ্বন্দ্বের মধ্যে কাটল তমিস্রার। আগে বোমা ফাটবে, না লুফথানসার ফ্লাইট এসে পৌঁছাবে?

প্রায় দেড় ঘণ্টা পর তমিস্রা জানতে পারল, লুফথানসার দিল্লি ফ্লাইটকে কাঠমাণ্ডুতে চলে যেতে বলা হয়েছে। অমনি সে ছুটল রানা এজেন্সির কাঠমাণ্ডু শাখার প্রধান অনন্ত মিশ্রকে ফোন করতে।

কাঠমাণ্ডু। বেলা সাড়ে বারোটা।

নেপালি পুলিশের নীল একটা টাটা জীপে বসে রয়েছে অনন্ত মিশ্র। রাস্তার ওপারে বিখ্যাত হোটেল এভারেস্ট। শহরের কোলাহল থেকে খানিক দূরে বানেশ্বর এলাকা এটা, রাস্তাটার নাম রিঙ রোড। আগে ছিল এভারেস্ট শেরাটন, নাম বদলের পরও মান ও সুনাম অক্ষুণ্ন আছে হোটেলটার—বার, রেস্তোরাঁ, স্পোর্টস ফ্যাসিলিটি, ডিস্কো, ক্যাসিনো—সবই আগের চেয়েও ভাল ব্যবসা করছে।

অনন্ত মিশ্রের বাঁয়ে বসে একজন সার্জেন্ট ওয়াকি-টকিতে কথা বলছে। তার নেতৃত্বে একদল পুলিশ হোটেলে ঢুকবার জন্য প্রস্তুত হয়ে আছে। আগেই তাদেরকে বুঝিয়ে বলা হয়েছে কী করতে হবে। হোটেলের একটা কামরায় ঢুকে তিয়েন চাও নামে এক চীনা লোককে এসপিওনাজের অভিযোগে অ্যারেস্ট করতে হবে। খুব তাড়াহুড়ো করে বাংলাদেশ আর নেপালের কূটনীতিকরা একটা চুক্তিতে এসেছেন: রানা এজেন্সির প্রতিনিধি হিসাবে তিয়েন চাও-এর অ্যারেস্ট চাক্ষুষ করবে অনন্ত মিশ্র। জেলখানায় তার সঙ্গে কথা বলতে পারবেন বাংলাদেশ দূতাবাসের কর্মকর্তারা, তারপর রানা এজেন্সির চীফ মাসুদ রানা কাঠমাণ্ডুতে এসে পৌঁছালে ওর হাতে বন্দিকে তুলে দিতে তাদের কোনও আপত্তি থাকবে না।

শীতাতপনিয়ন্ত্রিত কামরার নরম বিছানায় শুয়ে রয়েছে তিয়েন চাও। কাল রাত থেকে নরক যন্ত্রণা ভোগ করছে সে। স্টমাক ক্র্যাম্প যেন লোহার সাঁড়াশি দিয়ে ধরে পেটটাকে বিরতিহীন পিষছে। বয়স বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে হার্টের সমস্যাও প্রবল হয়ে ওঠায় এতদিন দীর্ঘ ভ্রমণ এড়িয়ে থেকেছে সে। কিন্তু এবারের অ্যাসাইনমেন্টটা এত গুরুত্বপূর্ণ যে সবদিক ভাল করে চিন্তা না করেই দায়িত্ব নিতে রাজি হয়ে যায়। অ্যাসাইনমেন্ট যত গুরুত্বপূর্ণ হবে, টাকার অঙ্কও সেই

পরিমাণে বাড়বে। মোসাদের সঙ্গে কন্ট্র্যাক্টে কাজ করে সে। এই টাকার লোভই তাকে পেয়ে বসেছিল।

চাও ইয়াংচু ওরফে তিয়েন চাও কাঠমাণ্ডুতে এসেছে প্রায় চব্বিশ ঘণ্টা হতে চলল, কিন্তু খুব কমই ঘুমিয়েছে সে। সময়ের রদবদলের সঙ্গে তার শরীর এখনও অভ্যস্ত হতে পারছে না। এই তো মাত্র ক'দিন আগে বেলজিয়ামে বড় একটা অপারেশন হয়েছে তার। শরীর খুবই ক্লান্ত, অথচ ঘুম আসছে না। এর জন্য শুধু যে ক্র্যাম্প-এর ব্যথা দায়ী। তা নয়।

চাও জানে না নেপালে কে বা কারা তার সঙ্গে যোগাযোগ করবে। জানে না কোন পথে তাইওয়ান আর শ্রীলঙ্কা হয়ে তেল আবিবে নিয়ে যাওয়া হবে তাকে। শুধু তৈরি হয়ে থাকতে বলা হয়েছে; মুহূর্তের নোটিসে বেরিয়ে পড়তে হতে পারে। এর মানে হলো, হোটেল ছেড়ে কোথাও সে যেতে পারবে না।

তন্দ্রা মত আসায় চোখ দুটো শুধু বুজেছে, দরজায় খুব জোরে ন[illegible] হলো। গুঙিয়ে উঠে বিছানা থেকে নামল সে। দরজা খুলতেই ষণ্ডামার্কা তিনজন নেপালি হুড়মুড় করে ঢুকে পড়ল ভিতরে।

'শ্-শ্-শ!' ঠোঁটে আঙুল রাখল একজন।

তিনজনই বেঁটে আর শক্ত-সমর্থ, একজনের চওড়া আর কালো গোঁফ রয়েছে। হাবভাব দেখে বোঝা গেল সেই ওদের লিডার। জানালার পাশে এসে পর্দা সামান্য একটু সরিয়ে বাইরেটা দেখল সে, তারপর ইঙ্গিতে চাওকেও দেখতে বলল।

নীচের রাস্তায় নীল জীপ আর দু'জন লোককে দেখা যাচ্ছে। একজনের পরনে পুলিশের ইউনিফর্ম। অপর লোকটা সিভিল ড্রেসে।

'পুলিশ?' জিজ্ঞেস করল চাও।

লিডার মাথা ঝাঁকাল। 'এখনি আপনাকে আমাদের সঙ্গে বেরুতে হবে,' ভাঙা-ভাঙা ইংরেজিতে বলল সে। 'আমরা আপনাকে নেপালের বাইরে বের করে দেব।'

'ঠিক আছে,' বলল চাও। 'আমাকে শুধু একটা ব্যাগ–'

'না। সময় নেই।' সঙ্গীদের উদ্দেশে নেপালি ভাষায় দ্রুত কয়েকটা কথা বলল লোকটা। কর্তাদের একজন দরজা খুলে হল-ওয়েটা দেখল। হাত ঝাঁকিয়ে জানাল, কেউ কোথাও নেই।

লোকগুলো চাওকে কামরা থেকে বের করে আনল। তাকে ফায়ার ইস্কেপ-এর দিকে নিয়ে যাচ্ছে তারা। চাও হাঁটতে পারছে না, রীতিমত একটা বোঝা হয়ে দাঁড়াল। দু'জন লোক চার হাত এক করে একটা আসন তৈরি করল, তাতে চাওকে তুলে সিঁড়ি বেয়ে নেমে গেল তরতর করে।

নেপালি পুলিশরা হোটেলে ঢুকল, তারপর লিফটে চড়ে চাও-এর ফ্লোরে পৌঁছাল। ঠিক সেই মুহূর্তে গ্রাউন্ড ফ্লোরে পা রাখল চাও-এর দুই বাহন। হোটেল এভারেস্টে অনেকগুলো রেস্তোরাঁ রয়েছে, সেগুলোর একটায় ঢুকে পথ করে নিল তারা।

রেস্তোরাঁর ভিতর এই সময় প্রচুর বিদেশী ট্যুরিস্ট রয়েছে। একজন চীনাকে

এভাবে বয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে দেখে অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকল তারা। চাওকে নিয়ে নেপালি ষণ্ডারা কিচেনে ঢুকল। এখানে একজন শেফ-এর সঙ্গে নিচুস্বরে কথা বলল লিডার। শেফ একটা বড়সড় চটের ব্যাগ এনে দিল তাকে। এ-ধরনের ব্যাগ সাধারণত আলু ভরবার জন্য ব্যবহার করা হয়।

'এটা পরে ফেলুন,' বলল লিডার।

'হোয়াট!'

সময় নষ্ট না করে চাও-এর মাথায় ব্যাগটা গলিয়ে দেওয়া হলো। চাও প্রতিবাদ করলেও, হিন্দিতে ধমক মেরে তাকে চুপ করিয়ে দিল লিডার। 'চুপ রাহিয়ে! কোঈ আওয়াজ নেহি মাঙতা!'

ভাষা না বুঝলেও, পরিস্থিতি বুঝতে চাও-এর অসুবিধে হলো না। অপমানটা নীরবে সহ্য করল সে। চটের ব্যাগ পুরোপুরি ঢেকে ফেলেছে তাকে। আকারে ছোটখাট আর হালকা হওয়ায় আলুর বস্তার মত করে এক লোক তাকে কাঁধে তুলে নিল।

বোঝা নিয়ে গলিতে বেরিয়ে এল লোকটা। সঙ্গীরা ঠিক পিছনেই রয়েছে। সামনেই আলুর বস্তাভর্তি একটা পিকআপ ট্রাক দাঁড়িয়ে রয়েছে, চাওকে বস্তার উপর ফেলা হলো। ব্যথা পেয়ে গুঙিয়ে উঠল চাও।

'চুপ করেন!' আবার ধমকাল লিডার। 'আপনি এখন ট্রাকে। আমরা আপনাকে এয়ারপোর্টে নিয়ে যাচ্ছি।'

আর্নিকো রাজমার্গ থেকে রওনা হলো ট্রাক। গন্তব্য কাঠমাণ্ডু এয়ারপোর্ট।

অনন্ত মিশ্র আলুর ট্রাকটাকে হোটেলের পিছন থেকে বেরিয়ে দক্ষিণ-পুবদিকে যেতে দেখল। এই এলাকায় অনেকগুলো হোটেল, এরকম আলুর বস্তা ভর্তি ট্রাক এদিকে হামেশাই দেখা যায়, কাজেই তার মনে কোন সন্দেহ জাগল না। সে তার দৃষ্টি হোটেল এভারেস্টের সামনে ফিরিয়ে আনল, অপেক্ষা করছে পুলিশ ফিরে এসে কী সংবাদ দেয় শুনবার জন্য।

একটু পরই ওয়াকি-টকিতে রিপোর্ট পেল পুলিশ সার্জেন্ট—তিয়েন চাও তার কামরায় নেই; জিনিস-পত্র না নিয়ে, দরজা খোলা রেখে, পালিয়ে গেছে। জীপ থেকে নেমে ছুটল সার্জেন্ট। তার পিছু নিয়ে অনন্ত মিশ্রও হোটেলে ঢুকল। হোটেলের বয়-বেয়ারা আর শেফদের জেরা করে জানা গেল, রেস্তোরাঁর ভিতর দিয়ে তিনজন নেপালি একজন চীনাকে বের করে নিয়ে গেছে।

সার্জেন্ট চাও-এর ফটো দেখাতে একজন শেফ তাকে চিনতেও পারল, জানাল তার সঙ্গী এক শেফ নেপালি তিনজনের একজনের কাছে একটা খালি বস্তাও বেচেছে। সেই বস্তার ভিতরই লুকিয়ে চীনাটাকে তোলা হয়েছে আলুর ট্রাকে।

'আলুর ট্রাক!' চেঁচিয়ে উঠল অনন্ত মিশ্র। 'এই তো একটু আগেই দেখলাম হোটেল থেকে রওনা হলো ট্রাকটা। ওটা এয়ারপোর্টের দিকে গেছে! চলুন!'

হোটেল থেকে বেরিয়ে এসে জীপে চড়ল সার্জেন্ট আর অনন্ত মিশ্র। জীপ ছুটল।

ত্রিভুবন ইন্টারন্যাশন্যাল এয়ারপোর্ট কাঠমাণ্ডু থেকে চার কিলোমিটার দক্ষিণ-পুবে। উনিশশো উননব্বুই সালে তৈরি, প্রতি ঘণ্টায় এক হাজার আরোহীকে

সামলাতে হয়। অনেক প্রাইভেট ট্যুরিস্ট এজেন্সি চার্টার সার্ভিসও দিয়ে থাকে।

আলুর ট্রাক তীরবেগে এয়ারপোর্টের দিকে ছুটে চলেছে। রাস্তার প্রতিটি খানা-খন্দে ঝাঁকি খাচ্ছে ট্রাক, তার সঙ্গে আলুর বস্তা, বস্তার সঙ্গে তিয়েন চাও-ও। তার প্রাণ এককথায় যাকে বলে ওষ্ঠাগত।

মেইন টার্মিন্যালকে পাশ কাটিয়ে প্রাইভেট হ্যাঙ্গারগুলোর দিকে ছুটে গেল পিকআপ ট্রাকটা।

ওদিকে একটা সাইট-সীইং অপারেশনের প্রস্তুতি পর্ব শেষ হতে চলেছে। কোম্পানির নাম ব্লু ফ্লাইটস্, ব্রিটিশদের দ্বারা পরিচালিত। জোড়া প্রপেলার বিশিষ্ট একটা প্লেন পাঠাচ্ছে ওরা, ব্রিটিশ আর আমেরিকান প্যাসেঞ্জার নিয়ে হিমালয়ের চারদিকে ঘুরে আসবে।

প্যাসেঞ্জাররা লাইন দিয়েছে প্লেনে উঠবার জন্য, তাদেরকে পাশ কাটিয়ে ছুটল ট্রাক। সামনের অন্য একটা হ্যাঙ্গারের দিকে যাচ্ছে ওটা। ওদিকে আরেকটা প্লেন দেখা যাচ্ছে। এটা সিঙ্গেল-প্রপ প্লেন, ফুয়েল ভরা শেষ হয়েছে, পাইলটও উঠে পড়েছে ককপিটে।

কর্কশ আওয়াজ তুলে দাঁড়িয়ে পড়ল ট্রাক। ঝপাঝপ লাফ দিয়ে নীচে নামল নেপালি তিনজন। চটের ব্যাগটা চীনা মক্কেলের শরীর থেকে খুলে নেওয়া হলো।

'এই শালারা! গোবরখেকো! কুত্তার গু!' নিজের ভাষায় অনর্গল গালিগালাজ শুরু করল চাও। তারপর খেঁকিয়ে উঠে বলল, 'জানিস, ওরকম ঝাঁকিতে আমার বুক খুলে যেতে পারত?'

'গেলে টেপ লাগিয়ে দিতাম,' বলল লিডার। 'এখন চুপ যান, আর নিজের ভাল চাইলে সোজা প্লেনে উঠে পড়ুন। যে-ভাবে বলি সে-ভাবে কাজ করুন, তা না হলে অ্যারেস্ট হয়ে যাবেন। পুলিশ আমাদের ঠিক পিছনেই রয়েছে।'

গজ গজ করতে করতে প্লেনের দিকে এগোল চাও। 'এটা কি নিরাপদ?' জানতে চাইল সে।

চাও-এর পিছনে রয়েছে লিডার। নিজের দুই সঙ্গীর দিকে তাকিয়ে ইঙ্গিত করল সে। এই ইঙ্গিত পাওয়ার জন্যই অপেক্ষা করছিল তারা।

ইতোমধ্যে ফুল স্পিডে ছুটে এসে এয়ারপোর্টে ঢুকে পড়েছে পুলিশের জীপ। এয়ারপোর্ট সিকিউরিটির সঙ্গে যোগাযোগ করল সার্জেন্ট, তাকে জানানো হলো আলুর বস্তা ভর্তি একটা ট্রাককে প্রাইভেট হ্যাঙ্গারগুলোর দিকে যেতে দেখা গেছে। নির্দেশ পেয়ে টার্মিন্যাল ভবনকে পাশ কাটিয়ে সেদিকে ছুটল জীপের ড্রাইভার।

ব্লু ফ্লাইটস-এর প্লেনটাকেও পাশ কাটিয়ে গেল জীপ। তারপর দেখতে পেল সিঙ্গেল ইঞ্জিনড্ ফোর-ম্যান একটা প্লেন রানওয়েতে পজিশন নেওয়ার জন্য রওনা হয়েছে।

'ওই প্লেনটাকে থামান!' অনন্ত মিশ্র চেঁচিয়ে উঠল।

জীপ ছুটে প্লেনের সামনে চলে এল। তিনজন পুলিশ লাফ দিয়ে নীচে নেমে ককপিটের দিকে ৭.৬২ এমএম সেলফ-লোডিং রাইফেল তাক করল। ছোঁ দিয়ে একটা বুলহর্ন তুলে নিয়ে পাইলটকে থামবার নির্দেশ দিল সার্জেন্ট।

প্লেন ধীরে ধীরে দাঁড়িয়ে পড়ল। জীপ থেকে নেমে প্লেনের পাশে চলে এল

অনন্ত মিশ্র। দরজা খুলে যেতেই লাফ দিয়ে ধাপে উঠে কেবিনের ভিতর মাথা গলাল সে।

কেবিন সম্পূর্ণ খালি।

হতভম্ব হয়ে পাইলটের দিকে ফিরল মিশ্র, জিজ্ঞেস করল তার চীনা প্যাসেঞ্জার কোথায়। পাইলট এমন ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল, যেন তার কথা সে বুঝতে পারছে না। দেরি না করে শোল্ডার হোলস্টার থেকে একটা ব্রাউনিং হাই-পাওয়ারড নাইনএমএম হ্যান্ডগান বের করল। এই একই অস্ত্র নেপালি পুলিশও ব্যবহার করে।

'সে কোথায় তাড়াতাড়ি বলো, তা না হলে তোমার মগজ লেগে উইন্ডস্ক্রিনটা নোংরা হয়ে যাবে।'

মস্ত এক ঢোক গিলে প্রায় দুশো গজ দূরের একটা হ্যাঙ্গার দেখাল পাইলট। ওটা ট্যুরিস্ট কোম্পানির আউটফিট।

প্লেন থেকে লাফ দিয়ে নীচে নেমে চিৎকার করে পুলিশদের জীপে চড়তে বলছে মিশ্র। 'চাও ওদিকে!' জোড়া প্রপ বিশিষ্ট প্লেনটার দিকে আঙুল তাক করল সে। এইমাত্র হ্যাঙ্গার ছেড়ে বেরিয়ে আসছে সেটা।

প্লেনটার দু'পাশে ব্লু ফ্লাইটস্ লেখা রয়েছে। রানওয়েতে পৌঁছে স্পিড বাড়িয়ে দিয়েছে পাইলট। তার পিছু নিয়ে ছুটছে জীপ। মুখের সামনে বুলহর্ন তুলে নির্দেশ দিয়ে যাচ্ছে সার্জেন্ট। কিন্তু পাইলটের মধ্যে থামবার কোন লক্ষণ নেই। কন্ট্রোল টাওয়ারের সঙ্গে যোগাযোগ করল সার্জেন্ট, নির্দেশ দিল, যেমন করেই হোক টেকঅফ ঠেকাও। উত্তরে তাকে বলা হলো, পাইলট কোন সাড়া দিচ্ছে না।

তারা যদি দেখতে পেত ককপিটের ভিতর কী ঘটছে, তা হলে আর বুঝতে অসুবিধে হত না পাইলট কেন সাড়া দেয়নি। সেই তিন নেপালির মধ্যে লিডার লোকটা পাইলটের মাথায় একটা পিস্তল ধরে আছে।

'কোনও রকম চালাকি না করে রানওয়ে ছেড়ে আকাশে ওঠো,' হুকুম দিল সে।

বাকি দু'জন হাইজ্যাকার সন্ত্রস্ত যাত্রীদের দিকে পিস্তল তাক করে রেখেছে। সবাই তারা ব্রিটিশ অথবা আমেরিকান, নারী ও পুরুষ মিলিয়ে এগারোজন, প্রত্যেকে প্রাপ্তবয়স্ক। তাদের সঙ্গেই বসে রয়েছে তিয়েন চাও একটা জানালার ধারে। তার কোন ধারণা নেই আসলে কী ঘটছে। এটা কী জিএম-এর প্ল্যান? একটা ট্যুরিস্ট প্লেন হাইজ্যাক করা? এই প্লেনে করে তাকে ওরা কোথায় পৌঁছে দেবে? এরকম একটা ট্যুরিস্ট প্লেন তাইওয়ানে যাবে কীভাবে?

প্লেনের স্পিড অনেক বেড়ে গেছে, একটু পরই রানওয়ে ছেড়ে শূন্যে উঠে পড়বে, তাসত্ত্বেও ড্রাইভারকে জীপের স্পিড বাড়াতে বলল মিশ্র। 'আপনারা গুলি করছেন না কেন?' তার কণ্ঠস্বর থেকে ক্ষোভ ঝরে পড়ল।

একজন কনেস্টবল তার এসএলআর তাক করে ফায়ার করল। প্লেনের লেজে লেগে পি-ই-ই-ই-ং করে শব্দ তুলল একটা বুলেট। লেজের ক্ষতি হলো, কিন্তু প্লেনের স্পিড তাতে কমল না।

আকাশে উঠল প্লেন। টার্মিন্যালের উপর দিয়ে উড়ে যাচ্ছে।

মাথায় হাত দিয়ে বসে থাকল মিশ্র। দশ সেকেন্ড পর্যন্ত গুণে সার্জেন্টের দিকে ফিরল সে। 'কন্ট্রোল টাওয়ারকে লক্ষ রাখতে বলুন প্লেনটা কোনদিকে যায়।'

প্লেনের ভিতর আরোহীরা অস্থির, আতঙ্কিত হয়ে উঠছে। সশস্ত্র নেপালিদের একজন চোখ গরম করে তাদেরকে চুপচাপ বসে থাকবার নির্দেশ দিল।

বর তার অপর সঙ্গীকে বলল, পাইলটের মাথায় অস্ত্র ঠেকিয়ে রাখো। তারপর আরোহী ভর্তি ছোট্ট কেবিনে চলে এল সে।

'প্লিজ সবাই শান্ত থাকুন,' বলল সে। 'মাউন্ট এভারেস্ট দেখতে যাবার কথা ছিল আপনাদের, কিন্তু প্লেন ঠিক সেদিকে যাচ্ছে না। আমরা একটু ঘুরপথ ধরে দার্জিলিঙে যাচ্ছি। সহযোগিতা করুন, কারও কোন ক্ষতি করা হবে না। কথা দিচ্ছি, কয়েক ঘণ্টার মধ্যে সবাই আপনারা কাঠমাণ্ডুতে ফিরে আসবার সুযোগ পাবেন।'

দার্জিলিঙ? ভাবল চাও। দার্জিলিঙে কেন? ওখানে কী আছে? ওদের না আমাকে তাইওয়ানে নিয়ে যাবার কথা! এটা কী সেখানে নিয়ে যাবার অন্য কোন ঘোরা পথ?

একজন প্যাসেঞ্জার, বয়স হবে পঞ্চাশ, বললেন, 'মাফ করবেন, আমি মার্কিন সিনেটর রেমন মেলোডি, আর ইনি হচ্ছেন আমার স্ত্রী।' আইল-এর ওপাশে বসা দু'জনকে ইঙ্গিতে দেখালেন। 'উনি মিস্টার অসবর্ন, পাশে তাঁর স্ত্রী। ভদ্রলোক ব্রিটিশ পার্লামেন্টের সদস্য। আমি আপনাকে বলতে চাই, আমরা কেউই মিস্টার বুশ এবং মিস্টার ব্লেয়ারের যুদ্ধংদেহী মনোভাব সমর্থন করি না, আফগানিস্তান আর ইরাকের ওপর হামলাকে গুরুতর অন্যায় বলে মনে করি–'

'চুপ করুন, আপনি অযথা প্রলাপ বকছেন,' ধমক দিল হাইজ্যাকারদের লিডার।

'আপনারা যদি আল-কায়েদার সদস্য হন–হাতজোড় করে প্রাণ ভিক্ষা চাইছি। প্লিজ, প্লিজ, প্লিজ–আত্মঘাতী হবেন না!'

'এ বানচোত তো দেখছি পাগল করে ছাড়বে। কত বড় মূর্খ, আমাদেরকে আল কায়েদা বলে!' লিডার সিনেটরের দিকে পিস্তল তাক করল। 'অ্যাই, ব্যাটা! দাড়ি কোথায়? বল্, দাড়ি কোথায় আমাদের?'

প্রবল আতঙ্কে হতবুদ্ধি হয়ে পড়ায় কথাগুলো কানে গেল না সিনেটরের, কিন্তু পিস্তলের ভাষা ঠিকই বুঝলেন; ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলেন তিনি আচমকা। ফোঁপাতে ফোঁপাতে বিড়বিড় করছেন: 'আল-কায়েদা নন শুনে ভারী খুশি হলাম। মিস্টার বুশ একজন হিরো। সাদ্দামটা ইঁদুর–'

লিডারের দিকে তাকিয়ে চাও জানতে চাইল, 'কী ঘটছে বলো তো? ব্যাপারটা যখন আমাকে নিয়ে, আমার জানার অধিকার আছে।'

হাইজ্যাকারদের লিডার হাসল। 'আগে ব্যাখ্যা করতে পারিনি বলে দুঃখিত। আমরা আপনাকে দার্জিলিঙের একটা নিরাপদ জায়গায় পৌঁছে দেব।'

'তারপর?'

লিডারকে নির্লিপ্ত দেখাল। 'তারপর নিজের দায়িত্ব আপনার নিজেকেই বুঝে নিতে হবে।'

'মানে? আমি তো জানি তোমরা আমাকে তাইওয়ানে পৌঁছে দেবে!'

'প্ল্যান বদলেছে,' সংক্ষেপে জবাব দিল লোকটা।

পচনের আভাস পেয়ে হঠাৎ ভারী অসুস্থ বোধ করল চাও। অনুভব করল হার্ট ইতস্তত শুরু করেছে, তবে পেসমেকার থাকায় আবার পুরোদমে চলতে শুরু করল। তারপও প্রবল উৎকণ্ঠায় থাকল সে। কোথাও খুব বড় একটা গোলমাল আছে। এদেরকে তার জিএম-এর লোকজন বলে বিশ্বাস হচ্ছে না।

অভিজ্ঞতা আছে তার, আছে ট্রেনিং, কাউকে কিছু বুঝতে না দিয়ে সিট থেকে হঠাৎ লাফিয়ে উঠে লিডারকে আক্রমণ করল চাও। আইলে দাঁড়িয়ে ধস্তাধস্তি করছে দু'জন, আরোহীরা তারস্বরে চেঁচাচ্ছে। দুর্ঘটনাবশত ব্রাউনিং থেকে একটা বুলেট বেরিয়ে গেল। যে হাইজ্যাকার পাইলটের মাথায় পিস্তল ধরে রেখেছিল, তার গলায় ঢুকল বুলেটটা। লোকটা কাত হয়ে কন্ট্রোলের উপর পড়ে গেল।

প্লেন বিপজ্জনক দোল খাচ্ছে। পাইলট আবার সেটাকে সিধে করে পুব নেপালের দিকে তাক করতে গলদঘর্ম হয়ে গেল।

চাও-এর মুখে ধাঁই করে একটা ঘুসি মারল লিডার। ছিটকে নিজের সিটে পড়ে জ্ঞান হারাল সে। তার পাশের মহিলাকে লিডার বলল, 'শালার সিট বেল্ট বেঁধে দিন।'

ককপিটে ঢুকে নিহত সঙ্গীকে বের করে এনে আইল-এ শুইয়ে দিল লিডার। দ্বিতীয় লোকটাকে আতঙ্কে ফ্যাকাসে দেখাচ্ছে। তার মনের ভাব বুঝতে পেরে লিডার বলল, 'সব প্ল্যান ধরে হবে। একজন কমে যাবার মানে হলো আমাদের দু'জনের ভাগে আরও বেশি টাকা।'

অপর লোকটা এ-কথা ভাবেনি। নিঃশব্দে হেসে মাথা ঝাঁকাল সে।

'প্যাসেঞ্জারদের ওপর নজর রাখো, বিশেষ করে চীনা কুত্তাটার ওপর,' নির্দেশ দিয়ে আবার ককপিটে ঢুকল লিডার।

পাইলট বলল, 'পুব নেপালের ওপর ঝড় শুরু হয়েছে। দেখে ভয়ঙ্কর মনে হচ্ছে। ওদিকে যাওয়া উচিত হবে না আমাদের।'

'কথা কম,' বলল লিডার। 'আমাদের শুধু দার্জিলিঙে পৌঁছে দাও।'

'ওখানে যেতে হলে ঝড়ের ভেতর দিয়ে যেতে হবে। কারণ ঘুরে যাবার মত ফুয়েল নেই। আমাদের কাঠমাণ্ডু ফিরে না গিয়ে উপায় নেই।'

'না! ঝড়ের ভেতর দিয়েই চলো। যা হয় হোক, আমরা ঝুঁকি নেব।'

'আপনি কী পাগল? যে-কোন একটা পাহাড়ে ধাক্কা খেয়ে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাব–'

পাইলটের কপালে পিস্তল ঠেকাল লিডার। 'হয় দার্জিলিঙে নিয়ে চলো, তা না হলে মরো।'

'আ-আমাকে গু-গুলি করলে,' পাইলট তোতলাচ্ছে, 'আপনিও মারা যাবেন।'

'যাই যাব। তুমি চাও এখনি তোমাকে গুলি করে ঝামেলা মিটিয়ে ফেলি?'

এক সেকেন্ড ইতস্তত করে প্লেন পুব দিকে ঘোরাল পাইলট।

আধঘণ্টা পর ঝড়ের তাণ্ডব আঁচ করতে পারল ওরা। প্রচণ্ড বাতাস, শিলাবৃষ্টি আর তুষার ছোট্ট প্লেনটার উপর হামলে পড়ল। বাতাসের আলোড়ন প্লেনটাকে এদিক-ওদিক তাড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে। প্যাসেঞ্জাররা ভয়ে আধমরা। কেউ কেউ গলা

ছেড়ে যীশুকে ডাকছে, বাকিরা প্রিয়জনের হাত ধরে ফোঁপাচ্ছে। দু'একজনকে দেখা গেল পাথর হয়ে গেছে। ব্রিটিশ পার্লামেন্টের সদস্য এক হাতে চোখ ঢেকে বসে আছেন।

ওরা তাপলেজাং-এর উপর চলে আসার পর দৃষ্টিসীমা বলে কিছুর অস্তিত্বই থাকল না। এবার হাইজ্যাকারদের লিডারকেও হতচকিত দেখাল।

'আমরা এখন কোথায়?' জিজ্ঞেস করল সে।

কাঁধ ঝাঁকাল পাইলট। 'পুব নেপালের কোথাও হবে। নেভিগেশন কাজ করছে না। গ্রাউন্ড থেকে তখন আমাদের টেইল-এ গুলি করা হয়েছিল। কিছু একটা ক্ষতি হয়েছে। প্লেন আমি ঠিক মত সামলাতে পারছি না। আমাদের ফিরে যাওয়া উচিত।'

'যেদিকে যাচ্ছি সেদিকেই চালাও।'

হিমালয়ের আশপাশে সহজ সাইট-সীইং ফ্লাইট চালিয়ে অভ্যস্ত পাইলট, অন্যান্য জটিল ক্ষেত্রে তার অভিজ্ঞতা নিতান্তই কম, কাজেই সে জানে না বর্তমান পরিস্থিতি কীভাবে সামলাবে। পথ হারিয়ে দিশেহারা হয়ে পড়ল বেচারা, জানে না কোনদিকটা উত্তর বা কোনদিকটা দক্ষিণ।

প্লেনের উপর তুফানের হামলা আরও প্রবল হলো। এক সময় প্লেনটা এমন গোত্তা খেতে শুরু করল যে পাইলট ভাবল এটাই তাদের মৃত্যুর কারণ হতে যাচ্ছে। কন্ট্রোলের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল সে, কোনরকমে পাগলা ঘোড়া হয়ে ওঠা প্লেনটাকে আবার সাদা নিরেট পাঁচিলের পাশে ফিরিয়ে আনতে পারল। তার জানা নেই প্লেন এখন হিমালয়ের উত্তর-পুবদিকে ছুটছে।

'প্লেন সাড়া দিচ্ছে না!' চেঁচিয়ে উঠল সে। 'পরিষ্কার রিডিং না পেলে বুঝব কিভাবে কোথায় রয়েছি আমরা। ভগবানের দোহাই লাগে, চলুন ফিরে যাই।'

এই প্রথম চুপ করে আছে লিডার, উইন্ডশীল্ড দিয়ে সাদা বিস্তৃতির দিকে তাকিয়ে আছে একদৃষ্টে। তারপর হঠাৎ যখন দেখল দুধ-রঙা পর্দা থেকে বিশাল এক পাহাড়ের চূড়া বেরিয়ে আসছে, তার চোখ দুটো বিস্ফারিত হয়ে গেল।

'লুক আউট!' তার চিৎকারে কান্নার সুর, তবে অনেক দেরি হয়ে গেছে।

পাহাড়ের কিনারায় ঘষা খেল প্লেন, তারপর কাত হয়ে কোন এক অজানার উদ্দেশে খসে পড়তে শুরু করল। ছোট্ট প্লেনটার নিয়ন্ত্রণ ফিরে পাওয়ার জন্য মরিয়া হয়ে চেষ্টা করল পাইলট। স্টিক আগুপিছু করছে উন্মাদের মত। প্রায় অবিশ্বাস্য বা অলৌকিকই বলতে হবে, প্লেনের পতন তো থামলই, আবার ওটা উপর দিকে উঠতেও শুরু করল। একটা মিনিট চরম আতঙ্কে কাটবার পর লেভেলে এল তাদের বাহন।

'কী ধরনের ড্যামেজ হলে এটা ঘটতে পারে?' লিডারকে জিজ্ঞেস করল পাইলট।

উইন্ডশীল্ড দিয়ে বাইরে তাকিয়ে লিডার কিছুই দেখতে পেল না। 'সম্ভবত ধাক্কা খেয়েছে একটা উইং, তবে এখনও তো উড়ছি আমরা,' বলল সে। তারপর লক্ষ করল ডান প্রপেলার এলোমেলো আচরণ করছে। 'ওই প্রপেলারটা–ওটা কি ঠিক আছে?'

কন্ট্রোলের দিকে তাকাল পাইলট। 'না, ওটা আমরা হারাচ্ছি। প্লেন ক্র্যাশ করতে যাচ্ছে। শেষ সুযোগটাও হাতছাড়া হয়ে গেছে, এখন আর কাঠমাণ্ডু ফিরে যাবার কোন উপায় নেই আমাদের।'

'কিন্তু দার্জিলিঙ?'

'ভুলে যান,' বলল পাইলট। 'আমরা এখন হিমালয়ে। ওদিকে কীভাবে যেতে হবে আমি জানি না। প্রাণে বাঁচার চেষ্টা করতে পারি প্লেন ঘুরিয়ে নিয়ে। কিন্তু তারপরও যে কোথাও পৌঁছাতে পারব, এ নিশ্চয়তা দেয়া যায় না।'

এক মিনিট চিন্তা করল লিডার। 'ঠিক আছে। সেই চেষ্টা করো। ঘোরাও প্লেন।'

পাইলট তার সামনে কিছুই এখন দেখতে পাচ্ছে না। নতুন এক সেট নেভিগেশন্যাল কোঅর্ডিনেট-এর বোতামে চাপ দিল সে। কিন্তু কী যেন ঠিক নেই। কন্ট্রোল জবাব দিচ্ছে না।

'নেভিগেশন সম্পূর্ণ বন্ধ,' শান্ত গলায় বলল সে।

'এখন তা হলে কী করব আমরা?' জিজ্ঞেস করল লিডার। তার কর্তৃত্বসুলভ, মেজাজী ভাব পুরোপুরি অদৃশ্য হয়েছে।

'প্রার্থনা।'

উইন্ডশীল্ডে বরফ আর তুষার হামলা চালালেও, তার ভিতর দিয়ে গাঢ় একটা আকৃতিকে কাছে চলে আসতে দেখছে পাইলট আর হাইজ্যাকারদের লিডার। এরকম একটা পরিস্থিতিতে আন্দাজ করাও কঠিন চূড়াটা কত দূরে হতে পারে। তবে ওটা যে একটা দানব তা সহজেই বোঝা যাচ্ছে।

সামনে এরকম একটা আকাশ ঢাকা বাধা থাকলে যে-কোন পাইলটের প্রতিক্রিয়া হবে। আলোচ্য পাইলট আঁতকে উঠে বাধাটাকে এড়াবার জন্য প্লেন ঘুরিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করল। এরই মধ্যে গাঢ় আকৃতি আরও কাছে চলে এসে গোটা আকাশ ঢেকে ফেলেছে।

'ঘোরো! ঘোরো!' গলার রগ ফুলিয়ে চিৎকার জুড়ে দিল লিডার।

'পারছি না!' এটাই ছিল পাইলটের শেষ আক্ষেপ।

পৃথিবীর তৃতীয় বৃহত্তম পর্বতের প্রায় সমতল একটা কারনিসে ধাক্কা খেলো প্লেন, কাঞ্চনজঙ্ঘার চূড়া থেকে খুব একটা নীচে নয়। ডানা দুটো সঙ্গে সঙ্গে ভেঙে চুরমার হয়ে গেল। পাথুরে বরফে বেশ কিছু দূর ঘষটে এগিয়েই আগুন ধরে গেল ফিউজিলাজে। ধাক্কা খেল পাথর আর বরফের একটা পাঁচিলে, দু'বার গড়াল, তারপর সামান্য ঢালু একটা হিমবাহ-র বিস্তৃতির উপর স্থির হলো।

সংঘর্ষ, অসহনীয় শীত আর এরকম হাই অলটিচ্যুডে অক্সিজেনের তীব্র অভাব প্লেনের প্রতিটি আরোহীর জন্য সঙ্গে সঙ্গে মারাত্মক হয়ে দেখা দিল। তবে অবিশ্বাস্য হলেও সত্যি যে তিনজন লোক এখনও বেঁচে আছে, যদিও এই মুহূর্তে তাদের জ্ঞান নেই। তাদের নরকযন্ত্রণা শুরু হবে একটু পর।

নয়

ঢাকা, বিসিআই হেডকোয়ার্টার।

'খুব জরুরী কিছু, রানা–সম্ভবত ইমার্জেন্সী,' বলল ইলোরা, মেজর জেনারেল (অবসরপ্রাপ্ত) রাহাত খানের প্রাইভেট সেক্রেটারি। তার ডেস্কের সামনে দাঁড়িয়ে আছে রানা, দুরু দুরু বুকে অপেক্ষা করছে বসের চেম্বার থেকে কখন ওকে ডাকা হবে।

রানা চিন্তায় পড়ে গেছে। কাল সকালে ঢাকায় পৌঁছেই রিপোর্ট জমা দিয়েছে ও। এত তাড়াতাড়ি হঠাৎ নতুন কী ঘটতে পারে? 'স্কিন-সেভেনটিন সম্পর্কে কোন খবর?' জিজ্ঞেস করল ও।

'হতে পারে। প্রায় সারাটা দিনই প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ে ছিলেন বস্, খানিক আগে ফিরেছেন।

'আমার খুব উত্তেজনা হচ্ছে।'

চেম্বারের দরজায় সবুজ আলো মিটমিট করে উঠল।

'যাও, ঢুকে পড়ো,' বলল ইলোরা, মুখে ছড়িয়ে পড়ল পরিচিত উষ্ণ হাসি।

কালো লেদারে মোড়া রিভলভিং চেয়ারে হেলান দিয়ে বসে ডেস্কে সেট করা মনিটরে সচল কিছু ইমেজ দেখছেন রাহাত খান। তাঁর পাশে দাঁড়িয়ে কিছু ডিটেলস-এর দিকে মনোযোগী হতে বসকে সাহায্য করছে সোহেল। রানার যদি কোন ভুল না হয়, ইমেজগুলো আসলে হিমালয় পর্বতমালার কয়েকটা চূড়ার ফটো।

'বসো, রানা,' না তাকিয়েই রাহাত খান বললেন। তারপর সোহেলের দিকে ফিরলেন। 'আমরা বুঝব কীভাবে ফিউজিলাজের ভেতর লাশগুলো অক্ষত অবস্থায় আছে? আমার তো দেখে মনে হচ্ছে মারাত্মকভাবে পুড়ে গেছে ওটা।'

'জী, সার, কিন্তু পরের ছবিটায় দেখুন–'একটা বোতামে চাপ দিল সোহেল, ছবিটাকে স্ক্রিনে এনে আকারে বড় করল–বিধ্বস্ত একটা প্লেনের মত দেখাচ্ছে। '–পুরোটা ফিউজিলাজ কোথাও ভাঙেনি। আর পোড়া দাগগুলোও দেখুন, শুধু টেইল সেকশনে। তুলনায় সামনের দিকটায় খুব কমই ক্ষত হয়েছে। তবে ডানাগুলো নেই, এটা পরিষ্কার।'

'ওরকম একটা অ্যাক্সিডেন্টের পর ওখানে কেউ বেঁচে থাকতে পারে?' রাহাত খান জিজ্ঞেস করলেন।

'মনে হয় না, সার,' বলল সোহেল। 'কেউ যদি বেঁচেও যায়, এতক্ষণে নিশ্চয়ই মারা গেছে।'

মাথা ঝাঁকালেন রাহাত খান। 'একটা প্রেশারাইজড্ কেবিন থেকে হঠাৎ ছাব্বিশ হাজার ফুট অলটিচ্যুডে বেরিয়ে এলে মৃত্যু খুব তাড়াতাড়ি ঘটবে, এই কথা। এরপর আছে ফ্রিজিং টেমপারেচার –ওরকম ঠাণ্ডা ঠেকাবার কাপড়চোপড় নিশ্চয়ই

কেউ নিয়ে যায়নি। রানা?'

'সার?'

'তুমি তো একজন অভিজ্ঞ মাউন্টিনিয়ার, তাই না?' জানতে চাইলেন রাহাত খান।

ঠিক বুঝতে পারছে না কীভাবে জবাবটা দেবে, রানা বলল, 'জী, মোটামুটি। স্পোর্টস হিসেবে পাহাড়ে চড়তে ভাল লাগে, তবে বেশ কিছুদিন হলো উঠছি না।'

হাতের পেন্সিলটা মনিটরের দিকে তাক করলেন বিসিআই চীফ। 'স্কিন-সেভেনটিন ওখানে আছে, ওই প্লেনটায়। হিমালয়ের সবচেয়ে উঁচু চূড়াগুলোর একটায়।'

রানার ভুরু ঝট করে কপালে উঠে গেল। 'হোয়াট!'

সোহেলের দিকে ফিরে ছোট্ট করে মাথা ঝাঁকানোটাই রাহাত খানের নির্দেশ: রানাকে সব ব্যাখ্যা করো।

সোহেল জানাল, ইন্টারপোল রিপোর্ট করেছে তিয়েন চাও একটা সাইট-সীইং ফ্লাইটে উঠেছিল। কিন্তু লক্ষণ দেখে মনে হয়েছে প্লেনটা হাইজ্যাক করা হয়েছে। তবে হাইজ্যাকারদের আসল গন্তব্য সম্পর্কে কিছু জানা যায়নি। পুবদিকে ঘুরে একটা তুমুল ঝড়ের মধ্যে পড়ে তারা। প্লেনটা বিধ্বস্ত হয়েছে, কাঞ্চনজঙ্ঘার চূড়ার কাছাকাছি কোথাও—নেপালের উত্তর-পুব কোণে, সিকিম সীমান্তের কাছাকাছি। এ-সব তথ্য স্যাটেলাইট ফটো দেখে জানতে পেরেছে ইন্টারপোল।

সোহেল থামতে রাহাত খান বাকিটা ব্যাখ্যা করলেন। নেপাল সরকারের সঙ্গে ফ্যাক্স আর ই-মেইলে আলাপ হয়েছে বাংলাদেশ পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের। বর্ষা মরশুম চলে আসছে, তাই হিমালয়ে চড়বার আরও আবেদন মঞ্জুর করতে হচ্ছে ওদেরকে। কিছু নির্দিষ্ট নীতিমালা আছে, তাই একই সঙ্গে একাধিক অভিযাত্রী দলকে অনুমতি দেওয়া হয় না—মূলত তাদেরই নিরাপত্তার কথা চিন্তা করে। বাংলাদেশের প্রস্তাব বিশেষভাবে বিবেচনা করা হয়েছে, তবে অন্য কয়েকটা গ্রুপের সঙ্গে যোগ দিতে হবে রানাকে।

'অন্য গ্রুপ? কারা, সার?'

'সেটা এখনও ওরা চূড়ান্ত করেনি,' বললেন রাহাত খান। 'তবে তারাও ওই কাঞ্চনজঙ্ঘায় উঠতে চায়।'

'ওদের গন্তব্যও প্লেন নয়তো?'

'তোমার ধরেই নিতে হবে, ওরা সবাই তোমার শত্রু। ওদের কাউকে প্রত্যাখ্যান করতে পারছে না নেপাল সরকার—সবাই নিজ নিজ দেশের নাগরিকদের লাশ উদ্ধার করবে বলছে। আমি ভাবছি, ভালই তো, খুব কাছ থেকে নজর রাখতে পারবে তুমি।' রাহাত খানকে বহু বছর পর ক্ষীণ একটু হাসতে দেখল রানা।

আড়ষ্ট ভঙ্গিতে বসে রইল ও।

'গ্রুপটার সঙ্গে যোগ দিলে নেপাল সরকারের তরফ থেকে অতিরিক্ত কিছু সুবিধে পাওয়া যাবে,' বললেন রাহাত খান।

কী কী সুবিধে পাওয়া যাবে, এক এক করে ব্যাখ্যা করলেন তিনি। প্রতি বছর

পর্বতারোহীদের মধ্যে দুর্ঘটনার হার বাড়ছে, তাই অভিযাত্রী দলের নিরাপত্তার কথা ভেবে নেপাল সরকার কিছু নিয়ম-নীতি আর ব্যবস্থাপনা চালু করেছে। তার একটা হলো: গাইড, ডাক্তার, শেরপা পোর্টার, কমিউনিকেশন অফিসার, ইকুইপমেন্ট ম্যানেজার–সব মিলিয়ে প্রায় বিশজন–নেপাল সরকার দেবে।

'বিশজন! এত লোক?' জানতে চাইল রানা।

নিজের সামনে থেকে একটা কমপিউটার প্রিন্টআউট তুলে রানার দিকে বাড়িয়ে ধরলেন রাহাত খান। 'এটার মধ্যে কয়েকজনের নাম আর পদ লেখা আছে, দেখে রাখো। ভাল কথা, তোমাদের সঙ্গে অন্তত বারোজন শেরপা পাঠাবার কথা বলেছি আমি। আহত অবস্থায় অলৌকিক ভাবে কেউ যদি বেঁচে থাকে, তাকে তো ফিরিয়ে আনতে হবে।

রানা পড়তে শুরু করল: 'ডাক্তার ললিতা লাবণ্য, বয়স সাতাশ, অভিজ্ঞ মাউন্টিনিয়ার, ভারতীয়। কমিউনিকেশন অফিসার ডুনো কারমেল, বয়স আটত্রিশ, দশ বছর ধরে হিমালয়ে চড়ছেন, জাতীয়তা ডেনিশ। তিনজন গাইড–রঘুবীর থাপা, টমাস পারকার, বব মার্লো–বয়স যথাক্রমে ছাব্বিশ, বত্রিশ ও তেত্রিশ। রঘুবীর নেপালি, রানা এজেন্সির কাঠমাণ্ডু শাখার প্রধান অনন্তর ঘনিষ্ঠ বন্ধু। তার আরেকটা গোপন পরিচয় হলো, বিসিআই-এর একজন বিশ্বস্ত ইনফর্মার সে। বাকি দু'জন অস্ট্রেলিয়ান। এরা সবাই চুক্তির ভিত্তিতে নেপাল সরকারের হিমালয় মন্ত্রণালয়ের অধীনে পাঁচ থেকে দশ বছর ধরে কাজ করছেন। তবে বিশেষ লক্ষণীয়: এদের বেশিরভাগই এভারেস্ট সম্পর্কে অভিজ্ঞ, কাঞ্চনজঙ্ঘায় চড়বার অভিজ্ঞতা খুব কম বা না থাকারই মত।

কাগজটা থেকে মুখ তুলে রানা বলল, 'ব্রিটিশ, অস্ট্রেলিয়ান, ডেনিশ আর ভারতীয়, এদের সঙ্গে কাঞ্চনজঙ্ঘায় চড়তে হবে আমাকে?'

'শুধু এরা কেন, ইজরায়েলী-আমেরিকান-রাশান আর জিএম তো এখনও চেহারাই দেখায়নি,' বললেন রাহাত খান। 'তবে কোনও সন্দেহ নেই, শীঘ্রি দেখাবে।'

'এ ছাড়া উপায় নেই, রানা,' বলে উঠল সোহেল। 'তোর জন্যে আলাদা ব্যবস্থা বা এক্সপিডিশন আগে-পরে করতে নেপাল সরকারকে আমরা রাজি করতে পারিনি।'

মাথা ঝাঁকিয়ে ব্যাপারটা মেনে নিল রানা। তবে তারপরই অন্য একটা প্রসঙ্গ তুলল। 'সার, ওখানে আমার প্রতিপক্ষ কারা হতে যাচ্ছে, প্রকৃতি আর জিএম ছাড়া?'

'আজ সকালে খবর পেয়েছি, ব্রিটিশ সিক্রেট সার্ভিস তাদের একজন এজেন্টকে কাঠমাণ্ডু পাঠাচ্ছে। আজ সন্ধ্যায় কাঠমাণ্ডুতে পৌঁছাবে সে। তবে তার পরিচয় জানতে পারিনি। শুধু জানি সে জেমস বন্ড নয়। আমাদের আগেই অনুমতি পেয়েছে বিএসএস।'

'তুই তো জানিস,' বলল সোহেল, 'ইন্টারপোল থেকে তথ্য লীক হওয়া নতুন কোন ঘটনা নয়, কাজেই দুনিয়ার মোড়লরা সবাই ফর্মুলাটা কব্জা করতে চাইবে। তাদের সবার প্রতিনিধিই হিমালয়ের দিকে রওনা হয়েছে, এটুকু ধরে নিতে

পারিস।'

'হুম।' মাথা ঝাঁকালেন মেজর জেনারেল (অব) রাহাত খান।

রানা গম্ভীর।

'তবে একা শুধু তোরই জানা আছে মাইক্রোডটটা চাও-এর পেসমেকারে আছে।'

'তা অবশ্য নিশ্চিত হয়ে বলা যায় না,' মন্তব্য করলেন বৃদ্ধ।

রানা চুপ করে আছে।

'অ্যাসাইনমেন্টটা সম্পর্কে নতুন করে আর কিছু বলার নেই।' এতক্ষণে পাইপে তামাক ভরতে শুরু করলেন বিসিআই চীফ। 'কিছু প্রশ্ন আছে তোমার, এমআরনাইন?'

'না, সার।'

এই সময় ডেস্কের লাল টেলিফোনটা বেজে উঠল। নির্লিপ্ত, ঠাণ্ডা একটা ভাব নিয়ে টেলিফোনের রিসিভার তুললেন রাহাত খান। নিজের নাম উচ্চারণ করে অপরপ্রান্তের বক্তব্য শুনলেন। দশ সেকেন্ড পর রিসিভার নামিয়ে রাখলেন যথাস্থানে।

'তোমার কলেজ জীবনের বন্ধু,' রানাকে বললেন তিনি। 'মন্টি বেলফোর। ব্রিটিশ সিক্রেট সার্ভিসের পক্ষ থেকে তাকেই পাঠানো হচ্ছে হিমালয়ে।'

'কিন্তু মন্টি তো এয়ারফোর্সের লোক!' রানা বিস্মিত। 'মার্ভিন লংফেলো বিএসএস-এর কাউকে না পাঠিয়ে ওকে কেন পাঠাচ্ছেন?'

'এখানে বোধহয় তার দক্ষতার একটা ভূমিকা আছে,' বলল সোহেল। 'হিমালয় তার অত্যন্ত পরিচিত এলাকা। তা ছাড়া, সে লিয়েইজন অফিসার হিসেবে কাজ করার সময় খুন হয়েছেন ডক্টর সাজিদুল হক, রহস্যটার মীমাংসা করার খানিকটা দায় তার ওপর তো চাপেই।'

চুপ করে থাকল রানা। উঠবে কি না ভাবছে।

ডেস্ক থেকে তুলে একটা ম্যাপের ভাঁজ খুললেন রাহাত খান। 'এটা নেপালের ম্যাপ,' বলে রানার দিকে খানিকটা ঠেলে দিলেন। 'হলুদ রেখা টেনে একটা রুট হাইলাইটেড করা হয়েছে। তোমরা একটা চার্টার করা প্লেন নিয়ে তাপলেজাং-এ পৌঁছাবে।' পুব নেপালের উপর একটা ফোঁটার দিকে পেন্সিল তাক করলেন। 'এখান থেকে কাঞ্চনজঙ্ঘা বেস ক্যাম্প সাধারণত আট দিনের পথ, তবে তোমাদেরকে ছ'দিনের মধ্যে পৌঁছাতে হবে।'

রানার চোখে প্রশ্ন।

'একটু বেশি খাটনি খাটতে হবে, তবে সময় বাঁচানোটা খুবই জরুরী,' বললেন রাহাত খান। 'আজ এপ্রিল মাসের তেইশ তারিখ, আর অকুস্থলে তোমাকে পৌঁছাতে হবে জুন মাসে তুমুল বর্ষা শুরু হবার আগে। সেজন্যে লম্বা ট্রেনিংও বাতিল করে দিয়েছি আমি।

'বেস ক্যাম্প এখানে, পাঁচ হাজার একশো চল্লিশ মিটারে।' একটা ত্রিভুজের উত্তর দিকে ক্রসচিহ্ন রয়েছে, পাশে 'কাঞ্চনজঙ্ঘা' লেখা, সেদিকে পেন্সিল তুললেন রাহাত খান। নেপাল আর সিকিমের সীমান্তের উপর ক্রসচিহ্নটা।

'ট্রেনিং বাতিল করলেও,' বলল রানা, 'অ্যাক্লাইমাটাইজিঙের জন্যে তিন দিন আলাদা করে রাখতে হবে।'

'কেন?' জিজ্ঞেস করল সোহেল।

'অলটিচ্যুডের সঙ্গে হিউম্যান বডি ধীরে ধীরে অ্যাডজাস্ট হয়,' ব্যাখ্যা করল রানা। 'উঠতে হবে বিভিন্ন পর্যায়ে থেমে থেমে, তা না হলে গুরুতর অসুস্থতা দেখা দিতে পারে।'

'এ-সব টেকনিক্যাল, খুঁটিনাটি বিষয়ে কিছু ডেভিয়েশন তো হবেই,' বললেন রাহাত খান। 'এবার রওনা হওয়ার প্রস্তুতি নাও। আমি চাই, কাল সকালে ফ্লাইটেই তুমি কাঠমাণ্ডুতে পৌঁছাও।'

'ইয়েস, সার।'

দশ

উত্তর আফ্রিকার উপর ঘৃণা ধরে গেল হিউগো ভেনিনির। জায়গাটা অসম্ভব গরম আর দুর্গন্ধময়। লোকজন এমন অদ্ভুত দৃষ্টিতে তাকায়, প্রত্যেককে সন্দেহ হচ্ছে তার। শুধু গরমে নয়, আতঙ্কেও ঘামছে সে; ভয় হচ্ছে এই ঘাম তার এত যত্নের মেকআপ না মুছে ফেলে, যে মেকআপ আব্রাহাম ও'নীল হিসাবে তাকে মরক্কোয় ঢুকতে সাহায্য করেছে।

তাও তো অন্য যে-সব জায়গায় গেছে ভেনিনি সেগুলোর মধ্যে কাসাব্লাঙ্কাতেই পশ্চিমা সংস্কৃতির চর্চা একটু বেশি হয়। মরক্কোর বৃহত্তম শহরটার লোক সংখ্যা মাত্র ত্রিশ লাখ। এটা এ-দেশের শিল্পশহরও বটে, সেই সঙ্গে বন্দরনগরী; উত্তর আফ্রিকার অত্যন্ত আকর্ষণীয় ট্যুরিস্ট স্পট।

সুটটা আবহাওয়ার তুলনায় একটু ভারী হয়ে গেছে, উজ্জ্বল রোদে বেরিয়ে এসে চোখে সানগ্লাস পরল ভেনিনি। বেলা এখনও দুপুর গড়ায়নি অথচ গায়ে ফোসকা পড়বার মত গরম পড়েছে।

শেরাটনকে পিছনে ফেলে দক্ষিণ দিকে হাঁটা ধরল সে, দল বেঁধে দাঁড়িয়ে থাকা ভিক্ষুকদের দেখেও না দেখবার ভান করছে। দুটো বাঁক ঘুরতেই সেন্ট্রাল মার্কেট এরিয়া অর্থাৎ শহরের প্রধান বাজার এলাকায় চলে এল ভেনিনি। তার প্রতিটি ইন্দ্রিয় আক্রান্ত হলো। নাক বরাবর সামনে তাকিয়ে বোরকা, ফেজ টুপি, পাগড়ি, জোব্বা, আলখেল্লা আর চাদরে মোড়া নারী-পুরুষের ভিড় ঠেলে হন হন করে হাঁটছে সে। হকার আর দোকানদারদের কণ্ঠস্বর লাউডস্পীকারের চেয়েও জোরাল। বেয়াড়া তরুণরা তার গায়ে ধাক্কা দিলেও সে গ্রাহ্য করছে না। ডান পাশে উট আর ছাগল জবাই হচ্ছে। চোখের সামনে ভেসে উঠল দৃশ্যটা: নিজের হাতে ডক্টর সাজিদুল হকের গলা কাটছে সে।

বাজারের দক্ষিণ-পুব কোণে এসে একটা পাথুরে দালান দেখতে পেল ভেনিনি। দালানটার দরজার সামনে সুখাসনে একজন ভিখারি বসে আছে, বয়স

হবে কম করেও নব্বুই। দরজা মানে কবাটবিহীন একটা ফাঁক, ফাঁকটা আড়াল করে রেখেছে চটের তৈরি একটা পর্দা। ভিখারির পাশে তোবড়ানো একটা অ্যালুমিনিয়ামের বাসন।

পকেট থেকে দশ দিরহামের একটা কয়েন বের করে বাসনটায় ফেলল ভেনিনি। বিড়বিড় করে কিছু একটা বলে পর্দার দিকে ইঙ্গিত করল লোকটা। কেউ লক্ষ করছে কিনা দেখে নিয়ে পর্দা সরিয়ে ভিতরে ঢুকে পড়ল ভেনিনি। জায়গাটা টয়লেটের মত দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছে। রুমাল বের করে নাকে চেপে ধরল সে। দুর্গন্ধ ছাড়া কামরাটা খালি। পাথরের দেয়ালের সামনে দাঁড়িয়ে হাতড়াচ্ছে, সরু একটা ফাটলের স্পর্শ পেল আঙুলে। এরপর ফাটলের ভিতর আঙুল ঢুকিয়ে লুকানো একটা ক্যাচ বা খিল খুঁজে নিল। সেটা ঠেলে একপাশে সরিয়ে দিতেই গোপন একটা দরজা খুলে গেল, দেখা গেল সামনে একটা প্যাসেজ রয়েছে। প্যাসেজে পা দিতেই পিছনে বন্ধ হয়ে গেল দরজা।

হিম ঠাণ্ডা অনুভব করল ভেনিনি। অবশেষে এয়ারকন্ডিশনিং! খাটা-খাটনি শেষ হয়েছে। নিজের পুরস্কার গ্রহণ করতে এসেছে সে। তারপরই শুরু করবে নতুন একটা জীবন।

বাপ ছিল জিম্বাবুয়ের একজন অত্যাচারী শ্বেতাঙ্গ খামার-মালিক। ছেলেকে ইংল্যান্ডে লেখাপড়া করিয়েছে। ছেলে লেখাপড়া শিখে বিজ্ঞানী হতে পারলেও, ডিএনএ-র গুণেই সম্ভবত বাপের অপরাধপ্রবণতা তার ভিতরে আরও বেশি মাত্রায় দেখা দেয়, তাই জিএম-এর লোভনীয় প্রস্তাব গ্রহণ করতে দেরি করেনি সে। টাকার লোভে যাকে গুরু বলে শ্রদ্ধা করত তাকে খুন করতেও তার বাধেনি। বাধেনি আরও বেশি টাকার লোভে নিজের জীবনটাকে আরও বড় বিপদের দিকে ঠেলে দিতে।

তবে এই মুহূর্তে ভেনিনি শুধু লাভ আর আরাম-আয়েশের কথাই ভাবছে। তার আশা, চাও-এর প্লেন হাইজ্যাক হওয়ায় জিএম-এর প্রেসিডেন্ট কোন সমস্যা সৃষ্টি করবে না। তার উপর অর্পিত দায়িত্ব ঠিকঠাক মতই পালন করেছে সে; অপারেশনের ওই পর্যায়টা তার আওতার পুরোপুরি বাইরে ছিল। জিএম যেভাবে চেয়েছিল ঠিক সেভাবেই স্কিন-সেভেনটিন ডেলিভারি দিয়েছে সে। এখন যদি তাকে দেওয়া পাঁচ মিলিয়ন মার্কিন ডলার ফেরত চায় তারা, কাজটা অন্যায় করবে!

ভেনিনি অবশ্য জানে, প্রেসিডেন্ট চাইলে তাকে নিয়ে যা খুশি করতে পারে। মরক্কো থেকে জান নিয়ে বেরুতে পারলে নিজেকে পরম ভাগ্যবান বলে মনে করবে সে।

ফ্যাটিগ পরা এক আরব কোত্থেকে বেরিয়ে এল কে জানে, তাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। করিডর ডান দিকে বাঁক নিল। শেষ মাথায় সিঁড়ি। আটটা ধাপ বেয়ে বড়সড় একটা কামরায় উঠে এল তারা। একটা টেবিল, অনেকগুলো কমপিউটার টার্মিন্যাল, সারি সারি ভিডিও সার্ভেইলেন্স স্ক্রিন ছাড়াও অন্যান্য সফিস্টিকেটেড হাই-টেক ইকুইপমেন্ট দেখা যাচ্ছে চারদিকে। অপেক্ষা করছে আরও দু'জন আরব গার্ড।

প্রথমে হাত, তারপর মেটাল ডিটেকটর দিয়ে সার্চ করা হলো ভেনিনিকে। এরপর মাইক্রোস্কোপ-এর মত দেখতে একটা ডিভাইসের দিকে তাকাতে বলা হলো। জিএম-এ যোগ দেওয়ার সময় তার রেটিনার পিছনে উলকি আঁকা হয়েছে, সেটা দেখে ওর পরিচয় যাচাই করা হচ্ছে।

'ঠিক আছে, উনি পাস,' কমপিউটার অপারেটর জানাল।

ভেনিনির এসকর্ট আবার পথ দেখাল, টেবিল ঘুরে একটা দরজার দিকে এগোল সে। কবাট খুলে এক পাশে সরে দাঁড়িয়ে ভেনিনিকে বলল, 'প্রেসিডেন্ট অপেক্ষা করছেন।'

মাথা ঝাঁকিয়ে নার্ভাস একটু হাসল ভেনিনি, তারপর দরজা দিয়ে ভিতরে ঢুকল।

কামরাটা প্রায় অন্ধকার। সিলিং খুব নিচু। একটা কনফারেন্স টেবিলে বসা সাতজন পুরুষ আর তিনজন মহিলার মাথার উপর ঝুলন্ত ল্যাম্পগুলো থেকেই শুধু আলো আসছে। তাদের প্রত্যেকের সামনে একটা করে রাইটিং প্যাড। তবে টেবিলের মাথায় বসা লোকটার খুলির উপর কোন ল্যাম্প ঝুলছে না, সে ছায়ার ভিতর বসে আছে।

সেই জিএম-এর প্রেসিডেন্ট।

মুখোমুখি তাকে কখনও দেখেনি ভেনিনি। খুব কম জিএম সদস্যই সে সুযোগ পেয়েছে। ইনার সার্কেল, টেবিলের চারদিকে এই মুহূর্তে যারা বসে আছে, তারাই শুধু দেখেছে তাকে। কাঠামো দেখে বোঝা যায় লম্বা, কাঁধ জোড়া চওড়া, তবে মেদবিহীন একহারা গড়ন। মুখ আর হাত ছায়ার ভিতর, তবে আলোর আভায় বোঝা যায় গায়ের রঙ ফর্সা হলেও শ্বেতাঙ্গ নয়। তার আসল পরিচয় সম্পর্কে বেশ কিছু গুজব শুনেছে ভেনিনি। কেউ বলে প্রেসিডেন্ট সরাসরি চেঙ্গিস খানের বংশধর। আবার কেউ বলে বার্বার মুসলমান সে, তার পূর্ব-পুরুষরা সেই নিওলিথিক অর্থাৎ নব্য প্রস্তর যুগ থেকে মরক্কোয় বসবাস করছে। ইতিহাসে তারা বীর যোদ্ধা হিসাবে পরিচিত।

বেরেট আর গাঢ় রঙের ঢোলা কাপড় পরেছে প্রেসিডেন্ট। বড় একজোড়া গাঢ় রঙের গ্লাস চোখ ছাড়াও মুখের অনেকটা ঢেকে রেখেছে। ভেনিনির কানে এমন কথাও এসেছে যে প্রেসিডেন্ট সম্ভবত অন্ধ। কথাটা হয়তো সত্যি···

ভেনিনি কামরায় ঢুকতেই কথাবার্তা সব থেমে গেল। সবাই ঘাড় ফেরাল তার দিকে।

'আসুন, ডক্টর ভেনিনি,' প্রেসিডেন্ট বলল। তার কণ্ঠস্বর পরিশীলিত এবং ভরাট, একটু ফরাসী টান আছে। 'টেবিলের ওই প্রান্তে বসুন, প্লিজ। আপনার জন্যে ওই সিটটা আমরা খালি রেখেছি।'

চেয়ারটায় বসে একটা ঢোক গিলল ভেনিনি। খুব বেশি নার্ভাস হয়ে পড়ায়, বাপ তুলে গাল দিচ্ছে নিজেকে।

'অবশেষে আপনার সঙ্গে দেখা হওয়ায় ভাল লাগছে, ডক্টর,' বলল জিএম লিডার। 'স্কিন-সেভেনটিন নিয়ে আপনার কাজ গভীর আগ্রহ নিয়ে লক্ষ করছিলাম আমরা। জিএম-এর পক্ষ থেকে আপনি যা কিছু করেছেন, সেজন্যে আপনাকে

উষ্ণ অভিনন্দন জানাই আমি। এত বছরের একটা ক্যারিয়ার বিসর্জন দেয়া সহজ কথা নয়, সহজ কথা নয় এরকম মূল্যবান একটা আবিষ্কার চুরি করতে পারা।'

'থ্যাঙ্ক ইউ, সার,' বলল ভেনিনি।

'আপনার এই কাজটাও খুব প্রশংসনীয়–ফর্মুলাটা বেলজিয়ামে নিয়ে এসে আমাদের মক্কেলের পেসমেকারে ঢোকানোর ব্যবস্থা করা। আইডিয়াটা কী আপনার ছিল, ওখানে রোপণ করার?'

'ইয়েস, সার,' বলল ভেনিনি। প্রবল রোমাঞ্চ অনুভব করছে সে, ভাবছে–তা হলে হয়তো মীটিংটা ভালয় ভালয় শেষ হতে যাচ্ছে।

'ব্রাসেলসে ধরা পড়া ডাক্তারের ব্যাপারেও সঠিক পদক্ষেপ নিয়েছেন আপনি। তাকে বাঁচিয়ে রাখার পিছনে কোন যুক্তি ছিল না। তবে এ-কথা ভেবে এখনও একটু বিভ্রান্ত আমি–সে ধরা পড়ল কেন! আসলে কিছুই বোধহয় পুরোপুরি নিখুঁত হয় না, তাই না?'

'না, সার,' বলল ভেনিনি। ঢোক গিলে কোন রকমে এক চিলতে হাসি ম্যানেজ করতে পারল।

গানমেটাল কেস থেকে সিগারেট বের করতে কিছুটা সময় নিচ্ছে প্রেসিডেন্ট। মাথা সোজা রেখেছে সে, তাকিয়ে আছে ভেনিনির মাথার পিছনের দেয়ালের একটা নির্দিষ্ট বিন্দুতে। লোকটা সত্যি অন্ধ! ভাবল ভেনিনি। জিএম-এর প্রধান কর্মকর্তা দুনিয়ার কিছুই দেখতে পায় না।

ডানহিল লাইটার জ্বেলে সিগারেট ধরাল প্রেসিডেন্ট। 'এ থেকেই প্রশ্ন ওঠে,' বলল সে, 'স্কিন-সেভেনটিন গেল কোথায়।'

ভয় পেয়ে নিজের অজান্তে চোখ বুজে ফেলল ভেনিনি।

প্রেসিডেন্ট বলে চলেছে, 'আমি যতটুকু বুঝেছি–তিয়েন চাও কাঠমাণ্ডুতে ছিল, কীভাবে তাইওয়ানে যাবে সেই নির্দেশ পাওয়ার অপেক্ষায়। যাই হোক, শেডিউলের ঠিক একদিন আগে কিডন্যাপ করে তাকে এয়ারপোর্টে নিয়ে যাওয়া হয়। তারপর তাকে কিডন্যাপারদের হাইজ্যাক করা একটা হিমালয়ান সাইট-সীইং ফ্লাইটে তুলে দেয়া হয়। সেটা পাহাড়ের দিকে উড়ে যায়, তারপর ঝড়ে পড়ে বিধ্বস্ত হয়। এ-সব ঘটনা ঠিক আছে তো?'

ভেনিনি গলা খাঁকারি দিল, কিন্তু তাতেও ভিতর থেকে পরিষ্কার আওয়াজ বেরুল না। 'হ্যাঁ, এরকমই ঘটেছে বলে জানি আমি–জী, ঠিক তাই ঘটেছে।'

সিগারেটে আরেকটা টান দিয়ে চেয়ারে সামান্য নড়েচড়ে বসল প্রেসিডেন্ট। 'আপনি বোঝেন তো, ডক্টর, ব্যাপারটা জিএম-এর জন্যে অত্যন্ত বিব্রতকর? আমরা আমাদের ইজরায়েলি মক্কেলকে হতাশ করেছি। তারা এখন তাদের টাকা ফেরত চাইছে। আফটার অল, স্কিন-সেভেনটিন স্পেসিফিকেশন প্রতিশ্রুতি অনুসারে ডেলিভারি দেয়া হয়নি।'

'আমাদের কাজটুকু আমরা করেছি, সার,' প্রতিবাদ জানাল ভেনিনি। 'আমাদের দায়িত্ব ছিল তাকে কাঠমাণ্ডুতে পৌঁছে দেয়া। তা আমরা দিয়েছি। নেপালে আমাদের লোকজন চাও-এর ওপর খুব ভাল করে নজর রাখেনি। বোঝা গেল একমাত্র জিএম-ই ফর্মুলাটা চাইছে না। কোন একটা পক্ষ সবাইকে পিছনে

ফেলে তার কাছে পৌঁছে যায়।'

'কিন্তু আর কেউ জানবে কীভাবে তার কাছে ওটা আছে?'

'হয়তো সেই প্রাইভেট ইনভেস্টিগেটিং এজেন্সির এজেন্ট, যে ব্রাসেলস্ পর্যন্ত আমার পিছু নিয়েছিল–?' আনমনে বিড়বিড় করছে ভেনিনি, স্রেফ অভিনয়।

'আপনি মাসুদ রানার কথা বলছেন। ওর সম্পর্কে আপনি আসলে কিছুই জানেন না। সে কথা থাক। আপনি ইংল্যান্ড ছাড়ার সময় যথেষ্ট সাবধান হননি, ডক্টর ভেনিনি। আমাদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ নিয়মের একটা হলো নিজের পায়ের ছাপ এমনভাবে মোছা কেউ যাতে আপনার পিছু নিতে না পারে। দুর্ভাগ্য যে এই লোকটা নিয়েছিল।'

'ব্যাপারটা এড়াবার কোন উপায় ছিল না, স্যার,' বলল ভেনিনি। কামরার ভিতরটা যথেষ্ট ঠাণ্ডা হওয়া সত্ত্বেও ঘামতে শুরু করেছে সে। ক্র্যাম্প পেটটাকে ধরতে চাইছে। বুকের ভিতর বুনো ঘোড়া হয়ে উঠছে হৃৎপিণ্ড।

'ফর্মুলা চুরি করতে সাহায্য করল যে আরএএফ অফিসার, সে? আপনার সঙ্গে বেঈমানী করতে পারে?'

'মনে হয় না,' বলল ভেনিনি। মন্টি বেলফোর সম্পর্কে প্রেসিডেন্ট জানল কীভাবে? টিমের সদস্য বেছে নেওয়ার পুরো স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছিল তাকে। এই তথ্যটা সে ছাড়া আর কারও জানবার কথা নয়।

'তাকে কত টাকা দেয়া হয়েছে?' জানতে চাইল লিডার।

'পঞ্চাশ হাজার পাউন্ড,' জবাব দিল ভেনিনি।

'আপনি বিশ্বাস করেন, এই টাকা মুখ বন্ধ রাখার জন্যে যথেষ্ট?'

'করি।'

এই প্রথম গলা চড়াল প্রেসিডেন্ট। 'তা হলে প্লেনটা হাইজ্যাক করল কে? টাকা কামাবার সবচেয়ে বড় সুযোগটা হাত ছাড়া হয়ে গেল। এর জন্যে কে দায়ী?'

ভেনিনি বোবা হয়ে গেছে। মীটিংটা বিপজ্জনক বাঁক নিচ্ছে।

'কী হলো, ডক্টর ভেনিনি?'

'আমার···আমার কোন ধারণা নেই।' ভেনিনি কাঁপতে শুরু করেছে।

'আমি বলব, ডক্টর ভেনিনি?'

'সার?'

আরেকটা টান দিয়ে চেয়ারের হাতলে রাখা অ্যাশট্রেতে সিগারেটটা ঘষে ঘষে নেভাল প্রেসিডেন্ট। কণ্ঠস্বর আবার আগের মত শান্ত শোনাল। 'আপনি জানতে চান কে আমাদের বাড়া ভাতে ছাই দিয়েছে?'

'জী, প্লিজ, সার।' ভেনিনির নিঃশ্বাস ফেলতে কষ্ট হচ্ছে।

'সে জিএম-এর সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করতে চাইছে। আমাদেরই একজন, ডক্টর ভেনিনি। তার ধারণা, আমাদের চেয়ে বেশি স্মার্ট সে।

'স্কিন-সেভেনটিন ডেলিভারি দিতে না পারায় আমাদের সুখ্যাতির ক্ষতি হয়েছে। আমি হয়েছি চরম অখুশি। এটা এমন একটা বিচ্ছিরি উদাহরণ সৃষ্টি করল, সম্ভাব্য আরও দুটো কাজ হাত ছাড়া হয়ে যাবে বলে ভয় পাচ্ছি। জিএম-

এর এমন কাউকে আপনি চেনেন নাকি, ডক্টর ভেনিনি, যারা আমাদেরকে বোকা মনে করে? ভাবে আমাদের সঙ্গে বেঈমানী করে পার পাবে?'

এবার ভেনিনির কানের ভিতর ভোঁ-ভোঁ আওয়াজ শুরু হয়ে গেল। সে কী ধরা পড়ে গেল? 'ন্-ন্না, সার। আপনি জানলেন কীভাবে? মানে, কীভাবে জানলেন যে সে ভেতরের কোন লোক?'

'কীভাবে জানলাম সেটা বড় কথা নয়। জানি, ব্যস। এরকম আরও অনেক কিছু জানি আমি। চাওকে কিডন্যাপ করা হয়েছে স্কিন-সেভেনটিন পাওয়ার জন্যে। তারা হয়তো আরও বেশি দামে আমাদের কাছে ওটা বেচতে চাইবে। মোচড় দিয়ে টাকা কামানোর ব্যবসা আমরা তো আর একা করি না। তবে কেউ যদি জিএম-কে মোচড়াতে চায়, তার জন্যে ভয়াবহ পরিণতি অপেক্ষা করছে।'

সামনের কন্ট্রোল প্যানেলের দিকে হাত লম্বা করে একটা সুইচ অন করল প্রেসিডেন্ট, পিছনের দেয়ালে উজ্জ্বল একটা ফটো দেখা গেল। ছবিটায় তিনজন নেপালিকে দেখা যাচ্ছে। এরাই তিয়েন চাওকে হোটেল এভারেস্ট থেকে কিডন্যাপ করে আলুর বস্তা ভর্তি ট্রাকে তুলেছিল।

'দায়ী এরা তিনজন,' প্রেসিডেন্ট বললেন। 'লোকগুলো নেপালি, তবে নেপালে থাকে না।'

জানে! ভেনিনি ভাবল। যীশুর কিরে, লোকটা সব জানে!

'এবার, এই ব্যাপারটা বুঝতে সাহায্য করুন আমাকে, ডক্টর ভেনিনি,' বললেন সবজান্তা বস্। 'আমরা জানি ডাক্তার র‍্যানডলফ্ ব্রাসেলসে ধরা পড়েছেন। জেরার মুখে তিনি কিছু তথ্যও ফাঁস করেছেন। ঠিক?'

'সম্ভবত।'

'জিএম সম্পর্কে কতটুকু কী জানতেন তিনি?'

'আসলে প্রায় কিছুই না। জানতেন অপারেশনটা না করলে তাঁর কুকীর্তির কথা ফাঁস করে দেব আমরা। তাঁকে মেরে ফেলার পিছনে যুক্তি ছিল, তা না হলে চাও আর আমাকে আইডেনটিফাই করতে পারতেন। ওদিকটায় আমি আমার পায়ের ছাপ ভালভাবেই মুছেছি।'

'হ্যাঁ, তা মুছেছেন,' স্বীকার করল প্রেসিডেন্ট। 'আপনার টিমের সদস্য বেলফোর কী করছে?'

'এয়ারফোর্স থেকে তাকে ধার হিসেবে নিয়েছে ব্রিটিশ সিক্রেট সার্ভিস,' বলল ভেনিনি। 'ওরা স্কিন-সেভেনটিন খুঁজে পাওয়ার চেষ্টা করছে। ইনভেস্টিগেশনে আমরাই অবশ্য এগিয়ে আছি।'

'আর ভয়াবহ দুর্যোগটা সম্পর্কে কী জানেন?'

'ভয়াবহ দুর্যোগ?' ভেনিনি বুঝতে পারছে না।

'আমি জানতে চাইছি, তার গতিবিধি সম্পর্কে কোন খবর রাখেন? নাকি সে একাই আপনার খবর রাখছে?'

'সার, আপনি কার কথা বলছেন?'

'কার মানে? মাসুদ রানার! ওরা কী তাকেই পাঠাচ্ছে নেপালে?'

'সে তো বেলজিয়ামে ছিল, সার। কী জানি, নেপালে পাঠাচ্ছে কি না বলতে

পারব না। আমি পথে ছিলাম তো।'

আরেকটা সিগারেট বের করে ধরাল প্রেসিডেন্ট। 'আপনার জন্যে কিছু খবর আছে, ডক্টর ভেনিনি। বেলফোর আর রানা, দু'জনেই কাঞ্চনজঙ্ঘায় উঠতে যাচ্ছে ফর্মুলাটা উদ্ধার করার জন্যে।'

'তা হলে তো ভালই,' বলল ভেনিনি, নকল হাসি হাসছে। 'আমরা সেক্ষেত্রে আরেকটা সুযোগ পাব। আমাদের জিনিস আমরা ফেরত পেতেও পারি!'

'হয়তো,' বলল জিএম চীফ। 'ডক্টর ভেনিনি, আমার পিছনের স্ক্রিনে এই লোকগুলোকে আপনি কি চেনেন?'

মাথা ঝাঁকাল ভেনিনি। 'ওদেরকে আমি জীবনে কখনও দেখিনি, সার!'

'সত্যি দেখেননি?'

'না, সার।'

কন্ট্রোল প্যানেলের আরেকটা বোতামে চাপ দিল প্রেসিডেন্ট। সঙ্গে সঙ্গে স্লাইড বদলে গেল। পরের ছবিটায় একটা বার দেখা যাচ্ছে। এই পানশালা দেখামাত্র ভেনিনি চিনতে পারল। ছবিটায় কারা রয়েছে দেখতে পেয়ে তার বুকের সমস্ত রক্ত এক নিমেষে যেন ঠাণ্ডা পানি হয়ে গেল।

সেই তিন নেপালি হাতে বিয়ারের গ্লাস নিয়ে অন্য কারও সঙ্গে নয়, খোদ ভেনিনির সঙ্গে কথা বলছে।

'স্কিন-সেভেনটিন অপারেশন শুরু হবার তিনদিন আগে তোলা হয় ছবিটা,' প্রেসিডেন্ট বললেন। 'লেকসাইড পাব-এ; অলডারশট থেকে খুব একটা দূরে নয় জায়গাটা। আপনি খুব ভালভাবে চেনেন, তাই না, ডক্টর ভেনিনি?'

ভেনিনি চোখ বুজল। আর কিছু বাকি নেই, সব শেষ হয়ে গেছে।

'আপনি এই লোকগুলোকে ফর্মুলাটা চুরি করার জন্যে ভাড়া করেন, তাই না, ভেনিনি?' প্রেসিডেন্টের কণ্ঠস্বর এবার রাগে কাঁপছে।

'না—আমি—আসলে আমি...' ভেনিনি কথা খুঁজে পাচ্ছে না।

'শাট আপ!' প্রেসিডেন্ট আরেকটা বোতামে চাপ দিল। ভেনিনির পিছনের একটা দরজা খুলে গেল। ভিতরে ঢুকে তার পিঠের কাছে এসে দাঁড়াল একজন গার্ড। আতঙ্কে দিশেহারা ভেনিনি ঘাড় ফিরিয়ে পিছনটা একবার দেখে নিল, তারপর টেবিলে বসা লোকজনের দিকে তাকাল। সবাই তাকে দেখছে, কারও মুখে কোন ভাব নেই।

'মহামান্য প্রেসিডেন্ট!' ফুঁপিয়ে উঠে বলল ভেনিনি। 'প্লিজ! আমি জানতাম না...আমি সব কথা স্বীকার—'

'বাজে কথা বলবেন না। আপনি জিএম-এর সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করতে যাচ্ছিলেন। ফর্মুলাটা অন্য কারও কাছে বেচে আমরা যে টাকা দিয়েছি তারচেয়ে আরও অনেক বেশি টাকা কামাতে যাচ্ছিলেন। লোভ-ই আপনার সর্বনাশ করল। ঠিক না, ডক্টর ভেনিনি?'

'না, সার। মানে, জী, সার—লোভে পড়েই পাপ করেছি। এ আমি করতে চাইনি, কিন্তু করে ফেলেছি! স্বীকার করছি, আপনার পায়ে ধরছি—আমাকে মাফ করে দিন।'

'আপনি আসলে লোভী আর বোকা। আর বোকাদের আমি একদমই পছন্দ করি না।' ভেনিনির পিছনে দাঁড়ানো গার্ডের উদ্দেশে ছোট্ট করে মাথা ঝাঁকাল প্রেসিডেন্ট।

গার্ড শক্ত হাতে ভেনিনির চুল ধরে হ্যাঁচকা টান দিল, মাথাটা নামিয়ে আনল পিছন দিকে। ভেনিনির গলাটা সিলিঙের দিকে পুরোপুরি উন্মুক্ত হয়ে পড়েছে।

কোমরে গোঁজা ছিল, টান দিয়ে লম্বা ড্যাগারটা বের করল গার্ড। এক হাতে চুল টেনে ধরে আছে, অপর হাতে ভেনিনির গলায় ড্যাগার চালাল সে। ধারাল ছোরা, এক কান থেকে আরেক কান পর্যন্ত ভেনিনির গলা গভীরভাবে কেটে ফেলল। ফিনকি দেওয়া রক্ত ভেনিনির সামনের টেবিল রঙিন করে তুলল। পুরো এক মিনিট গার্ডের হাতের ভিতর মোচড় খেল শরীরটা। তারপর প্রাণ বেরুল। গার্ড ছেড়ে দিতে চেয়ার থেকে পিছলে মেঝেতে পড়ে গেল লাশ।

ঝুঁকে ছোরার রক্ত ভেনিনির সুটে ঘষে ঘষে মুছল গার্ড।

'ধন্যবাদ, সার্জেন্ট,' বলল প্রেসিডেন্ট। 'তুমি এখন যেতে পারো। ক্লিনআপ ক্রুদের পাঁচ মিনিট পর পাঠাও। ততক্ষণে আমাদের কাজ শেষ হয়ে যাবে এখানে।'

স্যালুট ঠুকে কামরা ছেড়ে বেরিয়ে গেল গার্ড।

টেবিলে উপস্থিত অনেকেই ভেনিনির দিক থেকে চোখ সরাতে পারছে না। এক মহিলা গলায় হাত চেপে যেন বমি ঠেকাবার চেষ্টা করছে। তবে খানিক পরই নিজেদেরকে সামলে নিল সবাই। আবার তাকাল প্রেসিডেন্টের দিকে। কারও মনে সন্দেহ নেই যে এই লোকই তাদের উপযুক্ত নেতা।

'আর কেউ পাওয়ার আগে স্কিন-সেভেনটিন আমি চাই,' বলল সে, কণ্ঠস্বর নিয়ন্ত্রিত হলেও হিংস্রতা প্রকাশ পাচ্ছে। 'আমরা জানতে পেরেছি, কমপক্ষে তিনটে দল কাঞ্চনজঙ্ঘায় ওঠার প্রস্তুতি নিচ্ছে। সবার একটাই উদ্দেশ্য, ফর্মুলাটা সংগ্রহ করা।

'একটা দল যাচ্ছে ইংল্যান্ড থেকে। যুক্তরাষ্ট্র থেকেও যাচ্ছে ওরা। শুনতে পাচ্ছি রুশ ইন্টেলিজেন্স রুশ মাফিয়ার সাহায্য নিয়ে দল গঠন করছে। আর ইজরায়েল যে মোসাদকে পাঠাবে, এ তো জানা কথাই। এরকম আরও হয়তো আছে।

'প্ল্যান তৈরি করা হয়ে গেছে, জিএম-ও কাঞ্চনজঙ্ঘায় নিজেদের লোক পাঠাবে। আমাদের লোকই সবার আগে প্লেনটার কাছে পৌঁছে স্কিন-সেভেনটিনের দখল নেবে। টাকা ঢালছি আমরা, অঢেল টাকা ঢেলে এই সব লোকদের দলে ভেড়ানো হচ্ছে। দরকার হলে প্রত্যেকটা লোককে কিনে নেব আমরা। চলতি বছর এটাই সম্ভবত সবচেয়ে বড় অপারেশন হতে যাচ্ছে আমাদের। অভিযানের আয়োজন করার জন্যে আপনাদের অনেককে ডাকা হতে পারে। কোন রকম ব্যর্থতার কথা যেন না শুনি। ব্যাপারটা পরিষ্কার তো?'

সবাই মাথা ঝাঁকাল, কিন্তু প্রেসিডেন্ট তা দেখতে পেল না। অনেকেই আবার ঘাড় ফিরিয়ে টেবিলের শেষ মাথার বীভৎস দৃশ্যটার দিকে তাকাল। কেউ কেউ শিউরে উঠে ভয়ে ভয়ে চাইল প্রেসিডেন্টের দিকে।

'ব্যাপারটা পরিষ্কার?' কানের পাশে অকস্মাৎ যেন একটা বাঘ গর্জে উঠল।

সবাই ঝট করে প্রেসিডেন্টের দিকে ফিরল। 'ইয়েস, মিস্টার প্রেসিডেন্ট!'

প্রেসিডেন্ট হাসল। 'গুড। তা হলে চলুন লাঞ্চে বসি। সবার খিদে পেয়েছে, তাই না?'

এগারো

পরদিন লাঞ্চের কিছু আগে কাঠমাণ্ডু পৌঁছাল রানা। এয়ারপোর্টে ওকে নিতে এসেছে রানা এজেন্সির কাঠমাণ্ডু শাখার প্রধান অনন্ত মিশ্র আর গাইডদের একজন, রঘুবীর থাপা। কাস্টমস্ আর ইমিগ্রেশনের ঝামেলা থেকে তারাই ওকে কৌশলে বের করে আনল।

'আমাকে রঘু বলে ডাকবেন, সার।' নেপালি গাইড নিজের ছোট্ট ফিয়াটে রানা আর মিশ্রকে তুলে নিয়ে হোটেলের উদ্দেশে রওনা হয়ে গেল। রঘুবীর থাপার বয়স হবে ছাব্বিশ। লম্বায় পাঁচ ফুট দু'ইঞ্চি, ওজনে একশো পঞ্চাশ পাউন্ড বা কাছাকাছি। মানুষ হিসাবে হাসিখুশি আর নম্র। পরিচয় পর্বের সময় বুকের কাছে হাত তুলে 'নমস্তে জী' বলবার ধরনটা দারুণ ভাল লেগে গেছে রানার।

'হ্যাঁ, ঠিক আছে, তোমাকে আমি রঘু বলেই ডাকব,' বলল ও। 'তবে আমাকে তুমি সার বলবে না।'

'মাসুদ ভাই বলবে,' পরামর্শ দিল মিশ্র।

ফিক করে হেসে ফেলল রঘু। তারপর জানতে চাইল, 'আগে আপনি কখনও পাহাড়ে চড়েছেন?'

মাথা ঝাঁকাল রানা। 'হ্যাঁ, অনেকবার। তবে ওগুলোর বেশিরভাগই তিন-চারশো ফুট উঁচু।'

হেসে উঠল রঘু।

'এটা মাসুদ ভাইয়ের বিনয়,' রঘুকে জ্ঞানদান করবার সুরে বলল মিশ্র।

'কাঞ্চনজঙ্ঘায় উঠেছেন?'

মাথা নাড়ল রানা। 'এভারেস্টের অর্ধেকটা উঠেছিলাম, কিন্তু কাঞ্চনে ওঠার সুযোগ হয়নি কোনদিন। তুমি?'

'আমি একবার কাঞ্চনজঙ্ঘায় প্রায় উঠেই পড়েছিলাম। তুষার ধসের কারণে নেমে আসতে বাধ্য হই। তারপর শুরু হয় খুব খারাপ একটা ঝড়। আরেকবার চেষ্টা করার জন্যে পাগল হয়ে আছি।'

'গাইড হলে কী করে? মানে, পাহাড়ে চড়া শিখলে কীভাবে?'

'হাঁটতে পারার পর থেকে সারাটা জীবনই তো পাহাড়ের ওপর দিয়ে ওঠা-নামা করতে হয় আমাদের,' বলল রঘু। 'সেজন্যেই তো আমাদের পায়ের পেশী এত মজবুত। পাহাড়ে চড়া আমাদের আসলে শিখতে হয় না। তবে আমার বিশেষ ট্রেনিং নেয়া আছে।'

রানা জানতে চাইল, 'ব্রিটিশ মাউন্টিনিয়ার মন্টি বেলফোরের সঙ্গে পরিচয় হয়েছে তোমার?'

'জী, ভাইয়া। বেলফোর সাহেবকে আমার বেশ হাই-ফাই মনে হলো।'

'তোমরা শেডিউল নিয়ে কথা বলেছ?'

'জী, ভাইয়া। বেলফোর সাহেব বলছেন বর্ষা শুরু হবার আগেই কাঞ্চনে উঠতে হবে। আমিও তাই বলি।'

'সম্ভব?'

একটু চিন্তা করে জবাব দিল রঘু। 'অসম্ভব নয়।'

'আমাদের সাফল্যের সম্ভাবনা কতটুকু বলে মনে করো তুমি?'

রানার দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকাল রঘু। 'পঁয়ষট্টি পারসেন্ট।'

রানা জানতে চাইল, 'জিএম সম্পর্কে মিশ্র তোমাকে কতটুকু বলেছে?'

ভুরু কোঁচকাল রঘু। 'বেশি কিছু না। তবে অনন্তর কাছ থেকে পাওয়া ফাইলটা কাল রাতে পড়েছি আমি। খুনী আর বদমাশদের একটা জোট বলে মনে হলো। তবে এ-সব লোকদের আমি ভয় পাই না, ভাইয়া। আমি একজন সৈনিক, ব্রিটেনের গুর্খা রেজিমেন্টে ছিলাম।'

রঘুর দিকে নতুন দৃষ্টিতে তাকাল রানা। 'তুমি ব্রিটিশ সেনাবাহিনীর লোক? তাহলে নেপালে গাইডের চাকরি করছ কেন?'

'শালারা ছুটি দেয় না–,' বলেই দাঁত দিয়ে জিভ কাটল রঘু। 'মাফ কিজিয়ে, ভাইয়া,' হিন্দিতে ক্ষমাপ্রার্থনা করল। 'ঘরে নতুন বউ রেখে গেছি অথচ ওরা বলল ছুটি পাবে তিন বছরে একবার। আপনিই বলুন, এ কি পোষায়? বউ চিঠিতে কাঁদে। তাই দেশের ছেলে দেশে ফিরে এসেছি।'

'ভাল করেছ,' বলল রানা। জিএম প্রসঙ্গে আবার ফিরে গেল ও। 'ফাইল পড়ে ওদের সম্পর্কে আর কী বুঝলে তুমি?'

'বুঝলাম ওরা আদাজল খেয়ে চেষ্টা করবে আমাদের মিশন যাতে সফল না হয়। স্যাবটাজ করবে, ভাইয়া।'

'ঠিক ধরেছ। কাজেই খুব সাবধান থাকতে হবে আমাদের।'

জংবাহাদুর রানা অ্যাভিনিউ-এর শেষ মাথায় ওদের হোটেল তাজমহল। ওদেরকে নামিয়ে দিয়ে কী একটা জরুরী কাজে তাড়াতাড়ি বিদায় নিয়ে চলে গেল রঘুবীর। রানাকে নিয়ে রিশেপসনে চলে এল মিশ্র। ওর স্যুইট আগেই রিজার্ভ করা হয়েছে, শুধু খাতায় সই করে চাবিটা নিতে হলো।

এলিভেটরে চড়ে পাঁচতলায় উঠছে ওরা, মিশ্র বলল, 'মাসুদ ভাই, বিসিআই-এর টেকনিক্যাল এক্সপার্ট মেজর সাখাওয়াৎ হোসেন এই হোটেলেই উঠেছেন। তিনি...'

'হ্যাঁ, জানি। হোসেন ভাই জরুরী কোন কাজে দিল্লিতে ছিলেন। ঢাকা থেকে তাঁকে এখানে আসতে বলা হয়েছে। কিছু বলেছেন, কোথায় আমার সঙ্গে দেখা করতে চান?'

'জী, মাসুদ ভাই। আমাদের অফিসে। এখানে এসে যা যা সংগ্রহ করেছেন সব ওখানেই রেখেছেন।'

*

লাঞ্চের পর মিশ্রকে নিয়ে রওনা হলো রানা। ভর দুপুরের রোদ খুব তেতে আছে। দরবার স্কয়্যার কাছেই বলে হেঁটে যাচ্ছে ওরা। জায়গাটাকে পুরানো কাঠমাণ্ডুর হার্ট বলা হয়। চৌরাস্তাকে ঘিরে আছে পুরানো রাজপ্রাসাদ আর প্যাগোডার ধাঁচে তৈরি বেশ কয়েকটা নেপালি মন্দির। এমন ব্যস্ততা আর শোরগোল নেপালের খুব কম রাস্তাতেই দেখা যাবে। ট্যাক্সি আর গরু একই রাস্তা ব্যবহার করছে। হকাররা নিজেদের পণ্যের চারপাশে চরকির মত ঘুরে ক্রেতাদের ধরে রাখবার চেষ্টা করছে। অর্ধনগ্ন তিনজন সাধু, সারা গায়ে ধুলোমাখা, আকাশের দিকে মুখ তুলে ব্যস ধ্যান করছে। মেয়েদের পিঠে বেতের তৈরি ঝুড়ি দেখা যাচ্ছে, তরিতরকারি নিয়ে যাচ্ছে বাজারে।

একটা শিব মন্দিরের পিছনে এসে সরু গলির মুখে থামল মিশ্র। 'বাংলার মুখ' নামে বেশ বড় একটা অ্যান্টিক শপে ঢুকল ওরা। এটাই রানা এজেন্সির কাঠমাণ্ডু শাখা।

রানাকে নিয়ে দোকানটার পিছনে, একটা প্যাসেজে চলে এল মিশ্র। একটা তালা দেওয়া কামরা দেখিয়ে রানাকে বলল, 'মেজর হোসেন তার জিনিস-পত্র এখানে রেখে গেছেন।'

ছোট্ট করে মাথা ঝাঁকাল রানা।

ওকে নিজের অফিস কামরায় বসাল মিশ্র। 'মেজরকে সঙ্গে করে নিয়ে আসিনি, কারণ আপনার সঙ্গে আমার কিছু আলাপ আছে, মাসুদ ভাই। আপনি বললে এখনি শুরু করতে পারি আমি।'

'ঠিক আছে। তবে ফোন করে মেজর হোসেনকে বিশ মিনিট পর আসতে বলে দাও।'

'জী, ঠিক বলেছেন।' তাজমহলে ফোন করে মেজর হোসেনের সঙ্গে কথা বলল মিশ্র।

একটা নেপালি মেয়ে এসে কফি দিয়ে গেল ওদেরকে।

'ওই তিন হাইজ্যাকার সম্পর্কে কিছু তথ্য পেয়েছি আমি, মাসুদ ভাই,' মেয়েটা চলে যেতে বলল মিশ্র। ডেস্ক থেকে একটা এনভেলাপ তুলে নিয়ে ভিতর থেকে এইট-বাই-টেন সাইজের কিছু ফটোগ্রাফ বের করল। 'তিনজনই নেপালের নাগরিক, পাঁচ বছর আগে জেল ভেঙে পালায়। সবার ধারণা ছিল ওরা কেউ বেঁচে নেই। যে হ্যাঙ্গারে ট্যুরিস্টদের প্লেনটা ছিল সেটার দু'জন ওয়ার্কার ওদেরকে চিনতে পেরেছে।'

'আমরা জানি ওরা জিএম কি না?' জানতে চাইল রানা।

'না, জানি না। তবে এটুকু জানা গেছে যে তিনজনই ওরা ঠগী সম্প্রদায়ের লোক ছিল।'

'এই, কী বলছ!' রানা একটু বিরক্ত। 'ঠগী বলে কিছু আর আছে নাকি? ব্রিটিশ সরকার শেষ ঠগীকে ফাঁসিতে ঝুলিয়েছে সেই ১৮৮২ সালে।'

'ঠিক,' বলল মিশ্র। 'কিন্তু ওদের বংশধর ভারত আর নেপালে আজও রয়ে গেছে, মাসুদ ভাই। আর আমার ধারণা, আধুনিক ঠগী জিএম-এর আদর্শ

ক্যানডিডেট হতে পারে। আপনি একটা কথা শুনলে আশ্চর্য হয়ে যাবেন।'

'কী?'

'অল্প সময়ের জন্যে ইংল্যান্ডে ছিল ওরা, স্কিন-সেভেনটিন চুরি হবার মাত্র ক'দিন আগে। যেদিন পৌঁছেছে, তার পরদিন বেরিয়ে এসেছে।'

'ইংল্যান্ডে ঢুকল কী করে?'

'ভিসা ইস্যু করার কারণ হিসেবে বলা হয়েছে–"পারিবারিক পুনর্মিলন"। কিন্তু খোঁজ নিয়ে পরে জানা গেছে ওদের তথাকথিত পরিবার বলে কোনকালে কেউ ইংল্যান্ডে ছিল না।'

ছবিগুলো দেখে রেখে দিল রানা, হাতে নিল নতুন আরেকটা। কাঞ্চনজঙ্ঘার ক্র্যাশ সাইটের এরিয়াল ফটো এটা, নেপাল সরকারের পর্যটন মন্ত্রণালয়ের বিমান থেকে তোলা। ফিউজিলাজটা পরিষ্কার ধরা পড়েছে ক্যামেরায়, এতটাই অক্ষত যে বিস্মিত হতে হয়।

'রিকনিসন্স ফটো দেখে বোঝা যাচ্ছে, আপনি একবার গ্রেট সিক্রি টেরেসে পৌঁছাতে পারলে প্লেনটার নাগাল পাওয়া সম্ভব,' বলল মিশ্র। 'তবে এই ছবিটা দেখুন।' অন্য একটা ফটোর দিকে রানার দৃষ্টি আকর্ষণ করল সে। এটাও এরিয়াল ফটো, তবে ম্যাগনিফাই করা হয়েছে।

প্লেনের খোলা দরজার চারদিকে পায়ের ছাপ স্পষ্ট চেনা যাচ্ছে।

'অ্যাক্সিডেন্টের পরও কেউ বেঁচে ছিল,' মন্তব্য করল রানা।

'কিন্তু ওই অলটিচ্যুডে সে বা তারা সারভাইভ করতে পারবে না,' বলল মিশ্র। 'ভাঙা প্লেন থেকে বেরিয়ে হয়তো এসেছে, কিন্তু তারপর আর বেশিক্ষণ বেঁচে থাকতে পারেনি। ওখানকার আবহাওয়ার জন্যে কারুরই প্রস্তুতি ছিল না।'

'পায়ের ছাপগুলো কোথায় গেছে জানতে পারলে ভাল হত,' বলল রানা। 'ওরা তোমাকে আর কোন ফটো দেয়নি?'

'রঘু বলছিল, ওদের ভাগ্যটাই খারাপ। প্লেনটায় ও ছিল। কিন্তু আরও ফটো তোলার জন্যে ফিরে গিয়ে দেখে বাতাস আর তুষার সব ছাপ ঢেকে দিয়েছে। তবে ওগুলো যে দক্ষিণ দিকে গেছে, কিছুটা বোঝা যায়। যে বা যারাই হোক, আপনারা কোন একটা ফাটলে ওদের লাশ দেখতে পাবেন।'

মিশ্র আরও বেশ কিছু ডকুমেন্ট আর রিপোর্ট দেখাল রানাকে। তবে তার কাছে এমন কিছু নেই যাতে প্রমাণ হয় প্লেন হাইজ্যাকিঙের সঙ্গে জিএম জড়িত। তার জানামতে আন্তর্জাতিক অপরাধীদের এই সংগঠন উপমহাদেশে আগে কখনও কোন অপারেশন চালায়নি।

ঠিক সময়মতই পৌঁছালেন বিসিআই-এর টেকনিক্যাল এক্সপার্ট মেজর (অবসরপ্রাপ্ত) সাখাওয়াৎ হোসেন। ভদ্রলোক রানার চেয়ে অন্তত বিশ বছরের বড়। বিসিআই এজেন্ট সবাই তাঁকে শ্রদ্ধা করে। একটা সালাম দিয়ে বিদায় নিল মিশ্র।

রানাকে নিয়ে বন্ধ ঘরটার তালা খুলে ভিতরে ঢুকলেন মেজর হোসেন। আলো জ্বালবার পর দেখা গেল একটা মেটাল টেবিলের উপর এটা-সেটা নানা ধরনের ডিভাইস আর ইকুইপমেন্ট সাজানো রয়েছে।

'কিছু আইটেম আমাকে ডিপ্লোম্যাটিক ব্যাগে করে ঢাকা থেকে আনাতে হয়েছে। কিছু এখান থেকে সংগ্রহ করেছি, তোমার অ্যাসাইনমেন্টের ধরন মনে রেখে।

'এই অভিযানে যাতে সফিস্টিকেটেড কমিউনিকেশন ইকুইপমেন্ট ব্যবহার করা হয়, সেজন্যে নেপালের হিমালয় মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে আলাপ করেছি আমি। কী যেন নাম ওই ডেনিশ ভদ্রলোকের, সব তার কাছে আছে।'

'ডুনো কারমেল?'

'হ্যাঁ।'

রানার হাতে মাউথপীস সহ একটা টিউব ধরিয়ে দিলেন মেজর হোসেন। 'এটা আন্ডারওয়াটার ইমার্জেন্সী ব্রিদার-এর মতই, তবে ব্যবহার করা হয় হাই অলটিচ্যুডে। তোমার পারকাতেই জায়গা করে নেবে। এতে মিনিট পনেরো চলার মত অক্সিজেন আছে। আবার বলছি, এটা শুধু ইমার্জেন্সীতে ব্যবহার করার জন্যে।'

এরপর ইঙ্গিতে একজোড়া বুট দেখালেন মেজর হোসেন। 'তোমার জন্যে এই বুট ঢাকা থেকে আনতে হয়েছে। আলট্রা লাইট, অত্যন্ত আরামদায়ক। গোড়ালিতে স্পেশাল ফিল্ড কম্পার্টমেন্ট আছে। ডান বুটে পাবে মেডিকেল আর ফার্স্ট এইড ইকুইপমেন্ট। বাম বুটে আছে এক সেট ছোট টুলস। স্ক্রুডাইভার, প্লায়ার্স, রেঞ্চ···কাজে লাগতে পারে।'

বিভওয়্যাক স্যাকটা পরীক্ষা করছে রানা।

সেদিকে চোখ পড়তে মেজর হোসেন বললেন, 'ও, ওটা। এই বিভওয়্যাক স্যাক কাজে লাগবে রাতের বেলা ক্যাম্প থেকে দূরে কোথাও আটকা পড়ে গেলে। স্পেশাল ব্যাটারি-অপারেটেড পাওয়ার প্যাক ইনস্টল করা হয়েছে, ইলেকট্রিক ব্ল্যাঙ্কেটের মত গরম করে রাখবে। আকারে বড় করার ব্যবস্থাও আছে, প্রয়োজনে যাতে দু'জনের জায়গা হয়।'

'গুড।'

'সঙ্গে ওয়ালথার আছে?'

'আছে।'

'দাও আমাকে।' রানার হাত থেকে পিস্তলটা নিয়ে ফার দিয়ে কিনারা মোড়া একটা হোলস্টারে সেটা ভরলেন মেজর হোসেন। 'পারকা সহ এতসব গরম কাপড় পরে থাকবে তুমি, প্রয়োজনের সময় বের করতে নির্ঘাত দেরি করে ফেলবে। আর অস্ত্র বের করতে যে দেরি করে সে বাঁচে না। আমার ধারণা সমস্যাটার সমাধান দিতে পারে এই আউটার হোলস্টার। পারকার ওপর পরবে তুমি, অথচ দেখে মনে হবে এটা আরেকটা পকেট মাত্র।'

আধ ঘণ্টা ধরে নানা বিষয়ে পরামর্শ দেওয়ার পর মেজর হোসেন জানালেন, অভিযান চলবার সময় কোন কারিগরি সমস্যা দেখা দিলে ফ্যাক্সের মাধ্যমে রানা তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারবে। রানাকে বিস্মিত হতে দেখে তিনি বললেন, 'তোমাদের কমিউনিকেশন অফিসার ডুনো কারমেলের ইন্টারনেট, ফ্যাক্স আর টেলিফোনের সঙ্গে ডিরেক্ট স্যাটেলাইট লিঙ্কআপ থাকবে। তুমি ইচ্ছে করলে মাউন্ট

এভারেস্ট থেকে আমাকে একটা ডিজিটাল স্ন্যাপশট পাঠাতে পারো।'

'কিন্তু আমি তো এভারেস্টে উঠছি না, মিস্টার হোসেন।'

'এভারেস্ট বা কাঞ্চনজঙ্ঘা, কথা তো সেই একই।'

সবশেষে বাক্স খুলে প্লাস্টিকের একটা প্যাকেজ বের করলেন মেজর হোসেন। 'এটা একটা ইনফ্লেইটেবল্, পোর্টেবল গেমাও ব্যাগ, সাত কিলো ওজন। তুমি জানো গেমাও ব্যাগ হলো একটা হাইপারব্যারিক চেম্বার, অলটিচ্যুড সিকনেসের চিকিৎসায় ব্যবহার করা হয়। এটা স্পেশাল, কারণ এর সঙ্গে এয়ার পাম্প আর জেনারেটর আছে, ফলে ফোলাবার জন্যে আরেকজন লোকের সাহায্য দরকার হয় না।'

অক্সিজেন রেগুলেটর-এর মত দেখতে অদ্ভুত একটা জিনিস হাতে নিল রানা। ডিভাইসটার মাউথপীস একটা নয়, দুটো।

মেজর হোসেন হাসলেন। 'ওটা অক্সিজেন রেগুলেটর, বুঝতেই পারছ। তবে একজনের জন্যে নয়, দু'জনের জন্যে। সেজন্যেই একজোড়া মাউথপীস দেখতে পাচ্ছ।'

'টিমের সবাই যখন পুরুষ, এটা পুলকিত করবার মত কোন জিনিস নয়,' বলে ফেলল রানা।

হা-হা করে হেসে উঠলেন মেজর হোসেন। তারপর ওর কাঁধে হাত রেখে বললেন, 'সহি-সালামতে ফিরে এসো, রানা। বুঝলে? আগামীবার তোমার মনের মতন কিছু যন্ত্র বানিয়ে রাখব। প্রমিজ!'

মেজর হোসেন বিদায় নিয়ে চলে যাবার পর মিশ্রর অফিসে ফিরে এসে রানা দেখল রঘুবীরের সঙ্গে গল্প করছে সে। রঘুবীর জানাল, রানার খোঁজে ওর হোটেলে গিয়েছিল সে, সেখানে দেখা হলো বেলফোর সাহেবের সঙ্গে। 'সাহেব আপনাকে নিতে পাঠালেন। আপনার জন্যে অপেক্ষা করছেন তিনি, ভাইয়া।'

'করুক অপেক্ষা, যাব পরে,' বলল রানা।

রাস্তায় বেরিয়ে এসে রঘু জানাল, ওর গাড়ির ব্রেক ঠিকমত কাজ করছিল না দেখে মেরামতের জন্য একটা গ্যারেজে রেখে এসেছে। শুনে মিশ্র একটা ট্যাক্সি ডাকতে চাইল। কিন্তু রোদ পড়ে আসায় তাকে বাধা দিল রানা, বলল, 'শহরটা একপাক ঘুরে দেখতে চাই আমি, চলো হাঁটি।'

বিকেল বলেই রাস্তায় ভিড় আরও বেড়েছে। অনেকক্ষণ ধরে হাঁটাহাঁটি করল ওরা। এক সময় পৌঁছাল দরবার স্কয়্যারে।

ওদের মাথার অনেক উপরে, দেবমন্দিরের ভিতর, এক নেপালি স্নাইপার শক্তিশালী সেমি অটোমেটিক রাইফেল হাতে অপেক্ষা করছে। অস্ত্রটা ইজরায়েলে তৈরি; ৭.৬২ মিমি গালিল স্নাইপিং রাইফেল। এটা দিয়ে তিনশো মিটার দূর থেকে মানুষের মাথায় লাগানো যায় গুলি, ছ'শো মিটার দূর থেকে অর্ধেক শরীরে, আর আট-নয়শো মিটার দূর থেকে শরীরেই লাগবে, কিন্তু কোথায় তা নিশ্চয় করে বলা যায় না। লোকটার হাত ভাল, যদিও এক্সপার্ট নয় সে। একজন স্নাইপারের বিশেষ ট্রেনিং থাকতে হয়, শিখতে হয় সূক্ষ্ম কিছু টেকনিক; কারণ একটা বুলেট পুরোপুরি সরল রেখা ধরে ওড়ে না। মাধ্যাকর্ষণ আর বাতাসের সঙ্গে ঘর্ষণের কারণে ফ্লাইট

পাথ বেঁকে বা নিচু হয়ে যায়। প্র্যাকটিস না থাকলে, শুধু টেলিস্কোপিক সাইটের সাহায্যে সবসময় ভাল ফলাফল আশা করা যায় না।

সে-কারণেই এ-যাত্রা প্রাণে বেঁচে গেল রানা।

প্রথম বুলেট ওর পায়ের সামনে কংক্রিট গুঁড়ো করল। তিনজন একসঙ্গে ডাইভ দিয়ে ফুটপাথে পড়ল, তারপর মাথা তুলে দেখতে চেষ্টা করল স্নাইপার ঠিক কোথায় পজিশন নিয়েছে। চোখ কুঁচকে সূর্যের দিকে তাকাল রানা। ও প্রায় নিশ্চিত, গুলিটা করা হয়েছে ওর সামনের তিন গম্বুজঅলা মন্দিরের ছাদ থেকে।

'লোকটা ওখানে!' হাত তুলে দেখাল রানা, তারপর ক্যাঙ্গারুর মত লাফ দিয়ে মন্দির লক্ষ্য করে ছুটল।

বাকি দু'জনও ওর পিছু নিল। একটা রিকশা মুহূর্তের জন্য ওদের পথ আটকাল। রিকশা সরে যাবার পর মিশ্রকে রানার আগে দেখা গেল, চোখ কুঁচকে মন্দিরের মাথার দিকে তাকিয়ে রয়েছে।

'মাসুদ ভাই, বেজন্মাটা এখনও ওখানে আছে?'

মন্দিরের ছাদে দাঁড়িয়ে রানার মাথাটাকে টার্গেট করল স্নাইপার। বাকি দু'জনকে সে চেনে না। খানিক আগে চেহারার বর্ণনা দিয়ে মোবাইল ফোনে তাকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, বাঙালী সুপুরুষটি এদিকে আসছে, রেঞ্জের মধ্যে পেলে তাকে ফেলে দিতে হবে।

ক্রসহেয়ার রানার নাকে নিখুঁতভাবে সেন্টারড্ হলো। দেরি না করে ট্রিগার টেনে দিল লোকটা। কিন্তু রানাকে কী যেন বলবার জন্য হঠাৎ সামনে চলে এল মিশ্র।

কানের পাশে ঢুকল বুলেট, ছিটকে রানার উপর পড়ল মিশ্র।

'আমি দেখেছি!' চেঁচিয়ে উঠেই মন্দিরের দিকে ছুটল রঘু। মিশ্রর লাশ রাস্তায় নামিয়ে রেখে ওয়ালথার বের করল রানা, পিছু নিল রঘুর।

মন্দিরের দরজায় গুর্খা রঘু বাধা দিল রানাকে। 'ভাইয়া, আপনি ভেতরে ঢুকতে পারবেন না,' এক মুহূর্ত ইতস্তত করে বলল সে। 'অহিন্দু কারও ভেতরে ঢোকা একদম নিষেধ।'

'কী আশ্চর্য!' রানা রেগে উঠল।

'দুঃখিত, ভাইয়া,' রঘুও অটল। 'আমি দেখছি। আপনি এখানে অপেক্ষা করুন।'

'না। আমার লোক খুন হয়েছে, আমিও যাব।'

বিড়বিড় করে মন্ত্র আওড়ে দু'হাত এক করে কপালে ঠেকাল রঘু, সম্ভবত রানার হয়ে দেব-দেবীর কাছে ক্ষমা চেয়ে নিল, তারপর এক ছুটে ঢুকে পড়ল মন্দিরের ভিতর।

ভিতরে বিরাট একটা শিব লিঙ্গ দেখা গেল। ঢিবি আকৃতির প্রকাণ্ড একটা স্তূপ তৈরি করা হয়েছে পিলারের মাথায়, সেটাই মন্দিরের ছাদ। ভিতরটা অন্ধকার। ধূপ আর ধুনোর ধোঁয়া গলায় লাগতে বিষম খাওয়ার অবস্থা হলো রানার। পূজারীরা হতচকিত হয়ে তাকাচ্ছে ওর হাতের দিকে।

রঘুর পিছু নিয়ে মন্দিরের পিছনে চলে এল রানা। সিঁড়ি বেয়ে উঠছে ওরা,

আরেকটা গুলি হলো। এই গুলিটা ছাদ থেকে নয়, মন্দিরের ভিতর থেকে করা হয়েছে। পুজো দিতে আসা মেয়েরা আতঙ্কে চিৎকার জুড়ে দিল। শুরু হলো প্রতিযোগিতা, কে কার আগে মন্দির থেকে বেরিয়ে যেতে পারে।

রানা আর রঘু স্নাইপারকে একটা ঢালু ছাদ বেয়ে উপরে উঠতে দেখল। ছাদটার মাথায় উঠতে পারলে লাফ দিয়ে নীচের উঠানে বা রাস্তায় নামতে পারবে সে।

রঘুর পায়ে অবিশ্বাস্য ক্ষিপ্র গতি, ঢালু ছাদ বেয়ে ঠিক সময় মত পৌঁছে লোকটার একটা গোড়ালি চেপে ধরল। শুরু হলো ধস্তাধস্তি। লোকটার হাত ছাড়া হয়ে গেল রাইফেল। রানাও ঢালু ছাদ ধরে ছুটল, তবে রঘুকে সাহায্য করবার আগেই তার হাত থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নিল স্নাইপার লোকটা, তারপর গড়িয়ে ছাদের কিনারা থেকে নীচে পড়ে গেল। পড়বার সময় আর্তনাদ করে উঠল সে। পতনটা শক্ত উঠানে হওয়ায় চিৎকার অকস্মাৎ থেমে গেল।

মন্দিরের ভিতর ফিরে এল রানা আর রঘু, তারপর সিঁড়ি বেয়ে নীচে নামল। চারপাশে প্রচুর লোক জড়ো হয়েছে, তাদের সঙ্গে নেপালি ভাষায় কথা বলল রঘু। নিজেদের পরিচয় দিল সাদা পোশাকে পুলিশ বলে, মাওবাদী গেরিলাদের ধাওয়া করে মন্দিরে ঢুকেছিল।

মন্দিরের বাইরে এসে ওরা দেখল স্নাইপার লোকটা পাকা রাস্তার উপর মাথা দিয়ে পড়েছে। পড়বার সঙ্গে সঙ্গে ঘাড় ভেঙে গেছে তার।

তাকে পরীক্ষা ও সার্চ করল রঘু। 'স্থানীয় লোক, ভাইয়া। গুলি করে মানুষ মারার অভিজ্ঞতা খুব একটা ছিল বলে মনে হয় না।'

'জিএম এদিকে নতুন, তাই বোধহয় দক্ষ লোক খুঁজে পায়নি।'

'গুলি কিন্তু আপনাকেই করা হয়েছে, ভাইয়া।'

'ওরা জানল কীভাবে এই রাস্তা দিয়ে ফিরব আমরা?'

'কেউ একজন আমাদেরকে ফলো করেছে,' বলল রঘু। স্নাইপারের পকেট থেকে পাওয়া মোবাইলটা দেখাল রানাকে। 'আমার ধারণা, আপনাকে সরাবার জন্যে এরকম মোবাইল আর স্নাইপার আরও অনেক রাস্তাতেই রাখা হয়েছে।'

তার হাত থেকে মোবাইলটা নিয়ে রানা এজেন্সির কাঠমাণ্ডু শাখার সঙ্গে যোগাযোগ করল রানা। কী ঘটেছে তার সংক্ষিপ্ত একটা বর্ণনা দিয়ে অনন্ত মিশ্রর সহকারীকে বলল, 'সিকিউরিটির স্বার্থে মিশ্রর লাশের কাছে আমি যাচ্ছি না। নিয়ম ধরে ওর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার ব্যবস্থা করবে তোমরা। ওর পরিবারের সঙ্গে পরে আমি যোগাযোগ করব।'

'ভাইয়া, পুলিশ এসে পড়ার আগেই আমাদের কেটে পড়া উচিত,' বলে রানাকে নিয়ে ভিড়ের ভিতর দিয়ে ছুটল রঘু।

'অলটিচ্যুড সিকনেস এড়াবার একমাত্র উপায় হলো পরিবেশ আর আবহাওয়ার সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেয়ার জন্যে শরীরটাকে যথেষ্ট সময় দেয়া,' বলল মন্টি বেলফোর। 'আর সেজন্যেই অন্তত এক হপ্তা বেস ক্যাম্পে থাকতে হবে আমাদের।' কাঞ্চনজঙ্ঘার একপাশের একটা ম্যাপের ভাঁজ খুলল সে।

ওদের হোটেল তাজমহলের কনফারেন্সরুম এটা। সময় সন্ধ্যা সাড়ে সাতটা। টিমের সব সদস্য এখনও এসে পৌঁছায়নি। বেলফোর বসেছে রানা আর রঘুর মাঝখানে।

'উত্তর মুখে পাঁচটা ক্যাম্প সেট করব আমরা। ক্যাম্প ওয়ান থাকবে এখানে, সাড়ে পাঁচ হাজার মিটারে। ক্যাম্প টু ছ'হাজার মিটারে। ছ'হাজার ছ'শো মিটারে আমরা যখন ক্যাম্প থ্রিতে পৌঁছাব, অ্যাক্লাইমাটাইজ-এর জন্যে আরও এক হপ্তা আলাদা করে রাখতে হবে।

'আমাদের মধ্যে এমন কেউ থাকতে পারে, ক্যাম্প ফোরে আগের মত দ্রুত উঠতে পারবে না; সাত হাজার তিনশো মিটারে থাকবে ওটা। ক্যাম্প ফাইভ–সাত হাজার নয়শো মিটার। বিধ্বস্ত প্লেনের পাশেই। আমাদের ভাগ্য নেহাতই ভাল যে তুলনায় সমতল জায়গাতেই পড়েছে প্লেনটা। জায়গাটার নাম গ্রেট সিক্রি টেরেস। ওখান থেকে চূড়া দু'হাজার ফুটও নয়।'

কথা শেষ করে চেয়ারে হেলান দিয়ে রানার দিকে তাকাল বেলফোর।

রানার ভুরু জোড়া একটু কুঁচকে রয়েছে।। 'বড় বেশি অ্যামবিশাস শেডিউল মনে হচ্ছে।'

বেলফোরের জবাব: 'আমি একমত। এ-কথা আমি একবারও বলিনি যে এটা একটা পিকনিক। নিজেদের সবটুকু শক্তি আর সামর্থ্য কাজে লাগাতে হবে, তবেই যদি সফল হই।'

'সব মিলিয়ে কতদিনের মিশন?'

'এক মাসের কিছু বেশি। মে মাসের শেষ দিকে আবহাওয়া আনপ্রেডিক্টেবল হয়ে উঠবে। ঝড়ের মধ্যে তো পড়বই, কারণ বর্ষা মরশুম ঘনিয়ে আসবে। স্রেফ সময়ের সঙ্গে পাল্লা দিতে যাচ্ছি আমরা।'

'তোমার মিশনের লক্ষ্যটা কী?' জানতে চাইল রানা।

বিস্মিত দেখাল বেলফোরকে। 'কেন, তুমি জানো না?'

কথা না বলে মাথা নাড়ল রানা।

'ফর্মুলাটা উদ্ধার করে ব্রিটেনে নিয়ে যাব আমি,' বলল বেলফোর। 'ব্রিটিশ সরকার সেই দায়িত্ব দিয়েই আমাকে পাঠিয়েছে।'

'ব্রিটিশ সরকার এরকম একটা দায়িত্ব দেয়ার কে?' জিজ্ঞেস করল রানা। 'ওটার মালিক তো বাংলাদেশ।'

'তুমি ভুলে যাচ্ছ, রানা, ডক্টর সাজিদুল হকের সঙ্গে সিডিআর এফ-এর একটা চুক্তি হয়েছিল...'

'সেই চুক্তিতেই লেখা আছে, ফর্মুলাটার স্বত্ব বাংলাদেশ পাবে।' রানা এতটাই গম্ভীর, ওর শুধু ঠোঁট নড়ছে।

'আচ্ছা, রানা, এ-কথা কী একবারও ভেবে দেখেছ, এরকম একটা আবিষ্কার নিয়ে কী করবে বাংলাদেশ? তোমরা তো আগামী এক-দেড়শো বছরেও প্লেন তৈরি করতে পারবে না, তা হলে প্লেনের গতি বাড়াবার কৌশল কী কাজে লাগবে তোমাদের বলতে পারো?'

'সেটা আমাদের ব্যাপার।'

'আমি বলে দিচ্ছি। গরীব মানুষের পেটে দু'মুঠো ভাত দেয়ার কথা বলে জিনিসটা তোমরা মোটা টাকায় বেচে দেবে। বেচে টাকাটা কিছু লোক ভাগ করে নেবে। বেশ তো, আমরাই না হয় কিনে নেব...'

'এমনও তো হতে পারে যে এটা আমরা একজনের কাছে নয়, কম দামে সবার কাছে বেচলাম?'

'আচ্ছা, সে দেখা যাবে, আগে পাও তো,' তাচ্ছিল্যের সুরে বলল বেলফোর।

'ফর্মুলা উদ্ধারের মিশন নিয়ে কাঞ্চনজঙ্ঘায় উঠতে যাচ্ছ, ভাল কথা। তুমি জানো ওটা কোথায়, কার কাছে আছে?' জিজ্ঞেস করল রানা।

হঠাৎ ম্লান দেখাল বেলফোরকে: 'কার কাছে, কোথায়?'

মুচকি হেসে মাথা নাড়ল রানা। 'এটা টপ সিক্রেট ইনফরমেশন, মন্টি। কাউকে বলা যাবে না।'

'ওই যে, চীনা লোকটা–তিয়েন চাও–তার কাছে আছে, তাই না? প্রশ্ন হলো, প্লেনটা যখন অ্যাক্সিডেন্ট করে তখন কোথায় সেটা লুকানো ছিল। তুমি বলবে না–না বললে। ওখানে পৌঁছাতে পারলে খুঁজে নেয়া আমার জন্যে কোন সমস্যা হবে না।'

'হ্যাঁ, তাই নিয়ো।' রানা নির্লিপ্ত।

হঠাৎ ওর দিকে ঝুঁকে ফিসফিস করল বেলফোর, 'শুনলাম দরবার স্কয়ারে এক নেপালি খুন হয়েছে। খুনীও একজন নেপালি। সেও মারা গেছে। পুলিশ বলছে, স্থানীয় এক লোকের সঙ্গে একজন বিদেশীকে ছুটে পালাতে দেখা গেছে। বিদেশীটার হাতে নাকি পিস্তল ছিল। এ-ব্যাপারে তুমি কিছু জনো, রানা?'

'আল্লাহ্, না তো!' মিথ্যে কথা বলল রানা।

কনফারেন্সরুমে বাকি সবাই ইতোমধ্যে হাজির হয়েছে। সব মিলিয়ে আঠারোজন। এর আগে বেশ কয়েকবার পাহাড়ে চড়বার জন্য নেপালে এসেছে বেলফোর, ফলে প্রায় সবার সঙ্গে তার পরিচয় আছে। হাবভাবে বোঝা গেল, তারা পছন্দও করে তাকে।

নেপালি লিয়েইজন অফিসার সূত্রধর সাব্যস্ত ওদেরকে ব্রিফ করতে শুরু করলেন।

'সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো,' বললেন তিনি, 'আপনারা কেউ কাঞ্চনজঙ্ঘার চূড়ায় উঠবেন না। আমাদের জনগণের কাছে এই পাহাড় অত্যন্ত পবিত্র। উদ্ধার কাজের জন্যে যতটুকু প্রয়োজন শুধু ততটুকু উঠবেন, কিন্তু তার বেশি অবশ্যই নয়।' এরপর হাসি মুখে বললেন, 'ওখানে যে দেবতারা আছেন, তাদেরকে হয়তো খেপিয়ে তোলা হবে।'

'ধন্যবাদ, মিস্টার সাব্যস্ত,' চেয়ার ছেড়ে বলল বেলফোর। কেউ তাকে দায়িত্ব দেয়নি, সে নিজেই সবার সঙ্গে রানার পরিচয় করিয়ে দিচ্ছে। মিস্টার প্রধানের পাশে উনি মিস্টার কার্তিক সুলক্ষণ; তাঁর সঙ্গে আমি আগেও পর্বতে চড়েছি। উনি অত্যন্ত বিচক্ষণ সর্দার।'

সর্দার কার্তিক সুলক্ষণ হাসি মুখে হাত নাড়ল। সুলক্ষণকে দেখে যোগ্য লোক বলেই মনে হলো রানার। সর্দার বা শেরপার ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সেই তো

ট্রেকিং লিডার। সবাই যখন পাহাড়ে উঠবে, সে সামলাবে বেস ক্যাম্প।

'এবার আমি আমার দেখা সবচেয়ে সুন্দর মানুষটার সঙ্গে তোমার পরিচয় করিয়ে দিতে চাই!' রানাকে বলল বেলফোর। 'তিনি ভারতীয়, নাম ডক্টর ললিতা লাবণ্য।'

লালচে হয়ে ওঠা মুখ নিয়ে চেয়ার ছাড়ল ডাক্তার লাবণ্য, রানার ছোট্ট করে মাথা ঝাঁকানোর উত্তরে ক্ষীণ একটু হাসল। রানাকে স্বীকার করতে হলো, বেলফোর কিছু বাড়িয়ে বলেনি।

'হ্যালো, এভরিবডি,' বলল লাবণ্য। 'মিস্টার বেলফোর আর মিস্টার রঘুবীর ছাড়া বাকি সবার কাছে আমি নতুন। আগামী কয়েক হপ্তার জন্যে আপনাদের সবার ডাক্তার আমি, তাই দু'একটা কথা এখনই বলে রাখতে চাই।

'শেডিউল খুব বেশি টাইট; তাই এর আগে যে যত দ্রুতই উঠে থাকি না কেন, তারচেয়েও বেশি দ্রুত উঠতে হবে আমাদের। বর্ষা শুরু হওয়া চলবে না, তার আগেই পাহাড় ছেড়ে নেমে আসতে হবে। তা সত্ত্বেও অ্যাকিউট মাউন্টিন সিকনেস-এর লক্ষণ সম্পর্কে সজাগ থাকতে হবে সবাইকে। যখন-তখন যে-কাউকে আক্রমণ করতে পারে। প্রত্যেকের কাজ হবে টিমমেটের মধ্যে লক্ষণের খোঁজ করা, কারণ অনেক সময় ভিক্টিম নিজে সেগুলো চিনতে পারে না।

'প্রতিবার শ্বাস গ্রহণের সময় আপনি যতটা অক্সিজেন নেন, পাঁচ হাজার মিটারের ওপরে সেটার পরিমাণ কমে অর্ধেক হয়ে যায়। অসুস্থতার প্রাথমিক লক্ষণ হলো–বিষণ্ণতা, খাবারে অরুচি, তারপর মাথাব্যথা। এরপর দুর্বলতা বাড়বে, ওপরে উঠতে ইচ্ছে করবে না। নড়াচড়া করতে অনিচ্ছা, বমি বমি ভাব, ঘোর লাগা, ঝিমুনি ইত্যাদি শুরু হলে ধরে নিতে হবে আপনার এএমএস হয়েছে।'

এ-সব রানা জানে, তারপরও ডাক্তার লাবণ্যের সুরেলা কণ্ঠস্বর শুনতে ভালই লাগছে।

আরও প্রায় দশ মিনিট একনাগাড়ে বলে গেল ডাক্তার লাবণ্য। সবই কাজের কথা–কী হলে কী করতে হবে, কোন্ কোন্ ওষুধ ব্যবহার করা নিষেধ, অনিয়ম করলে মাশুল হিসাবে প্রাণ হারাতেও হতে পারে। সবশেষে জানাল, 'টিমের সবার স্বাস্থ্য পরীক্ষা করব আমি। এটা রুটিন।'

আবার চেয়ার ছাড়ল বেলফোর। এবার সে একজন নেপালি পাবলিক রিলেশন্স অফিসারের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিল। তাপলেজাং-এ পৌঁছে শেরপা পোর্টার ভাড়া করবার সময় সর্দারকে সাহায্য করবে সে। টিম ক্যাম্প ফাইভে বা প্লেনের কাছে পৌঁছালে বোঝা বহন করবার জন্য আরও ক্লাইম্বার লাগবে, তাদেরকেও ওখান থেকে সংগ্রহ করা হবে।

ইকুইপমেন্ট ম্যানেজার ফরাসী, নামকরা মাউন্টিনিয়ার। বন্ধুমহলে তার সম্পর্কে প্রশংসা শুনেছে রানা। বেলফোরকে বাদ দিলে, টিমের মধ্যে সে-ই সবচেয়ে অভিজ্ঞ মাউন্টিনিয়ার। মানুষটা ছোটখাট, তবে কাঁধ দুটো অস্বাভাবিক চওড়া। মাথায় একটা চুলও নেই।

'টিমে আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু হলো,' বলল বেলফোর, 'টমাস পারকার আর বব মার্লো–দুই গাইড। ওরা দ্বিতীয় সারিতে বসে আছে।'

পারকার লম্বা, একহারা; চোখে মোটা লেন্সের চশমা। মার্লো শক্ত-সমর্থ, দাড়ি-গোঁফ নিখুঁতভাবে কামানো, চেহারায় কোন ভাব বা ভাষা নেই।

এরপর প্রায় একটা বোমা ফাটাল বেলফোর: 'আমার তিন বন্ধু আমেরিকার প্রতিনিধিত্ব করছে, এবার তাদের সঙ্গে সবার পরিচয় করিয়ে দিই...'

'এই, থামো,' বাধা দিল রানা। 'এর মধ্যে আমেরিকানরা আবার কোত্থেকে এল?'

'জবাবটা তুমি এক সময় মিস্টার সূত্রধর সাব্যস্তর কাছ থেকে জেনে নিয়ো। এদেরও লাশ রয়েছে প্লেনে...' বলল বেলফোর।

'আমি এখনই এর ব্যাখ্যা চাই,' বলল রানা, তাকিয়ে আছে সূত্রধর সাব্যস্তর দিকে। 'আমাদেরকে বলা হয়েছিল...'

'জানি, মিস্টার রানা, কী বলা হয়েছিল জানি,' চেয়ার ছেড়ে সবিনয়ে বলল সূত্রধর সাব্যস্ত। 'কিন্তু পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে দুটোর জায়গায় তিনটে গ্রুপকে নিয়ে একটা টিম গঠন করতে বাধ্য হয়েছি আমরা। সত্যি দুঃখিত।'

রানার মাথা একরকম ঘুরছেই বলা যায়। ভাবছে, এতগুলো লোকের সঙ্গে ও একা কতক্ষণই বা টিকবে, কী-ই বা করতে পারবে। তারচেয়ে এই অ্যাসাইনমেন্ট বাদ দিয়ে দেশে ফিরে যাওয়াই বোধহয় ভাল।

বস্ বলবেন, ভয় পেয়ে পালিয়ে এলে?

দেশ স্কিন-সেভেনটিন থেকে বঞ্চিত হবে।

আর ওর বিবেক ওকে কোনদিন ক্ষমা করতে পারবে না।

'পরিবর্তিত পরিস্থিতির অজুহাত দেখাচ্ছেন,' বলল রানা। 'কিন্তু সেটা আগে ব্যাখ্যা করতে কী হয়েছিল? এভাবে শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত চেপে রাখলেন কেন?'

একটা ঢোক গিলে আড়চোখে একবার বেলফোরের দিকে তাকাল সূত্রধর সাব্যস্ত, তারপর বলল, 'এর জন্যে সরকারী নীতি দায়ী, মিস্টার রানা। সরকারের পক্ষ থেকে আরেকবার দুঃখ প্রকাশ করছি আমি।'

এরপর তিন আমেরিকানের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিল বেলফোর। তারা চেয়ার ছেড়ে দাঁড়িয়ে হ্যালো বলল। তিনজনের একজনকে দেখে অত্যন্ত অল্প বয়েসী মনে হলো, বোধহয় বিশ-একুশের বেশি হবে না। বেলফোর তাকে 'খোকা' বলে ডাকল।

এরপর আরও তিনজন শ্বেতাঙ্গ। বেলফোর পরিচয় করিয়ে দেওয়ার সময় এদেরকে 'হলার' বলল, নেপাল সরকারের কর্মচারী। এদের মধ্যে দু'জন পরিচিত ব্রিটিশ মাউন্টিনিয়ার। তৃতীয়জনের নাম সার্ডিক লঙ্গিনাস।

তার ব্যাপারটা বেলফোর এভাবে ব্যাখ্যা করল, 'মিস্টার লঙ্গিনাস শেষ মুহূর্তের রিপ্লেসমেন্ট। মিস্টার টিম অ্যামব্রোজ মারাত্মক অ্যাক্সিডেন্ট করে হাসপাতালে মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছেন। মিস্টার সার্ডিক লঙ্গিনাস জার্মান মাউন্টিনিয়ার, স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে টিমে যোগ দিয়েছেন।'

রানা ভাবছে, এতগুলো লোকের মধ্যে জিএম-এর প্রতিনিধি কে হতে পারে? রঘুর দিকে ঝুঁকে ফিসফিস করল ও। 'রিপ্লেসমেন্টকে কখনও বিশ্বাস করতে নেই। ওই লোকটার ওপর নজর রাখতে হবে।'

রানা তাকে এতটা বিশ্বাস করছে দেখে প্রথমে একটু ভ্যাবাচাকা খেয়ে গেল রঘু, তারপর কেমন অদ্ভুত দৃষ্টিতে রানার দিকে আড়চোখে তাকাল।

'সবশেষে আমাদের কমিউনিকেশন অফিসার,' বলল বেলফোর। 'ডুনো কারমেল।' কারমেল দাঁড়াল সেই সঙ্গে সবার চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল উপস্থিত সবার চেয়ে আকার-আকৃতিতে বড় সে। 'ধন্যবাদ,' তার ইংরেজিতে ডাচ টান স্পষ্ট। 'আমি চ্যালেঞ্জ অনুভব করছি। আমার ভাল লাগছে।' মুখ ভরা হাসি নিয়ে বসে পড়ল সে।

'আর মাত্র একটা বিষয় সবাইকে জানানো দরকার,' বলল বেলফোর। 'কাঞ্চনজঙ্ঘায় আরও তিনটে টিম উঠছে।'

দুটোর কথা জানে রানা। তৃতীয়টা সম্ভবত দু'একদিনের মধ্যে আবেদন করেছে।

'অনেক সময় দাতাগোষ্ঠীর চাপ থাকে, অনিচ্ছাসত্ত্বেও অন্যায় অনুরোধ রক্ষা করতে হয়,' নিচু গলায় বললেন সূত্রধর সাব্যস্ত। 'ব্রিটেনের একদিন পর বাংলাদেশ পাহাড়ে চড়ার আবেদন জমা দিয়েছে। সেই একই দিন আমেরিকা আর ইজরায়েলও জমা দেয়। পরদিন অ্যাপ্লাই করে রাশিয়া।

'ইজরায়েলও উত্তর মুখ ধরে উঠছে, তবে আপনাদের খানিক দক্ষিণে রয়েছে ওরা। না বলে পারছি না, অত্যন্ত কঠিন একটা পথ বেছে নিয়েছে। রাশিয়ানরাও উত্তর মুখ ধরে উঠছে, তবে এই পর্যায়ে এখনও আমরা জানি না তাদের রুটটা কী। এই দুই দল সিকিমের দিক থেকে চড়ছে, তাই নেপাল সরকারের কাছ থেকে অনুমতি চাওয়ার দরকার হয়নি।

'তবে গতকাল একটা ইটালিয়ান টিম পারমিট চেয়ে আবেদন করেছে। আমি যতটুকু জানি, আজ সেটা মঞ্জুর করা হয়েছে।'

আবার বেলফোরের গলা শোনা গেল। 'কেউ যদি কিছু জিজ্ঞেস করতে চায়, করতে পারে।'

সার্ডিক লঙ্গিনাস, নতুন লোক, হাত তুলল।

'বলুন, মিস্টার লঙ্গিনাস।'

'আমরা উত্তর মুখ ধরে উঠছি কেন? ওদিকটা তো খুব কঠিন পথ।' লোকটার উচ্চারণে জার্মান টান স্পষ্ট।

'ঘটনাচক্রে এটাই হলো প্লেনটার কাছে পৌঁছাবার ডিরেক্ট রুট।'

'আরও একটা কারণ আছে,' বেলফোর থামতে সূত্রধর সাব্যস্ত বলল। 'পাহাড়ের উত্তর, পশ্চিম আর দক্ষিণ-পশ্চিম দিকটা নেপালের দিকে পড়েছে। অন্য দিক থেকে উঠতে হলে সিকিম সরকারের কাছ থেকে অনুমতি নিতে হয়। তবে উত্তর দিকটাই বেশি নিরাপদ বিবেচনা করা হয়। মৃত্যুর ঘটনা প্রতি বছরই ঘটছে, তবে অন্যান্য দিকের তুলনায় বেশ কম।'

সন্তুষ্ট হয়ে হাত নামিয়ে নিল সার্ডিক লঙ্গিনাস।

মীটিং শেষ হবার পর সবাই এক সঙ্গে ডিনার খেতে বসল ওরা। মীটিং চলবার সময় খেয়াল করেছে রানা, ডিনারে বসেও দেখল ডাক্তার লাবণ্যের সঙ্গে হাসি-ঠাট্টা আর ফিসফাস করছে বেলফোর। দু'জনের সম্পর্কটা কতটুকু ঘনিষ্ঠ

ঠিক বোঝা যাচ্ছে না।

'রঘু,' চেয়ার ছেড়ে দাঁড়াল রানা, 'শোনো। আমি যদি এক মিনিটের মধ্যে না ফিরি, আমাকে ছাড়াই তোমাকে ডিনার খেতে হবে।'

ধীর পায়ে কয়েকটা টেবিলকে পাশ কাটিয়ে এল রানা। বেলফোরকে আশপাশে কোথাও দেখা যাচ্ছে না, সম্ভবত মেন'স-রুমে ঢুকেছে। ডাক্তার লাবণ্যের টেবিলের সামনে থেমে ডান হাতটা লম্বা করল ও: 'হ্যালো। ভাবলাম পরিচয়টা প্রপারলি হওয়া উচিত, তাই চলে এলাম।'

আন্তরিক হেসে হাতটা ধরল ডাক্তার লাবণ্য। 'একসঙ্গে কাজ করার সুযোগ পেয়ে আমি খুশি, মিস্টার রানা। সময়টা আশা করি ভালই কাটবে।'

'ভাল কাটলে তো ভালই,' বলল রানা।

'নেতিবাচক মনোভাব নিয়ে এত ওপরে উঠতে চান, মিস্টার রানা?' সকৌতুকে জানতে চাইল ডাক্তার লাবণ্য।

'আরে, না। তার প্রমাণ, এই দেখুন, আপনাকে আমি ডিনার খাওয়ার আমন্ত্রণ জানাচ্ছি।'

মাথা নাড়ল ডাক্তার লাবণ্য। 'আমি আগেই মন্টিকে কথা দিয়েছি। হয়তো অন্য কোন দিন, কেমন?'

ফিরে এসে রঘুকে মুখ লুকিয়ে হাসতে দেখে রানা বলল, 'দেখো, এভাবে হাসলে মুখটা ফেটে স্রেফ দু'টুকরো হয়ে যাবে, বুঝলে।'

'না, মানে, ভাইয়া, বলছিলাম কী–আপনার ঠিক এই মেয়ের সঙ্গে বনবে না। খানু পারাইয়ু,' বলল সে, মানে হলো–খেতে বসবার সময় হয়েছে।

ওদের টেবিলে এসে যোগ দিল ডুনো কারমেলও। নেপালে 'গলভাত' শব্দ দুটো খুব প্রচলিত। শুধু ডাল দিয়েই তৈরি করা হয়েছে ছয়টা আইটেম। কাদার মত ঘন মুগ ডাল থেকে বেরুল আস্ত মুরগী। মশুর ডালের বড়ার ভিতর সুস্বাদু গলদা চিংড়ি। পাঁচ রকম ডাল সহযোগে ভেজিটেবল সুপ। বাংলাদেশী মাছ বলে ভেটকিও পরিবেশন করা হলো।

ডিনার শেষ করে কফি খাবার সময় ডুনো কারমেল, টিমের কমিউনিকেশন অফিসার, রানাকে প্রায় চমকে দিয়ে এভাবে আলাপ শুরু করল: 'তো বলেন, মিস্টার রানা, আপনার গপ্পোটা কী? এই অভিযানে কী উদ্দেশ্য নিয়ে যাচ্ছেন আপনি?'

'এক কথায়, আমি বাংলাদেশের স্বার্থ দেখতে যাচ্ছি,' বলল রানা। 'প্লেনটায় বাংলাদেশের একটা জিনিস থাকতে পারে, পেলে উদ্ধার করে নিয়ে আসব। এবার আমার একটা প্রশ্নের জবাব দিন আপনি। কী কী ইকুইপমেন্ট সঙ্গে করে নিয়ে যাচ্ছেন আপনি?'

'আহ্! আমার কাছে আপনি সব সময় স্টেট অভ দা আর্ট ইকুইপমেন্ট পাবেন,' বলল কারমেল। 'আপনার জ্ঞাতার্থে জানাচ্ছি, স্যাটেলাইট লিঙ্কআপ-এর ডিজাইন করতে আমি সাহায্য করেছি। অবিশ্বাস্য হালকা একটা ল্যাপটপ কমপিউটার আছে, ওই লিঙ্কআপের সঙ্গে জোড়া লাগানো–ওটা বেস ক্যাম্পে রাখা হবে।

'সেলুলার ফোনের মাধ্যমে টিমের প্রতিটি মেম্বার পরস্পরের সঙ্গে তো বটেই,

বাইরের দুনিয়ার সঙ্গেও যোগাযোগ রাখতে পারবে। ইন্টারনেট আর ফ্যাক্স সুবিধেও পাওয়া যাবে।'

'ফ্যাক্সের কথা যখন বললেন, ঢাকায় একটা জিনিস পাঠাতে চাই,' বলল রানা। 'এই মুহূর্তে সঙ্গে কিছু আছে নাকি–?'

কোটের পকেট থেকে লেদার মোড়া একটা পামটপ কমপিউটার বের করল কারমেল। 'কী পাঠাতে চান বলুন।'

অভিযান আর টিম সদস্যদের সম্পর্কে তথ্য সমৃদ্ধ নিজস্ব একটা ফোল্ডার খুলল রানা। সার্ডিক লঙ্গিনাস-এর ফটোর নীচে খসখস করে কিছু লিখল, তারপর সেটা ডাচ কারমেলের হাতে ধরিয়ে দিল। কারমেল কমপিউটার অন করল। রানার লেখা ফোন নম্বরটা দেখল সে। তারপর মেশিনের ভিতর ঢুকিয়ে দিল ফটোটা।

'এতেই কাজ হবে, মিস্টার রানা,' বলে হাসল কারমেল।

'ধন্যবাদ। উত্তর পেলে আমাকে জানাতে ভুলবেন না যেন। আর মিস্টার বলার দরকার নেই, কারমেল।'

বেলফোর আর ডাক্তার লাবণ্য ডাইনিংরুমে ফিরে এল আবার। ডিনারের পর কাপড় পাল্টাতে গিয়েছিল লাবণ্য। রানা দেখল, ঝলমলে একটা দামী কাতান শাড়ি পরে ফিরে এসেছে মেয়েটা। বেলফোর তার হাত ধরে আছে। পাশ কাটাবার সময় ওদের টেবিলের সামনে থামল দু'জন।

হেসে উঠে ডাক্তার লাবণ্য রানাকে বলল, 'ছ'হপ্তা নরক বাস করতে যাবার আগে সৌখিন মহিলা হবার এটাই বোধহয় শেষ সুযোগ আমার, তাই না?'

'কী, রানা, তুমি অস্বীকার করো–অপরূপ লাগছে না ওকে?' একটা চোখ টিপে জিজ্ঞেস করল বেলফোর, গর্বে বুকটা যেন ফুলে উঠেছে।

'হ্যাঁ, অবশ্যই,' মৃদু কণ্ঠে বলল রানা। 'তবে তোমাকে কি ওঁর পাশে মানিয়েছে?'

শুনতে না পাওয়ার ভান করে ডাক্তার লাবণ্যকে নিয়ে চলে গেল বেলফোর। তবে মেয়েটার বিস্মিত ভাবটুকু ওর চোখ এড়াল না।

আসলে সঙ্গত কোন কারণ নেই, অথচ তারপরও ঈর্ষার ক্ষীণ একটু জ্বালা অনুভব করছে রানা।

বারো

কাঠমাণ্ডুতে এরপর আর তেমন কিছু ঘটল না। স্থানীয় পুলিশ অনন্ত মিশ্র আর স্নাইপারের মৃত্যুর মধ্যে কোন যোগসূত্র খুঁজে পায়নি। স্নাইপার লোকটা আদৌ জিএম-এর লোক ছিল কিনা তাও জানা যায়নি। বাকি দিনগুলো নিয়মিত শরীর চর্চা আর অভিযানের জন্য সাপ্লাই সংগ্রহ করে কাটিয়ে দিল ওরা।

টিম মিটিঙের পরদিন সকালে অবশ্য ইন্টারেস্টিং একটা ব্যাপার ঘটল বটে।

অভিযানের প্রতিটি সদস্যকে ডাক্তার লাবণ্যের দ্বারা অনুষ্ঠিত ফিজিক্যাল এগজামিনেশনে অংশ নিতে হলো। নির্দিষ্ট সময়ে হোটেলের একটা স্যুইটে তার সঙ্গে দেখা করল রানা। এখানে সম্পূর্ণ নতুন একটা রূপ দেখা গেল মেয়েটার –যাকে বলে কুল, ক্লিনিক্যাল অ্যান্ড অবজেক্টিভ। একজন ডাক্তারের যেমনটি হওয়া চাই।

তবে আবার একই সঙ্গে রানার শরীর দেখে একটু বেশি অস্বস্তির মধ্যে পড়ে গেল সে। টিপে-টুপে ওর পেশী পরীক্ষা করল, রিফ্লেক্স টেস্ট করল, সমস্ত ফাঁক-ফোকরে তল্লাশী চালাল। রানাকে ধরে নাড়াচাড়া করবার সময় মোটেও নরম হাত ব্যবহার করা হলো না। এখানে খোঁচা মারে তো ওখানে টিপে ধরে। সম্ভবত, ভাবল রানা, মেয়েটা সকল অর্থেই শরীর সর্বস্ব।

'এ কী গো!' একেবারে কোলকাতার বাংলায় বিস্ময় প্রকাশ করল লাবণ্য, 'আপনার শরীরটা কী যুদ্ধের ময়দান, কুরুক্ষেত্র? কী সব্বোনাশ, এত কেন কাটাকুটি!' ওর নগ্ন শরীরের উপর থেকে চোখ ফেরাতে পারছে না ডাক্তার; সে চেষ্টাও অবশ্য করছে না। 'বাংলাদেশের ফরেন অফিসে আছেন, তাই না?'

'হ্যাঁ।'

'ফরেন অফিসের কারও শরীরে এত কেন গুলি লাগবে? অস্বীকার করবেন না, বুলেটের শুকনো ক্ষত আমি চিনি।'

'তা চিনতে পারেন, তবে এক্ষেত্রে আপনার ভুলও হতে পারে,' বলল রানা। 'আমি আসলে নানা ধরনের আউটডোর স্পোর্টসে অংশ নিই। প্রায়ই আহত হতে হয়।'

'বুঝলাম সত্যি কথা বলছেন না,' বলল ডাক্তার লাবণ্য। 'আপনি আসলে কোন ধরনের পুলিশ, তাই না? দুঃখিত, এটার উত্তর আপনার না দিলেও চলবে।' রানা দিল না। টেবিলের দিকে ঘুরে গিয়ে হাতে গ্লাভস পরল সে। 'ঠিক আছে, মশাই, আসুন দেখা যাক আপনার প্রস্টেট কেমন আছে।'

এই পরীক্ষাটাও নরম হাতে হলো না।

দুটো ছোট প্লেনে করে পুব নেপালের একটা এয়ারস্ট্রিপে নামল টিমটা, কাছেই ছোটখাট তাপলেজাং গ্রাম। সী লেভেল থেকে কাঠমাণ্ডু তেরোশো মিটার উপরে, তাপলেজাং আরও সাতশো মিটার বেশি উঁচু। গ্রামে শুধু ট্রেকার বা অভিযাত্রীদের জন্য কুঁড়েঘর তৈরি করা আছে। রাতটা এখানে কাটিয়ে কাল তামুর খোলা উপত্যকায় নামা হবে প্রায় খাড়া ঢাল বেয়ে। নামবার আর উত্তরে যাওয়ার সংক্ষিপ্ত পথ এটা, বিকল্প পথ খুনজারি-র তুলনায়।

এখানকার দৃশ্য মনকে বিস্মিত আর আনন্দিত করে তোলে। হিমালয় কাঠমাণ্ডু থেকেও দেখা যায়, কিন্তু এত দূরে যে মনে হয় অন্য কোন দেশে। কিন্তু এখানে পর্বতপতি যেন সামনের ঢালটার পরই দাঁড়িয়ে আছে। উত্তর আর পুব আকাশ জুড়ে ছড়িয়ে আছে সাদায় মোড়া চূড়াগুলো, কয়েকটা হারিয়ে যাচ্ছে সাদা মেঘের ভিতর।

মেজর হোসেনের দেওয়া হাতঘড়ি, অ্যাভসেট ভারটেক আলপিন পরে আছে

রানা; উচ্চতা, সময়, ব্যারোমেট্রিক প্রেশার, আরোহণের গতি ইত্যাদি জানা যাবে।

আমেরিকানদের একজন হাওয়ার্ড ফিলবি জানাল তার মাথাব্যথা করছে। অলটিচ্যুড বদলই বোধহয় কারণ। শুনে তাকে পরীক্ষা করল ডাক্তার লাবণ্য, বলল, রাতে খুব ভাল ঘুম হওয়া চাই।

গায়ে গায়ে ঠেকানো একজোড়া কুঁড়েতে শুতে গেল বেলফোর আর ডাক্তার লাবণ্য। রঘু, একটু হয়তো রক্ষণশীল, বলল, 'বেলফোর সাহেবের ভাব দেখে মনে হয় ডাক্তারনী যেন তাঁর বিয়ে করা বউ।'

শুনে অনেকেই চাপা গলায় হেসে উঠল।

এক বৃদ্ধ দম্পতি ওদের খাবার ব্যবস্থা করেছেন। কয়েক রকম সবজি রান্না করা হয়েছে, আর ডাল-ভাত তো আছেই। রানার প্রশ্নের উত্তরে রঘু জানাল, বাঙালীদের মত নেপালিরাও সবজিকে সবজিই বলে।

খাওয়াদাওয়া শেষে রঘু বলল, 'শুভরাত্রি।'

'শুভরাত্রি।'

বাড়ির কর্ত্রীর ডাকে ঘুম ভাঙল রানা আর রঘুর। বয়স্কা মহিলার উপরই দায়িত্ব মন্দিরে গিয়ে পরিবারের জন্য প্রার্থনা করা আজকের দিনটা সবাই যাতে ভাল থাকে। রঘুর সঙ্গে মন্দিরের দরজা পর্যন্ত এল রানাও, তাকে পুজো দিতে দেখল।

ট্রেকিং ইকুইপমেন্ট নিয়ে শেরপা পোর্টাররা সকাল সকাল রওনা হয়ে গেল ফুরামবা-য় ক্যাম্প ফেলবার জন্য, টিমের বাকি সবাই ওখানে পৌঁছে যাতে লাঞ্চ সারতে পারে।

'বোঝা বহন করা অত্যন্ত কঠিন কাজ,' বলল রানা। 'কিন্তু শেরপারা সব সময় এত হাসিখুশি!'

'ওরকম হাসিখুশি আমাকেও দেখতেন একেকটা অভিযান থেকে যদি পরিবারের সারা বছরের খরচ উঠে আসত,' জবাব দিল রঘু।

সকাল আটটায় ব্রেকফাস্ট সেরে চার মাইল দূরের ফুরামবার উদ্দেশে রওনা হলো টিম, পথের বেশিরভাগটাই ঢাল বেয়ে নামতে হবে। বেস ক্যাম্পের পথে এটাই প্রথম বিরতি। দিনটা আজ খাটনির মধ্যেই কাটবে। সাধারণত ট্রেকাররা ফুরামবায় একটা রাত কাটায়, কিন্তু বেলফোরের পরামর্শে সূত্রধর সাব্যস্ত সিদ্ধান্ত নিয়েছে আজই চিরোতে পৌঁছাতে হবে–আরও চার মাইল হাঁটা পথ, তবে প্রায় সবটাই ঢাল বেয়ে উঠতে হবে।

সবার পিঠেই বোঝা আছে, পঞ্চাশ পাউন্ডের বেশি তো কম নয়। এখনও গরম কাপড় পরবার দরকার হচ্ছে না। রানা লাইটওয়েট আর উইন্ডপ্রুফ শার্ট, গাঢ় ডেনিম, মোটা স্মার্টউল সক, একজোড়া হাই-টপ বুট পরেছে। মেজর হোসেন ওকে আরও একজোড়া স্পোর্টস বুট দিয়েছেন, তবে ওগুলো তুষার আর বরফের রাজ্যে পৌঁছে পরবে বলে রেখে দিয়েছে। গ্রাম ছাড়বার আগে পানি ফোটানো হয়েছিল, টিমের সবাইকে একটা করে ক্যানটিন দিয়ে সাবধানে খরচ করতে বলা হয়েছে। চিরোর আগে আর কোথাও পানি পাওয়া যাবে না।

সকাল ন'টার দিকে রওনা হয়েছে ওরা। ডাক্তার লাবণ্যকে পাশে নিয়ে

দলটার মাথায় রয়েছে বেলফোর, ভাবটা যেন সেই মিশনের লিডার। রঘুকে নিয়ে সবার পিছনে রয়েছে রানা।

প্রাকৃতিক দৃশ্য শ্বাসরুদ্ধকর। বাদামী আর সবুজ রঙের ঢাল, চূড়া, আর তারপরই সামনের জগৎ আড়াল করা হিমালয়। পাহাড়ের গা কেটে বিশাল বিশাল ধাপ তৈরি করা হয়েছে, ধাপগুলো আসলে খেত; কিছু খেতে কৃষককে মোষ নিয়ে কাজ করতে দেখল ওরা, পরনে খাটো কুর্তা আর ধুতি। কিছু তরুণীকে দেখা গেল কাঁকালে কলস নিয়ে জল আনতে যাচ্ছে, বাহারী নকশা ছাপা শাড়ির সঙ্গে চোলি পরেছে সবাই। বিবাহিতাদের চেনা গেল সিঁথিতে টকটকে লাল সিঁদুর দেখে। লাল টিপ দেখা গেল সবার কপালেই।

'মিস্টিক সেন্সে,' রঘু ব্যাখ্যা করল, 'টিপ প্রতিনিধিত্ব করে আধ্যাত্মিক অন্তর্দৃষ্টি, অর্থাৎ তৃতীয় নয়নের।'

বেলা ঠিক একটায় ফুরামবায় পৌঁছাল ওরা। শেরপারা লাঞ্চ তৈরি করে রেখেছে, গোটা নেপালে জনপ্রিয় সেই ডাল-ভাত। শোনা গেল রাতে চাইনিজ খাবার দেওয়া হবে।

দু'ঘণ্টা বিশ্রাম নিয়ে চিরোর পথে রওনা হয়ে গেল টিম। কঠিন পথ, বেশিরভাগটাই উঠতে হলো ঢাল বেয়ে। চারঘণ্টার পথ পেরুতে প্রায় ছ'ঘণ্টা লেগে গেল ওদের। তবে ক্লান্তি হরণ করবার জন্য চোখের সামনে নিজের বিচিত্র জগৎ মেলে ধরে বসে আছেন বসুমতী।

এক জায়গায় এসে রানা দেখল পাহাড় চূড়ায় প্রাচীন একটা মন্দির দাঁড়িয়ে আছে, নিঃসঙ্গ পাথুরে মাটির পথ এঁকেবেঁকে উঠে গেছে সেদিকে। নীচে, রাস্তার পাশে, বুড়ো এক লোক হাতখানেক লম্বা একটা আখ নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ওদেরকে দেখে রেডিমেড হাসি উপহার দিয়ে ইঙ্গিতে কাছে ডাকল, সাহায্য বা ভিক্ষা চাইছে। একজন আমেরিকানকে দু'তিন রুপি দিতে দেখা গেল।

চিরোয় পৌঁছেও দেখা গেল মাতব্বরি ফলাবার অভ্যেসটা বেলফোর ত্যাগ করতে পারছে না। 'শেরপারা এক ঘণ্টার মধ্যে ডিনার রেডি করে ফেলবে,' জানাল সে। 'তবে সবাইকে জায়গা দেয়ার মত কুঁড়ে পাওয়া যাবে না। কিছু লোককে তাঁবু খাটাতে হবে।'

'আমি তাঁবুতে থাকব,' জানিয়ে দিল ডাক্তার লাবণ্য।

'উম্-ম্-ম্, তার আসলে কোন দরকার নেই,' বলল বেলফোর।

'কেন? আমি মেয়ে বলে বিশেষ সুবিধে পাওয়ার অধিকার রাখি? এ-সব বাদ দাও, মন্টি।'

রানা বুঝতে পারছে রাতটা তাঁবুতে থাকবার কোন ইচ্ছে বেলফোরের নেই, কারণটা যাই হোক। আচ্ছা, ডাক্তার লাবণ্য কী নিজেকে তার কাছ থেকে দূরে সরিয়ে আনবার চেষ্টা করছে?

'ঠিক আছে,' অগত্যা ব্যাপারটা মেনে নিয়ে বলল বেলফোর। 'তাঁবুতেই থাকব আমরা।'

'আসলে বলতে চাইছি, আজ রাতে আমি আমার নিজের তাঁবুতে থাকব—চিরকাল যেমন থেকেছি, একা।' তার প্রতিটি শব্দ টিমের সবাই পরিষ্কার

শুনতে পেল। বেলফোরকে ভীষণ বিব্রত দেখাল। কাল রাতে দু'জনের মধ্যে গুরুতর কিছু একটা না ঘটেই পারে না।

অপমানটা নীরবে হজম করল বেলফোর।

রঘুকে নিয়ে নিজেদের তাঁবু খাটাল রানা। ওদের তাঁবু প্রবল ঝড়ের মধ্যেও উড়ে যাবে না, আর পুরোপুরি সীল করে দিলে বাইরের হিম ঠাণ্ডা ভিতরে ঢুকতে পারবে না। রাতটা হয়ে উঠল আশ্চর্য জাদু। হাত বাড়ালেই ছোঁয়া যাবে লাখ লাখ তারা, এত কাছে সব। উজ্জ্বল ছায়াপথের দিকে অপলক তাকিয়ে থাকতে ইচ্ছে করে, পলকের জন্য দেখবার লোভ জাগে ঘোড়সওয়ার ফেরেশতা বা রথে বসা দেবতাদের।

ভরপেট চাইনিজ খেয়ে ক্যাম্পফায়ারের সামনে বসল সবাই। রাত একটু বাড়তে একজন-দু'জন করে শুতে চলে গেল।

প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিয়ে ফেরবার সময় ডাক্তার লাবণ্যের তাঁবুটা দেখতে পেল রানা। অন্যান্য সব তাঁবু থেকে কম করেও একশো ফুট দূরে সেটা। ভিতরে একটা অয়েল ল্যাম্প জ্বলছে, ক্যানভাসের গায়ে মেয়েটার শারীরিক কাঠামোর কিনারাগুলো স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে ও। পাশ কাটাবার সময়, খুব বেশি হলে পনেরো ফুট দূরত্ব, রানা দেখল তাঁবুর ফ্ল্যাপ খোলা রয়েছে। তাঁবুর মাঝখানে, কম্বলের উপর, পায়ের পাতায় নিতম্ব দিয়ে বসে আছে ডাক্তার। এখনও প্যান্ট পরে আছে, তবে সোয়েটার খুলে ফেলায় সাদা টি-শার্টটা দেখা যাচ্ছে। মুহূর্তের জন্য থামল রানা, আশা করছে অন্তত হাত নাড়বে একবার।

লাবণ্য ওকে দেখেনি। সে তার টি-শার্টের নীচেটা ধরে উপরে তুলল, মাথা দিয়ে গলিয়ে বের করে আনল গা থেকে। রানার দম আটকে এল। এমন সুগঠিত স্তন যে-কোন মেয়ের বিরাট একটা সম্পদ।

তাড়াতাড়ি ওখান থেকে সরে আসবে রানা, এই সময় ঘাড় ফেরাতে ওকে দেখে ফেলল লাবণ্য। চমকে উঠে নিজেকে আবৃত করল না, সবজান্তার একটা ভাব নিয়ে নিঃশব্দে শুধু তাকিয়ে থাকল সে। চোখ না সরিয়ে হাত বাড়াল, ফ্ল্যাপটা টেনে বন্ধ করে দিল ফাঁকটা।

এর মানেটা কী? ভাবছে রানা। লাবণ্য কি বেলফোরের বান্ধবী নয়? ভাব দেখে মনে হলো রানা তাকে টপলেস অবস্থায় দেখে ফেলায় সে কিছু মনে করেনি, বরং যেন আশা করছে বেপরোয়া হয়ে কিছু একটা করে বসবে রানা।

পা চালিয়ে নিজেদের তাঁবুর দিকে ফিরে আসছে, এই সময় রানা দেখল একটা পোর্টেবল টেবিলে কাজ করছে ডুনো কারমেল। সে বসেছে একটা কোলাপসিবল টুলে, সেটার উপর তার প্রকাণ্ড শরীর কৌতুককর কমিকস্-এর একটা চরিত্রের মত লাগছে। ল্যাপটপে টাইপ করতে ব্যস্ত, সেটা একটা মাইক্রোকম-এম গ্লোবাল স্যাটেলাইট টেলিফোনের সঙ্গে জোড়া লাগানো।

'ফেলে আসা সভ্যতার খবর সব ভাল তো?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'আহ্, হ্যালো,' বলল কারমেল। 'এই ডিভাইসের কোন তুলনা হয় না, বুঝলেন। স্যাটেলাইটের মাধ্যমে এই মাত্র আমি আমার গার্লফ্রেন্ডের সঙ্গে কথা বললাম।'

'কোথায় তিনি?'

'জার্মানীর মিউনিকে,' বলল কারমেল। 'আপনি আসায় ভাল হয়েছে। এই খানিক আগে আপনার একটা মেসেজ পেয়েছি।'

কয়েকটা বোতামে চাপ দিয়ে একটা ই-মেইল নিয়ে এল স্ক্রিনে, কোডে লেখা। 'এর বিন্দু-বিসর্গ কিছুই আমি বুঝতে পারিনি, তবে আপনি নিশ্চয় পারবেন।'

ঝুঁকে মনিটরের দিকে ভাল করে তাকাল রানা। বিসিআই-এর নিজস্ব কোড, বহুবার ভাষান্তর করেছে ও। ছোট্ট মেসেজ, পড়ে অর্থ বের করতে খুব বেশি সময় লাগল না। 'ধন্যবাদ। আপনি ওটা মুছে ফেলতে পারেন।'

কাঁধ ঝাঁকিয়ে কারমেল বলল, 'আশা করি কোন খারাপ খবর নয়।'

'খারাপ ভাল মিলিয়ে,' বলল রানা। 'গুড নাইট।'

'গুড নাইট, মিস্টার রানা।'

নিজেদের তাঁবুতে ফিরে রানা দেখল ঝুলন্ত একটা স্টোভে পানি ফোটাচ্ছে রঘু। 'ভাইয়া, এক কাপ চা চলবে নাকি? নেপালের স্পেশাল পাতা।'

মাথা নেড়ে রানা বলল, 'ঘুমোবার সময় চা নয়। ঢাকা থেকে একটা মেসেজ পেয়েছি, বুঝলে।'

'তাই?'

'সার্ডিক লঙ্গিনাস সম্পর্কে তেমন কোন তথ্য পাঠাতে পারেনি। মাউন্টিনিয়ার হিসেবে সিরিয়াস সে, তবে ব্যাকগ্রাউন্ড চেক এখনও শেষ হয়নি। ইন্টারেস্টিং খবর হলো, ডক্টর হিউগো ভেনিনি মারা গেছে। জিব্রালটারের তীরে ভেসে উঠেছে তার গলাকাটা লাশ। পকেটে জিএম খোদাই করা একটা সোনার চাকতি পাওয়া গেছে।'

রঘু উত্তেজিত গলায় বলল, 'ভাইয়া, এখানেও নিশ্চয় আছে ওরা।'

'তুমি অস্বাভাবিক কিছু লক্ষ করেছ?'

মাথা নাড়ল রঘু। 'শুধু মন্টি বেলফোর আর ডাক্তার লাবণ্য একসঙ্গে শুচ্ছেন না!' চাপা গলায় হেসে উঠল সে।

প্রসঙ্গটা এড়িয়ে রানা বলল, 'আমারও কিন্তু সন্দেহ হচ্ছে, রঘু। জিএম-এর লোক আমাদের সঙ্গেই আছে।'

'আমাদের সঙ্গে যদি না-ও থাকে, কাছেপিঠে তো অবশ্যই আছে। রুশ বা ইজরায়েলিদের সঙ্গে?'

'সম্ভব। কাজেই, রঘু, আমাদেরকে সাবধানে থাকতে হবে। এক ফাঁকে, বুঝলে, সবার চোখকে ফাঁকি দিয়ে ইজরায়েলিদের দলটাকে দেখে আসতে পারি আমরা।'

'জী, ভাইয়া। পারা উচিত।'

ঘুমিয়ে পড়বার আগে এক এক করে রানা ভাবছে ভেনিনি, জিএম, বিপজ্জনক অ্যাসাইমেন্ট আর ললিতা লাবণ্যের অসাধারণ বক্ষসৌন্দর্যের কথা। হঠাৎ ঘুমিয়ে পড়ল ও, ঘুমের মধ্যে স্বপ্ন দেখছে—সেই স্বপ্নে একটা মানুষের মুখ যেন জাদুবলে সাপ হয়ে গেল। কিন্তু মুখটা কার রানা চিনতে পারল না।

তেরো

পরদিনও শেরপারা সবার আগে রওনা হয়ে গেল। আজকের লক্ষ্য দু'হাজার পঞ্চাশ মিটার গয়া বাই, পৌঁছাতে লাগবে ছয় ঘণ্টার কম নয়। আজ সকালে দই আর চিড়ে খেল রানা।

চিরোর মাঝখানে মিলিত হলো টিম। আকাশ মেঘে ঢাকা থাকায় তাপমাত্রা খানিক কমেছে। সবাই আজ সোয়েটার বা জ্যাকেট পরেছে, কেউ কেউ এমনকী পারকাও। রঘু পরেছে ওয়াটারপ্রুফ জ্যাকেট। তার সঙ্গে ঢাউস একটা ব্যাগ আছে, তাতে রেডিও থেকে শুরু করে ছোট গ্যাস স্টোভ পর্যন্ত অনেক কিছুই আছে। কোমরে একটা চামড়ার খাপ বাঁধা, সেটায় গুঁজে রেখেছে 'কুকরি', অর্থাৎ গুর্খা নাইফ। ওই একই খাপের সাইড পকেটে আরও ছোট দুটো ছুরি আছে–ধারাল 'কার্তা' আর ভোঁতা 'ঝি'–এগুলো আগুন জ্বালবার আর ফলের খোসা ছাড়াবার কাজে লাগে। বড় ছুরিটা আঠারো ইঞ্চি লম্বা, হাতলটা মোষের শিং দিয়ে বানানো।

ডাক্তার লাবণ্যকে আশপাশে দেখা গেলেও, রানার দিকে প্রায় তাকাচ্ছেই না সে। তার ভাবটা যেন, কাল সন্ধ্যায় কিছুই ঘটেনি।

টিম যখন রওনা হলো, বরাবরের মত মন্টি বেলফোরের পাশেই দেখা গেল তাকে। তবে ঘণ্টাখানেক পর একটু একটু করে পিছিয়ে পড়ল সে। তারপর বেশ কিছুক্ষণ একজন আমেরিকানকে পাশে নিয়ে হাঁটল।

অস্ট্রেলিয়ান বব মার্লো, টিমের দ্বিতীয় গাইডের সঙ্গে বেলফোরের খুব খাতির দেখা গেল। লালমুখো লোকটা মাঝে মধ্যেই ঘাড় ফিরিয়ে রানাকে এমন দৃষ্টিতে দেখছে, এই অভিযানে ও যেন একজন বহিরাগত, না থাকলেই ভাল হত। রানা আরও দু'একজনের মধ্যে বিরূপ মনোভাব লক্ষ করেছে, তবে তাদের মধ্যে শুধু বব মার্লোকেই দেখছে নিজের মনোভাব গোপন রাখবার চেষ্টা করছে না।

সার্ডিক লঙ্গিনাস সব সময় একা হাঁটছে, বাধ্য না হলে কারও সঙ্গে কোন কথাও বলছে না। রানা একবার চেষ্টা করে দেখল।

'অল্প সময়ের নোটিশে আপনাকে ওরা খুঁজে পেল কীভাবে?'

'আট হাজার মিটার পাহাড়ে চড়ার প্রশ্ন উঠলেও, যার সুখ্যাতি আছে তার কথাই সবার আগে মনে পড়ে,' জবাব দিল লঙ্গিনাস, যেন এর মধ্যেই সব ব্যাখ্যা দেওয়া আছে।

দ্বিতীয় ঘণ্টার শুরুতে হঠাৎ বৃষ্টি একটু বিড়ম্বিত করল সবাইকে। রেন পার্কা পরল সবাই, তবে থামল না কেউ।

পিছন থেকে ছুটে এসে রানার পাশে চলে এল ডাচ কারমেল: 'হ্যালো, বেঙ্গলম্যান, আপনার ছাতা কোথায়?' ভারী গলায় হাসল সে।

'ওটা আমি সুন্দরবনে, রয়েল বেঙ্গল টাইগারকে দিয়ে এসেছি,' জবাব দিল রানা।

আধ ঘণ্টা পর বৃষ্টি থেমে গেলেও পায়ের নীচে মাটি হয়ে উঠল থকথকে কাদা। রানা পনেরো মিনিট যাত্রাবিরতির নির্দেশ দিল। টিমের কাউকে বিশেষভাবে লিডার নির্বাচিত করা হয়নি, তবে এর আগে পর্যন্ত বেলফোরের কথা মেনে নিতে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছে সবাই। রানার নির্দেশও খুশি মনে গ্রহণ করল তারা, শুধু বব মার্লো আর বেলফোর ঘাড় ফিরিয়ে ওকে একবার দেখে নিয়ে নিজেদের মধ্যে নিচু গলায় কী যেন আলাপ করল। এই সময় সবাইকে আনন্দে ভাসিয়ে দিয়ে মেঘের আড়াল থেকে বেরিয়ে এল সূর্য, রাস্তার কাদা শুকাতে বেশিক্ষণ লাগবে না।

একটা পাথরের উপর ডাক্তার লাবণ্যের কাছাকাছি বসেছে রানা। মেয়েটা চুলে চিরুনি চালাচ্ছে, নতুন রোদ লেগে রেশমের মত ঝলমল করছে তার চুল।

'আপনার সম্পর্কে আমি কিছু জানি না,' হঠাৎ করেই বলল সে। 'এরকম আরও কোটি কোটি মানুষ সম্পর্কে আমি কিছু জানি না। কিন্তু আপনাকে নিয়ে এত কেন কৌতূহল হচ্ছে, বলুন তো?'

জবাব না দিয়ে পাল্টা প্রশ্ন করল রানা, 'বেলফোরকে আপনি কতদিন হলো চেনেন?'

'মন্টিকে? উম্-ম্-ম্... চার বছর? এভারেস্টে চড়ার সময় ওর টিমে ছিলাম আমি। পরে নিউজিল্যান্ডে ও যখন মাউন্ট কুক-এ উঠছে, আবার আমাদের দেখা হয়। আপনি যদি নিজের কথা বলে আমার কৌতূহল মেটান তো খুশি হই।'

'আমি আর বেলফোর পুরানো প্রতিদ্বন্দ্বী, সেই অক্সফোর্ড থেকে।'

'আমারও মনে হয়েছে, আপনাদের দু'জনের মধ্যে কী যেন একটা আছে,' বলল লাবণ্য, উন্মুক্ত ত্বকে সান ব্লক লাগাচ্ছে।

'আপনি ডাক্তার হলেন কেন?' অন্তত রানার কাছে প্রশ্নটা অপ্রাসঙ্গিক নয়।

'ওমা, অত বড় গল্প শোনার কী ধৈর্য হবে আপনার! কম কথায় বলি, হ্যাঁ? ছোটবেলায় আমি খুব বুনো ছিলাম, জানেন। হেই, মাইরি বলছি, আমি এখনও কিন্তু সেই ছোটই আছি। বলা উচিত যখন আরও ছোট ছিলাম।

'সেই তখন থেকে একটাই চাওয়া ছিল, জীবন কাটাব বাইরে বাইরে—ক্যাম্পিং-এ যাব, পাহাড়ে চড়ব, এই সব আর কি। আর, উম্-ম্-ম, আশপাশে শক্ত-সমর্থ পুরুষ মানুষ থাকবে।' মাথা নেড়ে হেসে উঠল, যেন নিজের ছেলেমানুষি দেখে নিজেই বিস্মিত। তবে এসবের মধ্যে বিব্রত বা লজ্জিত হবার মত কিছু খুঁজে পাবে বলে মনে হলো না। 'তো কী হলো জানেন? সিদ্ধান্ত নিলাম, পুরুষ মানুষের সঙ্গে বাইরে থাকতে হলে অবশ্যই আমাকে ডাক্তার হতে হবে। ব্যস, হয়ে গেলাম।'

পাথর থেকে নেমে ব্যাকপ্যাকটা পিঠে ঝোলাল লাবণ্য। 'আপনি তো দেখছি মশাই ভারী অদ্ভুত মানুষ। আমারটা নয়, শুধু নিজের কৌতূহল মেটালেন।'

হেসে উঠে তাকে পাশ কাটাল রানা। ধীরে ধীরে হাঁটছে ও, লাবণ্য যাতে ওর পাশে চলে আসার সুযোগ পায়।

শেরপাদের নির্বাচিত পিকনিক সাইটে বেলা ঠিক একটায় পৌঁছাল ওরা। আজকের গন্তব্যে পৌঁছাতে আরও দু'ঘণ্টা হাঁটতে হবে ওদের। লাঞ্চ খেতে দেওয়া

হলো 'তামা', বাঁশের শুকনো শিকড় দিয়ে তৈরি সুপ। খেতে যে রানার খুব একটা ভাল লাগল, তা নয়, তবে না খেলে খালি পেটে থাকতে হবে।

আধ ঘণ্টা বিশ্রাম নেবে সবাই। রানা ডুনো কারমেলের কাছে চলে এল। 'আমার কোন মেসেজ আছে?'

'না। দিনে তিনবার চেক করি, কিছু এলে জানাব আপনাকে। তবে কাঠমাণ্ডুতে ফিরে গিয়ে আমাদের লিয়াজো একটা মেসেজ পাঠিয়েছে। সে বলছে, ইজরায়েলিরা আমাদের দক্ষিণ-পশ্চিমে মাত্র মাইলখানেক দূরে রয়েছে–এবং উঠছেও খুব দ্রুত। তারপরও শেডিউল ঠিক রাখতে পারলে আমরাই আগে পাহাড়ে চড়ব। কিন্তু ওরা যদি গতি বাড়িয়ে দ্বিগুণ করে, তারপর আমাদেরকে পাশ কাটাতে চায়...'

'মনে থাকল,' বলল রানা।

আবার রওনা হবার প্রস্তুতি নিচ্ছে টিম। তিন আমেরিকানের একজন, হাওয়ার্ড ফিলবি, প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিয়ে ফিরবার সময় একটা পাথরে টপকাতে গিয়ে আছাড় খেল। ব্যথায় চেঁচিয়ে উঠে হাত দিয়ে পা চেপে ধরল সে। কেউ কিছু দেখেনি, কিন্তু সে বলছে পিছন থেকে তাকে ধাক্কা দেওয়া হয়েছে। ডাক্তার লাবণ্য ছুটে এসে পরীক্ষা করছে তাকে।

'ভাল ফ্যাসাদ!' মন্তব্য করল বেলফোর, সে-ও আরেক দিক থেকে ছুটে এসেছে। 'এখন কী হবে?'

ওদের সঙ্গে যোগ দিল রানা আর রঘু। ফিলবির বুট খুলে গোড়ালি পরীক্ষা করল লাবণ্য। এরই মধ্যে সেটা ফুলতে শুরু করেছে।

'হাড় ভেঙে গেছে,' অবশেষে জানাল সে।

'সর্বনাশ!' গুঙিয়ে উঠল ফিলবি। 'এর অর্থ?'

'আপনি যেতে পারবেন না,' বলল লাবণ্য। 'মানে, চেষ্টা করতে পারেন, কিন্তু ব্যথায় জানটা বেরিয়ে যাচ্ছে মনে হবে। এভাবে বেস ক্যাম্পে হয়তো পৌঁছাতে পারলেন, কিন্তু তারপর সম্ভব নয়। আমার পরামর্শ–ফিরে যান।'

'ফিরে যাব? কোথায়?'

'তাপলেজাঙে,' বলল বেলফোর। 'ওখানে পৌঁছে আমাদের ফেরার অপেক্ষায় থাকতে হবে আপনাকে।'

'এক মাস?' রাগে আর অপমানে দপ্ করে জ্বলে উঠল ফিলবি। 'এ আপনি কী বলছেন!'

'একজন শেরপা আপনাকে ফিরিয়ে নিয়ে যাবে। তারপর হয় আমাদের ফেরার অপেক্ষায় থাকতে হবে, নয়তো ফ্লাইট ধরে কাঠমাণ্ডুতে ফিরে যেতে হবে। হ্যাঁ, সেটাও বোধহয় সম্ভব।'

গোড়ালিটা যত্ন করে বেঁধে দিল লাবণ্য, অন্তত যাতে খুঁড়িয়ে বা এক পায়ে লাফিয়ে এগোতে পারে ফিলবি। একজন শেরপা কাছাকাছি গাছ থেকে একটা ডাল ভেঙে আনল, আপাতত ক্রাচ হিসাবে ব্যবহার করা যাবে।

'ফিরতে অনেক সময় লাগবে, কাজেই এখনি আপনার রওনা হওয়া দরকার,' তাগাদা দিয়ে বলল বেলফোর। 'দুর্ভাগ্য রে ভাই, দুর্ভাগ্য!'

'হ্যাঁ, ঠিকই বলেছেন, দুর্ভাগ্যই,' মাথা নেড়ে বলল ফিলবি। 'কিন্তু আমার কথাটায় গুরুত্ব না দিয়ে ভুল করলেন আপনারা। আমি যে হাতের ধাক্কা খেয়েছি সেই হাত আপনাদেরকেও কিন্তু ধাক্কা দিতে পারে।'

সবাই বোবা আর নির্লিপ্ত সেজে থাকল। চেতন নামে একজন শেরপাকে নিয়ে ফিরতি পথ ধরল ফিলবি।

সে চলে যেতে লাবণ্য সবার উদ্দেশে বলল, 'এরকম যে ঘটবে, আমি জানতাম। আমার বিশ্বাস কেউ ওকে পিছন থেকে ধাক্কা দেয়নি। মনে আছে, বলছিল মাথায় খুব ব্যথা? কেসটা মাইল্ড এএমএস। এই ঘটনাটা আপনাদেরকে দেখাল অ্যাক্সিডেন্ট কত দ্রুত আর অপ্রত্যাশিতভাবে ঘটতে পারে।'

আমেরিকানদের একজন, যাকে সবাই 'খোকাবাবু' বলে ডাকে, জানতে চাইল, 'এএমএস কি এত ওপরেও হামলা করে?'

'কারও বেলায় করে, কারও বেলায় করে না। সেজন্যেই লক্ষণ সম্পর্কে সজাগ থাকতে হবে।'

পরবর্তী এক ঘণ্টা খুব দুর্গম পথ পেরুতে হলো ওদেরকে। এদিকের জমিনে খুব বেশি পাথর। একজন শেরপা জানাল পাশের পাহাড় থেকে পাথর ধস ঘটায় সমস্যাটা দেখা দিয়েছে।

তারপর অবশ্য ভাল পথ পাওয়া গেল। পা চালিয়ে বেলফোরের পাশে চলে এল রানা। তার পরনে খাকি শার্ট আর ট্রাউজার, দেখতে অনেকটা ইউনিফর্মের মত।

'হ্যালো, রানা,' বলল সে; অদম্য একটা ভঙ্গি নিয়ে হাঁটছে, যেন রক্ত-মাংসের একটা রোবট। 'দেখতে এসেছ লিডার কেমন করছে?'

'না। দেখতে এসেছি টিমের সামনে থেকে যে বিচ্ছিরি দুর্গন্ধটা ছড়াচ্ছে, কোত্থেকে আসছে সেটা।'

'ভেরি ফানি। তোমার বুঝি ধারণা আমার চেয়ে ভাল পারতে তুমি?'

'কী পারতাম?'

'এই যে, টিমটাকে নেতৃত্ব দিতে।'

'গাঁয়ে মানে না আপনি মোড়ল–বোঝো?' হাসল রানা। 'তুমি তাই। কেউ তোমাকে লিডার বানায়নি, তাই তোমার কাছ থেকে নেতৃত্বটা কেড়ে নেবার প্রশ্নও ওঠে না।'

হঠাৎ প্রসঙ্গ বদল করল বেলফোর। 'কোন কারণ ছাড়া তুমি সামনে আসোনি। কী সেটা?'

'মন্টি, আমি নতুন লোকটাকে নিয়ে চিন্তিত–সার্ডিক লঙ্গিনাস,' বলল রানা। 'আমাদের অফিস লোকটা সম্পর্কে নিশ্চিত করে কিছু বলতে পারছে না। তুমি তার সম্পর্কে কী জানো বলো তো?'

'শুধু জানি কারও সঙ্গে একটা কথাও বলে না। ভাবছিলাম, ওর কথা তুমি কখন তুলবে।'

নিঃশব্দে হাঁটছে ওরা। দু'জন একই হারে নিঃশ্বাস ফেলছে, এগোচ্ছে সমান গতিতে।

'আমি পাহাড়ে চড়তে ভালবাসি, রানা,' বলল বেলফোর। 'আমার প্রবল উৎসাহ দেখে বিএসএস চীফ একজন স্পাইকে না পাঠিয়ে আমাকেই পাঠালেন। পাহাড়ে চড়ার আমার যে অভিজ্ঞতা, ওদের কারও থাকলে তো!'

'ঠিক। তুমি একজন নামকরা মাউন্টিনিয়ার।'

'তুমিও চড়ো, অস্বীকার করছি না,' বলল বেলফোর, 'তবে আমার তুলনায় তুমি কী? বালক?' মাথা নাড়ল সে। 'আমি বলব–শিশু।'

রানা কিছু বলছে না।

'তুমি আবার কিছু মনে কোরো না,' আবার বলল বেলফোর। 'আসলে বলতে চাইছি, তুমি একজন অ্যামেচার। ভাল অ্যামেচার, তবে অ্যামেচারই।'

'না, আমি কিছু মনে করছি না। তোমাকে তো চিনিই।'

খানিক পর বেলফোর জিজ্ঞেস করল, 'লাবণ্য সম্পর্কে তোমার কী ধারণা, রানা?'

'আরে, উনি খুব যোগ্য,' একটু কৌশলে জবাব দিল রানা।

হেসে উঠল বেলফোর। 'হ্যাঁ, ডাক্তার তো সে অবশ্যই ভাল। আমি জানতে চাইছি, মেয়েমানুষ হিসেবে কেমন?'

রানা আবারও বলল, 'খুব যোগ্য।'

গদগদ হয়ে উঠে বেলফোর বলল, 'আমার ধারণা লাবণ্য দশ-বিশ লাখে একটা মেয়ে। আমার জন্যে, কী বলব, স্রেফ...আ ড্রিম কাম ট্রু।'

সাধারণত অন্য মানুষের সম্পর্ক নিয়ে রানা কখনও আলোচনা করে না। তবে লাবণ্য সম্পর্কে বেলফোর কী বলে শুনবার কৌতূহল হচ্ছে ওর। এর একটা কারণ হলো, বেলফোর এমন এক স্বভাবের মানুষ যে কোন মেয়েকে বিছানায় তুলতে পারলে সেটা সে বেশিক্ষণ চেপে রাখতে পারবে না, একটু কৌশল করলে গর্ব করবার জন্য সব বলে ফেলবে।

'আমি জানি কী ভাবছ তুমি,' বলল সে। 'ভাবছ লাবণ্যের সঙ্গে আমার সম্পর্কটা ঠিক কী ধরনের। যদি ভেবে থাকো যে আমরা লাভারস্, ভুল করবে। কয়েক বছর আগে ভাল একটা সম্পর্ক ছিল, এই অভিযানে এসে আবার দেখা হওয়ায় সেটাকে নতুন করে তাজা করতে চেয়েছিলাম, কিন্তু কাজ হয়নি। এখন আমরা স্রেফ বন্ধু।'

'তুমি বলতে চাইছ ডাক্তার লাবণ্য মুক্ত-স্বাধীন, তার ওপর কারও কোন বিশেষ দাবি নেই?'

নাটকীয় ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে পড়ল বেলফোর। চোখদুটো থেকে আগুন ঝরছে। 'কি বললে? অবশ্যই সে স্বাধীন। তার ওপর কারও কোন দাবি নেই।' শুধু দৃষ্টি দিয়েই রানাকে ভস্ম করে দিতে চাইছে সে। 'তবে তারমানে এই নয় যে তুমি কোন রকম সুবিধে করতে পারবে।'

ঠিক এই সময় দ্রুত পায়ে হেঁটে ওদের দু'জনের মাঝখানে পৌঁছে গেল লাবণ্য। তার রেশম কালো চুল পিছনে বাঁধা প্যাকের তিন পাশে উড়ছে। পরিশ্রম করায় এই শীতেও ঘাম জমেছে কপালে আর ঠোঁটের ওপর। দক্ষ শিল্পীর হাতে গড়া প্রতিমার মত অপূর্ব লাগছে তাকে।

'ধারণা ছিল এখানে তোমাদেরকে পাঞ্জা লড়তে দেখব,' বলল সে। 'মন্টি, দেখে মনে হচ্ছে তুমি তোমার বন্ধুকে মারতে যাচ্ছ। উনি বুঝি খুব খারাপ কিছু বলেছেন?'

'ও কিছু না, মাই ডিয়ার,' বলল বেলফোর। 'রানার সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব আর রেষারেষি আজকের নয়।'

'সে তো আমিও শুনেছি। তো কাণ্ডজ্ঞান বজায় রেখো তোমরা। এখানে টেস্টস্টেরোন-এর গন্ধ এত বেশি যে টেকা দায়। নিজেরা মারামারি করে হাড়গোড় ভাঙলে আমি কিন্তু সে-সব জোড়া লাগাতে পারব না।'

'আমরা মারামারি করছি না,' বলল বেলফোর।

'আমাকে নিয়েও নয়?' জিজ্ঞেস করল লাবণ্য।

'ইয়েস, ডিয়ার, ঠিক ধরেছ তুমি,' রেগে উঠে বলল বেলফোর। 'আমরা তোমাকে নিয়ে মারামারিই করছিলাম।'

তার রাগ দেখে লাবণ্য এতটুকু উত্তেজিত হলো না। বরং একটু হেসে উঠে বলল, 'সেক্ষেত্রে, আমি বলব যোগ্য ব্যক্তিই জিতুক।' তারপর ঘুরে টিমের বাকি লোকদের কাছে চলে গেল। তারা সবাই বেলফোরের দাঁড়িয়ে পড়াটাকে বিশ্রাম গ্রহণের সংকেত বলে ধরে নিয়েছে।

'সবাই বসে পড়েছেন কী মনে করে?' প্রায় খেঁকিয়ে উঠল বেলফোর। 'বিশ্রাম তো এরইমধ্যে একবার নেয়া হয়ে গেছে! দাঁড়ান! ক্যাম্পে পৌঁছাতে হলে আরও এক ঘণ্টা হাঁটতে হবে।'

রাগে কাঁপতে কাঁপতে রওনা হয়ে গেল সে। রঘু পাশে না আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করল রানা। ওকে পাশ কাটাল লাবণ্য, চোখের কোণ দিয়ে একবার তাকাল ওর দিকে, তবে একটা কথাও বলল না।

দু'পাশে রঘু আর কারমেলকে নিয়ে তার ঠিক পিছনে থাকল রানা।

গয়া বাই-তে রাতটা ভালই কাটল। পরদিন ওদের টার্গেট দু'হাজার সাতশো মিটারে কাইয়াপ্রা। তার পরদিন একটু বড় গ্রাম ঘুনসা, তিন হাজার চারশো চল্লিশ মিটারে। সাধারণত এখানে অ্যাক্লাইমেটাইজিং-এর জন্য কয়েকটা দিন থাকতে হয়, কিন্তু বেলফোরের প্ল্যানে তার ব্যবস্থা রাখা হয়নি।

সেদিন সকালের বেশিরভাগ সময় রঘুর সঙ্গে থাকল রানা, ইচ্ছে করেই বেলফোর আর লাবণ্যকে এড়িয়ে যাচ্ছে।

লাঞ্চের সময় ডাচ কারমেলকে এদিকে আসতে দেখা গেল। সে বলল, 'ইজরায়েলিরা ওদিকটায় রয়েছে, এক মাইলেরও কম দূরে।' হাত তুলে দক্ষিণ-পশ্চিম দিকটা দেখাল সে, তারপর রানার হাতে একটা বিনকিউলার ধরিয়ে দিল। একটা পাথরের উপর উঠে সেটা চোখে তুলল রানা।

কমপক্ষে দশজন লোকের একটা গ্রুপকে দেখা যাচ্ছে, পাহাড়ের একটা পাশ ধরে ধীর গতিতে এগোচ্ছে। তাদের টার্গেট একটা লাঞ্চ সাইট, সেখানে কয়েকজন শেরপাকে ব্যস্তভাবে কাজ করতে দেখা যাচ্ছে।

পাথরটার উপর উঠে রানার পাশে দাঁড়াল বেলফোর। 'কী দেখছ?'

'সঙ্গী জুটেছে। প্রতিদ্বন্দ্বীও বলতে পারো,' বেলফোরের হাতে বিনকিউলারটা ধরিয়ে দিয়ে বলল রানা। 'এর একটা বিহিত হওয়া দরকার।'

চোখ থেকে বিনকিউলার নামিয়ে অবাক হয়ে রানার দিকে তাকাল বেলফোর। 'কী বলতে চাও? কীসের বিহিত?'

'আমাকে জানতে হবে ইজরায়েলিরা কাঞ্চনজঙ্ঘায় কেন চড়ছে।'

'কীভাবে তুমি তা জানবে?'

'আমি আর রঘু টিম থেকে আপাতত আলাদা হয়ে যাচ্ছি,' বলল রানা। 'আমরা খানিকটা ঘুরপথ ধরে এগোব। ঘুনসায় কাল বিকেলে আবার আমাদের দেখা হবে।'

'কী, তোমরা আজ রাতে বিভওয়্যাক ব্যবহার করবে?'

'হ্যাঁ,' বলল রানা। 'আমরা তাঁবু ছাড়াই যাব। দু'জনেরই বিভওয়্যাক স্যাক আছে, কাজেই অসুবিধে হবে না।'

'এভাবে তোমাদের রুট চেঞ্জ করা আমার একদম ভাল লাগছে না, রানা,' বেলফোর বলল।

'দুঃখিত, মন্টি,' বলল রানা। 'আমাকে যেতেই হবে। ওপরে যে জিনিসটা হারিয়েছে সেটা আমাদের, তাই লোভী শকুন দেখলে আমি তাড়াব না তো কে তাড়াবে?' পাথরটা থেকে লাফ দিয়ে নামল ও, কী করতে চায় ব্যাখ্যা করে বোঝাচ্ছে রঘুকে।

ভুরু জোড়া কুঁচকে গভীর চিন্তায় ডুবে গেল বেলফোর। রানাকে তার বহাল তবিয়তে দরকার, অন্তত যতক্ষণ তারা স্কিন-সেভেনটিন না পাচ্ছে।

টিম থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যতটা পারা যায় সাবধানে ইজরায়েলি অভিযাত্রীদের দিকে এগোল রানা আর রঘু। সময় একটু বেশি লাগল, তবে এক সময় তাদের একশো মিটারের মধ্যে পৌঁছে গেল ওরা। এখান থেকে দেখে দলটা সম্পর্কে পরিষ্কার একটা ধারণা পাওয়া গেল।

'সব মিলিয়ে এগারোজন ওরা,' বলল রঘু, বিনকিউলার দিয়ে দেখছে। 'তবে পোর্টারের সংখ্যা প্রচুর।' প্রতিটি লোকের উপর সতর্ক দৃষ্টি বুলাচ্ছে সে। 'অন্তত তিনজনের কাছে রাইফেল রয়েছে। কাঞ্চনজঙ্ঘা জয় করতে এসে কেন কেউ নিজের সঙ্গে রাইফেল রাখবে?'

'ওখানে পৌঁছে কারও কোন ক্ষতি করতে চাইলে রাইফেল দরকার হবে,' বলল রানা। 'এসো, ওরা আবার রওনা হয়েছে।'

রঘু আড়াল নিয়ে এগোল, রানা তার পিছু নিল। মাউন্টিনিয়ার হিসাবে গুর্খা লোকটা পাহাড়ী ছাগলের মতই দক্ষ।

সূর্য ডোবার খানিক আগে ইজরায়েলিরা যেখানে ক্যাম্প ফেলল সেখান থেকে কাইয়াপ্রা খুব বেশি দূরে নয়। তাঁবু ফেলে খাওয়াদাওয়া সারছে তারা, ঘুমাতে যেতে আর বেশি দেরি নেই। রঘুকে নিয়ে তাদের খানিক উপরে পজিশন নিল রানা, কয়েকটা গাছ দিয়ে ঘেরা কয়েক স্তর পাথরের আড়ালে।

'রাত গাঢ় না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করব আমরা,' বলল রানা। 'আগে ওরা

ঘুমিয়ে পড়ুক, তারপর দেখব কী করা যায়।'

রঘু চাপা গলায় হাসল: 'ভাইয়া, আমার খুব মজা লাগছে।'

রাত নামল একটু দেরি করে। ইজরায়েলিদের তাঁবুগুলো ধীরে ধীরে নীরব হয়ে এল। ক্যাম্পফায়ারের আগুনও এক সময় নিভে গেল। এতক্ষণে ঢাল বেয়ে ক্যাম্পসাইটে নামতে শুরু করল বিসিআই। গ্রুপটাকে খুঁটিয়ে দেখেছে রানা, তাই আঙুল তুলে দেখিয়ে দিতে পারবে কোন তাঁবুতে মানুষ আছে, কোনটায় আছে শুধু ইকুইপমেন্ট বা ফুড সাপ্লাই। পোর্টেবল কিচেনটা ওদেরই মত, সেটাও চেনা যাচ্ছে। এদিকটাতেই নিজেদের তাঁবু ফেলেছে শেরপারা। রানা জানে, ইজরায়েলিদের চেয়ে তাদের ঘুম অনেক হালকা।

পেনলাইট জ্বেলে চাল আর ডালের বস্তা পেল রানা। আরও কিছু ব্যাগে চা রয়েছে। খোরমা ছাড়াও শুকনো অন্যান্য ফল ভর্তি বস্তা পাওয়া গেল। 'নোংরা কৌশল করা ছাড়া উপায় দেখছি না,' ফিসফিস করে রঘুকে বলল রানা। 'আমি চাই ওদের সমস্ত খাবার জিনিস অখাদ্য হয়ে যাক। কোন বুদ্ধি দিতে পারো?'

রঘুও ফিসফিস করল, 'পানি!' খাপ থেকে 'কুকরি' টেনে নিয়ে নিখুঁতভাবে চালের একটা বস্তা কেটে ফেলল সে। বস্তার চাল মেঝেতে স্তূপ হচ্ছে। এরপর তার কাণ্ড দেখে রানা বিস্ময়ে স্তম্ভিত হয়ে গেল। ট্রাউজারের চেইন খুলে ছড়ানো চালে 'পানি' ছাড়তে শুরু করল। তার গোল চাঁদপানা মুখে নিঃশব্দ হাসির কোন অভাব নেই।

রঘুর হাত থেকে ছুরিটা নিয়ে এক এক করে বাকি বস্তা আর ব্যাগগুলো কাটল রানা। তারপর একটা লাঠি দিয়ে ভেজা চালের সঙ্গে শুকনো চাল, ডাল আর ফল মেশাতে ব্যস্ত হয়ে উঠল।

বড় ছুরিটা রেখে দিয়ে খাপের সাইড পকেট থেকে ছোট ছুরি দুটো বের করল রঘু। হাঁটু গেড়ে বসে দুটো ফলা পরস্পরের সঙ্গে ঘষল সে। একটা ফুলকি উড়ল। তারপর আরেকটা। চারবারের বার মোটা ক্যানভাসে আগুন ধরাতে পারল সে।

'এবার আমাদের কেটে পড়া উচিত, ভাইয়া,' বলল রঘু।

একটা গুলির শব্দ চমকে দিল ওদেরকে। তাঁবু থেকে বেরিয়ে ছুটল ওরা। কয়েকজন লোককে হিব্রু ভাষায় চেঁচামেচি করতে শোনা গেল। ঢাল বেয়ে ক্যাম্প থেকে উঠে আসছে ওরা, এরই মধ্যে শিখাগুলো মোটা-তাজা হয়ে উঠেছে। আরও কয়েকটা গুলি হলো, কিন্তু ওরা অন্ধকারে সরে আসায় কোন সমস্যা হলো না। টর্চ বের করে পাহাড়ের গায়ে আলো ফেলল কেউ। অন্তত তিনজন লোক পাথর টপকে কিছু দূর পিছুও নিল। গুলির শব্দ হওয়ায় গোটা ক্যাম্প জেগে উঠেছে। তারই সঙ্গে শুরু হয়েছে চেঁচামেচি আর ছুটোছুটি। শেরপারা অন্য কোন দিকে না তাকিয়ে আগুন নেভাতে ব্যস্ত। তবে রসদ বা সাপ্লাই তারা রক্ষা করতে পারল না।

রঘুকে নিয়ে নিজেদের নিরাপদ আড়ালে উঠে এসে নীচে ইজরায়েলিদের বিশৃংখল অবস্থা দেখছে রানা। অনুসরণকারীরা আগুন নেভাতে ফিরে গেছে।

আগুন নিভল আধ ঘণ্টার চেষ্টায়। রানার উদ্দেশ্য পূরণ হয়েছে। ইজরায়েলি গ্রুপকে অচল করে দেওয়া হয়েছে। খাবার নেই তো উপরে ওঠাও নেই। ইজরায়েলিরা নিজেদের মধ্যে ঝগড়া করছে। তারপর শেরপারাও চিৎকার জুড়ে

দিল। তাদের দু'একটা কথা রানা আর রঘুরও কানে এল।

'ইজরায়েলিরা গুলি করায় শেরপারা খুব রেগে গেছে, ভাইয়া,' বলল রঘু। 'এটা যে ঘটবে, আমি জানতাম।'

'তুমি জানতে মানে?'

'সংস্কার কুসংস্কার যাই বলুন, আমরা নেপালিরা বিশ্বাস করি পাহাড় হলো দেব-দেবীদের বাসস্থান, এখানে এমন কিছু করা উচিত নয় যাতে তাঁরা বিরক্ত হন।'

'শেরপারা কী বলছে?'

'ওরা ইজরায়েলিদের সঙ্গে ওপরে উঠতে রাজি হচ্ছে না। তা ছাড়া উঠতে চাইলেই তো হবে না, খাবে কী? সকালে ফিরতি পথ ধরবে ওরা।'

বড় একটা পাথরের আড়ালে রানা ওর বিভওয়্যাক স্যাক খুলে ভিতরে ঢুকে পড়ল। রাতটা এখানেই কাটাবে ওরা। নিজের স্যাক একটা ফাটলের ভিতর খুলেছে রঘু। 'শুভারাত্রি, ভাইয়া,' বলল সে।

'শুভরাত্রি।'

পরদিন সকালে ঘুম ভাঙবার পর ওরা দেখল ইজরায়েলিরা হার মেনে নিয়ে চলে গেছে।

চোদ্দ

ঘুনসা গ্রামটাকে বরফ ঢাকা চূড়ার পাশে ঝুলে থাকতে দেখে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল রানা। তিন হাজার চারশো চল্লিশ মিটার উপরে উঠতে কালঘাম ছুটে গেছে ওর। দম নেওয়ার জন্য কয়েকবার থামতে হয়েছে ওকে। তবে রঘুর উপর এর তেমন কোন প্রভাব পড়েনি। তার শ্বাস-প্রশ্বাস একদম স্বাভাবিক।

এদিকে কিছু লোক তিব্বতী চমর ষাঁড় পালে দেখে বিস্মিত হলো রানা। গ্রামের লোকজন কাজ ফেলে ওদের দিকে তাকিয়ে আছে। বাঁক ঘুরবার পর একটা ক্যাম্পসাইট চোখে পড়ল, প্রায় দুশো মিটার দূরে।

'নিশ্চয়ই আমরা,' বলল রঘু।

'আশা করি লাঞ্চ রেডি,' বলল রানা। 'খিদে পেয়েছে।'

পিচ্ছিল, ভেজা পাথরের মুখ বেয়ে উঠে একটা কারনিসে পৌঁছাল ওরা। উঠবার জন্য এখনও ক্লাইম্বিং টুলস্ ব্যবহার করবার প্রয়োজন হচ্ছে না, তবে বুঝতে পারছে খুব তাড়াতাড়ি আইস অ্যাক্স বের করতে হবে। ঘুনসা থেকে বেস ক্যাম্পের পথটা ক্রমশ খাড়া হয়ে উঠে গেছে। পরবর্তী দুটো দিন এই পথই ওদের সমস্ত শক্তি নিংড়ে নেবে।

বাঁক ঘুরে ক্যাম্পের দিকে এগোল ওরা, এই সময় বাতাসে শিস কেটে দু'জনের মাঝখান দিয়ে বেরিয়ে গেল একটা বুলেট, লাগল গিয়ে ওদের পিছনের বরফে। দু'জনেই একসঙ্গে ডাইভ দিয়ে ভেজা পাথুরে জমিনে পড়ল। আরও দুটো

বুলেট ওদের কাছাকাছি বরফে লাগল। শরীরটা গড়িয়ে বড় একটা পাথরের আড়ালে চলে এল রঘু। রানা ক্রল করে পৌঁছাল বিরাট একটা গাছের গুঁড়ির কাছে, নিশ্চয় কয়েকশো বছর বয়স হবে।

'দেখতে পাচ্ছ কাউকে?' ফিসফিস করল রানা।

সাবধানে মাথা তুলে চারপাশে তাকাল রঘু। 'না!'

গ্রামের ওদিকটায় পাহাড়-প্রাচীরের গায়ে সামান্য একটু ধোঁয়া দেখতে পেল রানা। 'ওই ওপরে বসে আছে। দেখতে পাচ্ছ?'

ঘাড় বাঁকা করে সেদিকে তাকাল রঘু। 'কী করব আমরা?'

'অপেক্ষা।'

'কে হতে পারে লোকটা?'

'যে-ই হোক, জানে এই পথ দিয়ে ফিরব আমরা,' বলল রানা। 'চায় না দলে আবার যোগ দিই।'

'ইজরায়েলিরা নয় নিশ্চয়?'

মাথা নাড়ল রানা। 'মনে হয় না। সকালে তাদের কোন চিহ্ন পর্যন্ত ছিল না। ফিরতি পথ ধরে নেমে গেছে তারা।'

চারদিক ভাল করে একবার দেখে নিয়ে পঞ্চাশ মিটার দূরের একটা কারনিস দেখাল রঘু। 'ওখানে পৌঁছাতে পারলে নীচে নামতে পারব, তারপর পাহাড়ের গোড়া ঘুরে উল্টোদিক থেকে ক্যাম্পে ওঠা যাবে।'

'বাহ্, ভাল আইডিয়া,' বলল রানা। 'দু'জন যদি এঁকেবেঁকে দৌড় দিই, কাকে ছেড়ে কাকে গুলি করবে ভেবে সমস্যায় পড়ে যাবে স্নাইপার। ওয়ান, টু, থ্রি!'

লাফ দিয়ে আড়াল থেকে বেরিয়ে কারনিসের দিকে ছুটল ওরা। ওদের পায়ের কাছে বরফে আরও দুটো গর্ত তৈরি করল বুলেট। কারনিসের নীচে প্রথমে পৌঁছাল রঘু। কিনারা ধরে দম আটকাল সে, তারপর আঁচড়াআঁচড়ি করে কারনিসের মাথায় উঠে পড়ল। এক সেকেন্ড পর রানাও।

কারনিসের মাথা মাত্র পাঁচ থেকে আট ইঞ্চি চওড়া। মুখের সামনে পাহাড়ের পাঁচিল, সেই পাঁচিলে খাঁজ-ভাঁজ-গর্ত আর ফুটোয় আঙুল আটকে এক-দু'ইঞ্চি করে এগোচ্ছে ওরা।

হঠাৎ খুব কাশি পাওয়ায় সরু কারনিসে বসে পড়ল রানা, পা দুটো নীচের দিকে ঝুলিয়ে দিয়েছে।

'ভাইয়া, আপনার শরীর ভাল?' রঘু উদ্বিগ্ন।

কিছুক্ষণ খক্ খক্ করে মাথা ঝাঁকাল রানা।

'মাথাব্যথা?'

'না।' আবার ধীরে ধীরে দাঁড়াল রানা। পাহাড়ের গোড়াটা অর্ধেকের বেশি ঘোরা শেষ করে উপরে ওঠবার একটা পথ পেল ওরা। উল্টোদিক থেকে ক্যাম্পে ঢুকল, পাহাড়-প্রাচীরের যেদিকটায় স্নাইপারকে দেখেছে সেদিকে একটা সতর্ক চোখ রেখেছে। তাকে এখন আর কোথাও দেখা যাচ্ছে না।

বব মার্লোর সঙ্গে মগ্ন হয়ে আলাপ করছিল বেলফোর, এই সময় ওদের দু'জনকে আসতে দেখে হাত তুলে নাড়ল। 'আমরা প্রায় হাল ছেড়ে দিয়েছিলাম,'

গলা চড়িয়ে বলল সে। 'সূর্য ডোবার আগেই কমবচন-এ পৌঁছাতে হবে।'

'সেরেছে,' বলল রানা। 'কত দূরে ওটা?'

কাঁধ ঝাঁকাল বেলফোর। 'সাড়ে চার ঘণ্টার পথ। কেন? এইটুকু ধকল তো সইবেই তোমার, রানা—নাকি সইবে না?'

বারকয়েক খুক্ খুক্ করে মাথা ঝাঁকাল রানা।

'তোমার কাশিটা তো ভাল শোনাচ্ছে না। মাত্র একরাত বিভওয়্যাকে কাটিয়ে এই অবস্থা?' হাসল বেলফোর। 'তা আমাদের ইজরায়েলি বন্ধুদের সম্পর্কে কী জানা গেল?'

'খুব শিগ্‌গির ওরা আর আমাদেরকে বিরক্ত করবে না। আমাদের টিমের কেউ নিখোঁজ নয় তো?' জানতে চাইল রানা।

'মানে, এই মুহূর্তে?'

'হ্যাঁ।'

'হু-ম-ম-ম, তিন কি চারজন গ্রামে আছে। তাদের ফেরার কথা,' হাতঘড়ি দেখল বেলফোর, 'এখন থেকে যে-কোন মুহূর্তে। আমাদের প্ল্যান হলো সাড়ে বারোটায় রওনা হব। এখন বাজে বারোটা পনেরো।'

'কে কে গেছে গ্রামে?'

'কেন জানতে চাইছ?'

'কারণ জিজ্ঞেস কোরো না, স্রেফ জবাব দাও,' সুর কঠিন করল রানা।

চোখ সরু করল বেলফোর। 'সাবধান, রানা। নিজের ভাল চাও তো আমার সঙ্গে লাগতে এসো না।'

খপ্ করে পারকা ধরে হ্যাঁচকা টানে তাকে সামনে আনল রানা। কিন্তু দু'জনের মাঝখানে প্রায় ঝাঁপিয়ে পড়ল রঘু।

'না, ভাইয়া! থাক, ছেড়ে দিন! বেলফোর সাহেব নিজের ভুল স্বীকার করছেন।'

বেলফোরকে ছেড়ে দিয়ে পিছিয়ে এল রানা। 'মন্টি, তুমি অনধিকার চর্চা করতে এখানে এসেছ, আর আমি এসেছি নিজেদের হারানো সম্পদ উদ্ধার করতে। তুমি হয়তো ভাবতে পারছ না, কিন্তু আমার পথে বাধা হয়ে দাঁড়ালে আমি তোমার অস্তিত্ব পর্যন্ত রাখব না। এখন বলো, গ্রামে কারা গেছে?'

'তুমি আমাকে ভয় দেখাচ্ছ, রানা?' বেলফোর হিংস্র দৃষ্টিতে দেখছে রানাকে। 'যে ভয় পায় না তাকে ভয় দেখানো বোকামি নয়?'

'তুমি অযথা সময় নষ্ট করছ।'

বেলফোরের পেশীতে ঢিল পড়ল একটু। 'গ্রামে গেছে ডাক্তার লাবণ্য, ডুনো কারমেল, সার্ডিক লঙ্গিনাস আর আমেরিকান খোকাটা।'

লঙ্গিনাস, ভাবল রানা। সেই গুলি করেছে।

ঠিক সেই মুহূর্তে কারমেল আর লাবণ্যকে ক্যাম্পের দিকে নেমে আসতে দেখা গেল। কারমেল উজ্জ্বল হলুদ আর সবুজ রঙের একটা পারকা পরে আছে। এটা তাকে আগে পরতে দেখা যায়নি।

কলাপসিবল টুলে বসে পড়ে আবার একটু কাশল রানা। সরাসরি ওর দিকে

হেঁটে আসছে লাবণ্য, বলল, 'কী ব্যাপার, এরইমধ্যে আপনাকে কাশি ধরে ফেলেছে?'

'আপনারা ছিলেন কোথায়?' জবাব না দিয়ে জানতে চাইল রানা।

একটু বিব্রত দেখাল লাবণ্যকে। বব মার্লো আর বেলফোরের দিকে তাকাল সে।

'আমি গিয়েছিলাম চমরীর দুধ খেতে। তো একজন কৃষকের কাছে এটা দেখে কিনতে চাইলাম,' বলল ডুনো কারমেল, উঁচু করে একটা লাউ দেখাল রানাকে। 'লোকটা আমার গলা কাটছিল, এই সময় ডাক্তার লাবণ্য এসে দামটা অর্ধেকে নামিয়ে আনলেন।'

লাবণ্য দেখাল একটা নেকলেস। 'আর আমি এটা কিনলাম, পাঁচ প্যাকেট চুইংগামের বিনিময়ে। সুন্দর, তাই না?'

'হেই!' কাতর একটা চিৎকার ভেসে এল।

ঘাড় ফেরাতে সার্ডিক লঙ্গিনাসকে দেখতে পেল সবাই। চড়াই বেয়ে উঠে আসতে দম ফুরিয়ে গেছে তার, খানিক পর পর থামতে বাধ্য হচ্ছে। ক্যাম্পে পৌঁছে জড়ো করা তারপুলিনের উপর ঢলে পড়ল সে। দম ফিরে পাওয়ার পর বলল, 'খোকা...সে মারা গেছে...তাকে গুলি করা হয়েছে।'

'হোয়াট?' বেলফোর আর লাবণ্য একযোগে চেঁচিয়ে উঠল।

'কোথায়?' জানতে চাইল রানা।

হাত তুলে পাহাড়-প্রাচীরের সেই জায়গাটা দেখাল লঙ্গিনাস, যেখানে স্নাইপারকে দেখেছিল ওরা। 'ওই ঢালের ঠিক নীচে। আসুন, আপনাদের আমি দেখাচ্ছি।'

তার পিছু নিয়ে রানা ভাবছে, লঙ্গিনাস রাইফেলটা কোথায় লুকিয়ে রাখল? তার জিনিস-পত্রের ভিতর কিভাবে সেটার জায়গা হবে! পাহাড়-প্রাচীরের কোথাও ফেলে রেখে এসেছে?

'খোকা'-র আসল নাম ডেভ হোয়াইট। পথের যেখানে থকথকে কাদাকে জায়গা ছেড়ে দিয়েছে বরফ, ঠিক সেখানে হাত-পা ছড়িয়ে উপুড় হয়ে আছে সে। শরীরের পাশে এখনও রক্ত জমছে।

পরীক্ষা করবার জন্য তার পাশে হাঁটু গাড়ল লাবণ্য। 'ওকে ঘোরাতে সাহায্য করুন, প্লিজ,' বলল সে।

রানাই হাত লাগাল তার সঙ্গে। বুলেটটা হোয়াইটের ডান বুকে লেগেছে। 'গুলিটা করা হয়েছে পয়েন্ট-ব্ল্যাঙ্ক রেঞ্জ থেকে,' বলল ও। শুনে মাথা ঝাঁকিয়ে একমত হলো লাবণ্য।

রঘুর দিকে তাকাল রানা। কী ঘটেছে দু'জনেই জানে ওরা। খোকা, ওরফে ডেভ হোয়াইট, হঠাৎ স্নাইপারের সামনে এসে পড়ে, কিংবা গুলি করতে দেখে ফেলে। সেই অপরাধেই তাকে মরতে হয়েছে।

কমবচন যাত্রা বাতিল করা হলো, ঘুনসাতেই রাত কাটানোর প্রস্তুতি নিল টিম। বেলফোর গম্ভীর হয়ে আছে, কারও সঙ্গে কথা বলছে না। লাশ নিয়ে রানা পরে

আর কোন মাথা ঘামায়নি, তবে রঘুকে নিয়ে অকুস্থলের চারপাশে ঘোরাঘুরি করেছে ক্লুর খোঁজে। একটা ৭.৬২ মিমি শেল পেয়ে রানাকে দেখাল রঘু।

'এটা কোন সেমি-অটোমেটিক থেকে বেরিয়েছে,' বলল রানা। 'স্নাইপার রাইফেল। ড্রাগনভ হতে পারে?'

'আমি একবার একটা এলআই এআই চালিয়েছিলাম। সেটায় এরকম অ্যামিউনিশন ব্যবহার করা যেত। ওটা ছিল বেলজিয়ান এফএন এফএএল-এর ব্রিটিশ সংস্করণ। গ্যাস অপারেটেড, ম্যাগাজিনে রাউন্ড ধরে বিশটা।'

'তুমি হয়তো ঠিকই বলছ, রঘু।'

'লোকটা আমাদেরই টিমের কেউ। ঘুনসাতে যারা বাস করে তাদের কাছে এই রাইফেল থাকবে না,' বলল রঘু। 'আমরা কি লঙ্গিনাসের জিনিস-পত্র সার্চ করব?'

'করতে হতে পারে। এসো, সবাইকে জানাই ব্যাপারটা।'

ডেভ হোয়াইট খুন হওয়ায় টিমের সবাই হতচকিত হয়ে পড়েছে। অবশ্য খুনী যে-ই হোক, তার এই ভাব স্রেফ অভিনয়। রানা যখন বলল যে খুনী এই টিমেরই একজন, কয়েকজন সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবাদ জানাল।

'আপনার কি মাথা খারাপ হলো?' ক্লাইম্বারদের একজন জিজ্ঞেস করল। 'আমাদের একজন কেন এ-কাজ করতে যাবে?'

'তারমানে কী টিমে কোন টেরোরিস্ট ঢুকে পড়েছে?' শেষ আমেরিকান, মাইকেল উডকক, জানতে চাইল। 'আল কায়েদার ষড়যন্ত্র?'

'শান্ত হন,' ভারী গলায় বলল বেলফোর। 'আমরা এখানে একটা দুর্ঘটনার তদন্ত করতে এসেছি। এর সঙ্গে রাজনীতির কোন সম্পর্ক নেই।'

'তা হলে কে আমাদেরকে গুলি করতে চাইবে, বলুন?' জিজ্ঞেস করল সিমন অ্যালভারেজ।

'রাশিয়ানরা,' জবাব দিল ডুনো কারমেল। সবাই ঘাড় ফিরিয়ে তার দিকে তাকাল। 'আমি এই খানিক আগে খবর পেয়েছি কাল ওদের টিম বেস ক্যাম্পে পৌঁছাবে। তাদের হয়তো ধারণা ওই প্লেনে কিছু একটা আছে।'

বেলফোরের দিকে তাকাল সবাই। 'আছে নাকি?' জানতে চাইল ডাক্তার লাবণ্য।

'শুধু লাশ,' জবাব দিল বেলফোর। 'ব্রিটিশ আর আমেরিকান লাশ।'

রানা ভাবছে, ঘটনাটার সঙ্গে রাশিয়ানরাই হয়তো জড়িত। তাদের দলে কি জিএম অপারেটররা থাকতে পারে? রেকর্ডে দেখা গেছে রুশ মাফিয়ার সঙ্গে তাদের একটা সম্পর্ক আছে। হয়তো জিএম ক্রিমিন্যালদের নিয়েই গোটা দল তৈরি করা হয়েছে, নাম দেওয়া হয়েছে রাশিয়ান।

'আমরা কি কোন ধরনের বিপদের মধ্যে আছি?' টমাস পারকার জানতে চাইল। 'বুঝতেই পারছেন, প্রাকৃতিক বিপদের কথা বলছি না আমি।'

'আরে, না!' বলল বেলফোর, আশ্বস্ত করবার চেষ্টায় হাসছে। 'আমার ধারণা, মিস্টার হোয়াইট আসলে কোন ধরনের উদ্ভট দুর্ঘটনার শিকার।'

'পয়েন্ট-ব্ল্যাঙ্ক রেঞ্জ থেকে গুলি খাওয়া দুর্ঘটনা হয় কী করে?' কারমেল

জিজ্ঞেস করল। 'ব্যাপারটা আমার ভাল ঠেকছে না।'

'আমারও নয়,' আরেকজন বলল।

'সত্যি খুব চিন্তার কথা,' বলল লাবণ্য।

'বেশ!' চেঁচিয়ে উঠল বেলফোর। 'আমাদের ফেলে আপনারা তাহলে ফিরে যান। শুনুন, আপনারা নেপাল সরকারের চাকরি করছেন, বেতনও পাচ্ছেন, তারপরও এই অভিযানে যাঁরা সহযোগিতা করবেন তাঁদেরকে ব্রিটিশ আর মার্কিন সরকার বিশেষ পুরস্কার দেবে বলে জানিয়েছে। নগদ সেই পুরস্কারের পরিমাণ আপনারা জানেন না, তবে আমি জানি–এক সঙ্গে এত টাকা আমাদের মধ্যে খুব কম লোকই দেখেছে।

'সে যাক, কারও ইচ্ছের ওপর জোর খাটাতে চাই না আমি। তবে কাল সকালে কমবচন-এর উদ্দেশে আর কেউ রওনা হোক বা না হোক, একজন অন্তত রওনা হবেই। তার নাম মন্টি বেলফোর। ওখান থেকে কালই আমি লহোনাক যাব, পরশু যাতে বেস ক্যাম্পে পৌঁছাতে পারি। আমার সঙ্গে কেউ যদি যেতে চান, তাঁকে স্বাগতম!'

লাবণ্য গলা পরিষ্কার করে বলল, 'এখান থেকে লহোনাক ক্রমশ উঁচু হয়ে এক হাজার মিটারও ছাড়িয়ে গেছে। কাজটা অত্যন্ত কঠিন হবে।'

'আমরা সবাই কাজটা কঠিন জেনেই রওনা হয়েছি,' বলল বেলফোর। 'ঝুঁকিটাও সংশ্লিষ্ট কারও জন্যে নতুন কিছু নয়। বললামই তো, যে-কেউ ফিরে যেতে পারে। আমি? নো, নেভার।' হঠাৎ ঘাড় ফেরাল সে। 'তুমি, রানা?'

'আমাকে তো যেতেই হবে, এমনকী তুমি বা আর কেউ না গেলেও,' জবাব দিল রানা। 'কারণ প্লেনটায় এমন একজন লোক থাকার কথা যে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে গুরুতর একটা ক্রাইম করেছে। তাকে জ্যান্ত ধরতে না পারলেও, লাশটা সনাক্ত করতে হবে।' এই গল্প আগেই বানিয়ে রেখেছে ও।

রঘু বলল, 'গুর্খালি ভাষায় একটা কথা প্রচলিত আছে– "কাফার হুনু বান্দা, মরনু রামরো"–মানে হলো, কাপুরুষ হবার চেয়ে মরে যাওয়া ভাল। ভাইয়া, আমি আপনার সঙ্গে আছি।'

'আমিও,' বলল ডাক্তার লাবণ্য। 'কারণ, আমি বেশ বুঝতে পারছি, ওখানে ভাল একজন ডাক্তার সত্যি দরকার হবে আমাদের।'

ডুনো কারমেল কাঁধ ঝাঁকাল। 'ধ্যাত্, এতদূর তো এলাম! বাকিটা নয় কেন?

অবশেষে একে একে সবাই রাজি হলো। একা শুধু সার্ডিক লঙ্গিনাস চুপ করে থাকল। সবাই তার দিকে তাকিয়ে কী বলে শুনবার অপেক্ষায় আছে। আরও কয়েক মুহূর্ত অপেক্ষা করিয়ে রেখে মাথা ঝাঁকাল সে। 'ঠিক আছে, যাব।'

ওরা যা ধারণা করেছিল তারচেয়ে অনেক সহজেই ঘুনসা পুলিশের কাছে খুনের ব্যাপারটা চেপে রাখা গেল। লাবণ্য ডেথ সার্টিফিকেটে লিখল–ডেভ হোয়াইট কিছু ইকুইপমেন্টের উপর আছাড় খেয়ে পড়ায় গভীর ক্ষত সৃষ্টি হয়। পাহাড়ে চড়তে আসা দুর্ঘটনাপ্রবণ পশ্চিমাদের সম্পর্কে জানে পুলিশ, কাজেই ব্যাপারটা নিয়ে তারা বিশেষ মাথা না ঘামিয়ে প্রত্যেকের পারমিট চেক করে ছেড়ে দিল।

লাশ নিয়ে চারজন শেরপা ফিরতি পথ ধরল। হোয়াইটকে কাঠমাণ্ডুতে নিয়ে গিয়ে কবর দেওয়া হবে।

রাত নামতে না নামতে যে-যার তাঁবুতে ঢুকে পড়ল সবাই। জমাট একটা নিস্তব্ধতা নেমে এল। অনেকেই দিনটার কথা ভুলে যাবার চেষ্টা করছে, কিন্তু তাদের শঙ্কিত মন অনুভব করছে সামনে আরও ভয়ানক বিপদ ওত পেতে আছে।

লহোনাকে রাত কাটাবার ফলে পথ চলা আরও কঠিন হয়ে উঠল। এমনিতেই কারও মন-মেজাজ ভাল নেই, তার উপর নষ্ট হওয়া সময় পুষিয়ে নেওয়ার জন্য অনেক বেশি দূরত্ব পার হবার সিদ্ধান্ত হয়েছে। বেস ক্যাম্পে পৌঁছে দেখা গেল, কাঠমাণ্ডু থেকে রওনা হবার ছ'দিন পর, মন্টি বেলফোরও হাঁপাচ্ছে আর মাঝে মধ্যে খক্ খক্ করে কাশছে।

প্রকাণ্ড পাহাড়টার উত্তর পাশে, পাঁচ হাজার একশো চল্লিশ মিটার উপরে বেস ক্যাম্প। নিকট অতীতে যে-সব অভিযাত্রী দল ফিরবার পথে এখানে থেমেছিল তাদের ফেলে যাওয়া কিছু জিনিস চারদিকে ছড়িয়ে রয়েছে—ভাঙা তাঁবু, পুজোর শুকনো ফুল, জঞ্জাল আর কয়েকটা কবর।

চূড়াটাই তো বিশাল এক পাহাড়, বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত হয়ে মেঘের ভিতর হারিয়ে গেছে। নড়েচড়ে না, অথচ মনে হয় পাথর, বরফ আর তুষার দিয়ে বানানো অতিকায় কোন প্রাগৈতিহাসিক প্রাণীকে এখানে প্রদর্শনীর জন্য বন্দি করে রাখা হয়েছে। মাথার দিকটা উত্তালতরঙ্গের মত ফুলে উঠছে, যেন বিপুল সাদা ধোঁয়ার বিস্ফোরণ ঘটছে। আসলে তা নয়, ওখানে বরফ আর তুষার নিয়ে খেলা চলছে তীব্র বাতাসের।

পাহাড়ের গোড়া থেকে দেখলে এই দৃশ্য মন-প্রাণ জুড়িয়ে দেয়; কিন্তু ওখানে পৌঁছানোর পথটা চরম বিপজ্জনক। মাথার দিকে তুষার ঝড় আর প্রবল শিলাবৃষ্টি কখন হচ্ছে না সেটাই বলা মুশকিল। দৃশ্যটা এমন অপার্থিব বলে মনে হয় যে দেখামাত্র নত হয়ে আসে মাথা, স্পষ্ট উপলব্ধি করা যায় এখানে আমি তুচ্ছাতিতুচ্ছ।

তথ্য বা বাস্তবতা জানা আছে রানার—লম্বায় পাহাড়টা আট মাইল, চওড়ায় পাঁচ, মূল চূড়া আট হাজার পাঁচশো আটানব্বুই মিটার বা আটাশ হাজার দুশো আট ফুট উঁচু; দুনিয়ার তৃতীয় উচ্চতম চূড়া এটা।

হিমালয়ে এভারেস্ট সবচেয়ে বেশি মনোযোগ আকর্ষণ করলেও, কাঞ্চনজঙ্ঘাকেই বেশি দুর্গম আর 'বিরাট' বলে বিবেচনা করা হয়। উত্তর দিক থেকে বহু মানুষই কাঞ্চনের চূড়ায় পৌঁছাবার চেষ্টা করেছে। 'নর্থ রিজ' হয়ে, লোয়ার গ্ল্যাসিয়াল শেলফকে পাশ কাটিয়ে উনিশশো উনআশি সালে প্রথম তিনজন লোক চূড়ায় উঠতে পারে।

'সব মিলিয়ে,' বেস ক্যাম্পের কাছাকাছি এসে বলল বেলফোর, 'এই পর্বতের ওপর পঁচিশটারও বেশি অভিযান চালানো হয়েছে, সম্ভাব্য সতেরোটা রুট ধরে। না, আমি এর আগে কাঞ্চনে উঠতে চেষ্টা করিনি। তবে মনে মনে চাইছি অনেকদিন ধরেই। এবার সুযোগ যখন পেয়েছি, অবশ্যই একবার চেষ্টা করব।

তুমি, রানা?'

'আমি এখানে চূড়ায় চড়তে আসিনি,' বলল রানা। 'তোমারও বোধহয় চড়া উচিত হবে না।'

'কেন?'

'শেরপারা বাধা দিতে পারে।'

রানার কথায় গুরুত্ব না দিয়ে বেলফোর বলল, 'তা ছাড়া, আমি দেখতে চাই লাবণ্য চূড়ায় উঠেছে। খুব বেশি মেয়ে উঠতে পারেনি।'

পিছন থেকে তার এই কথা শুনতে পেয়ে ওদের পাশে চলে এল লাবণ্য। 'উঁহুঁ, না। আমার ধারণা মিস্টার রানাই ঠিক বলছেন। আমরা এখানে ওয়ার্ল্ড রেকর্ড গড়তে আসিনি।'

চোখে বিতৃষ্ণা নিয়ে ওদের দিকে একবার করে তাকাল বেলফোর, তারপর হাঁটার গতি বাড়িয়ে দিয়ে দূরে সরে গেল।

তিন ঘণ্টার মধ্যে তৈরি হয়ে গেল ক্যাম্প। কার্তিক সুলক্ষণ গোটা ব্যাপারটা দক্ষতার সঙ্গে গুছিয়ে ফেলল। বিষ্ণুসখার জন্য একটা আলাদা তাঁবু খাড়া করা হলো, তাতে শুধু খাদ্যদ্রব্য আর রান্না করবার সরঞ্জামাদি থাকবে। ডুনো কারমেলকে করা হলো হেডকোয়ার্টার ইন-চার্জ। কমিউনিকেশন ডিভাইস ছাড়াও কট, ল্যাম্প সহ অন্যান্য সাপ্লাই তার দায়িত্বে থাকবে। হেডকোয়ার্টার তাঁবুর ঠিক সামনে একটা পোর্টেবল স্যাটেলাইট ডিশ বসানো হলো। খানিক পরই দেখা গেল বাইরের দুনিয়ার সঙ্গে যোগাযোগ শুরু হয়ে গেছে কারমেলের।

প্রায় সবাই কমবেশি কাশছে বা হাঁচি দিচ্ছে। অলটিচ্যুড্-এর পরিবর্তন এখন যেহেতু গুরুতর অস্বস্তির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে, ডিনারের পর সবাই যে-যার তাঁবুতে ঢুকে পড়ল। খিদে না থাকায় প্রায় কেউই পেট ভরে খেতে পারেনি।

তাপমাত্রাও বিষণ্ন করে তুলছে ওদেরকে। বেস ক্যাম্পে তা ফ্রিজিং পয়েন্টের নীচে। টানা হিম বাতাস পরিস্থিতি আরও খারাপ করে রাখছে।

পরদিন সকালে পরিবেশ খানিকটা সহনীয় লাগল। রানার ইচ্ছে হলো আজই পাহাড়ে চড়ে, তবে জানে যে তা সম্ভব নয়; আবহাওয়া আর পারিপার্শ্বিক অবস্থার সঙ্গে শরীরটাকে খাপ খাওয়ানোর সময় দেবার জন্য পুরো একটা হপ্তা বেস ক্যাম্পে থাকতে হবে।

রঘু ছোটখাট একটা পুজোর আয়োজন করল। দেখবার জন্য ভিড় করেছে সবাই। পুজো শেষ হতে সে বলল, 'এই পাহাড়ে চড়াটাকে কেউ হালকাভাবে দেখবেন না। পাহাড়কে আপনার সম্মান করতে হবে। দেবতারা গর্ব আর অহঙ্কার পছন্দ করেন না।'

'এ-সব তুমি বিশ্বাস করো, রানা?' নিচু গলায় জিজ্ঞেস করল বেলফোর।

'ব্যাপারটা বিশ্বাস-অবিশ্বাসের নয়,' বলল রানা। 'মানুষের সংস্কারের প্রতি সবারই শ্রদ্ধা থাকা উচিত।'

রঘুর কথা শেষ হতে ডাক্তার লাবণ্য টিমের সবার স্বাস্থ্য পরীক্ষা শুরু করল। প্রত্যেককেই প্রচুর বিশ্রাম নিতে বলল সে। আর বেশি করে পানি খেতে হবে।

ঠিক হলো, আজ পুরোটা দিন সম্পূর্ণ বিশ্রাম। কাল থেকে আশপাশটা

ঘুরেফিরে দেখা যাবে। প্রতিদিন গতদিনের চেয়ে একটু বেশি উপরে উঠে ফিরে আসতে হবে ক্যাম্পে। কে কেমন করছে সেটা লক্ষ রাখবে ডাক্তার, সে-সব বিবেচনা করেই লিড টিম গঠন করা হবে।

লিড টিমে থাকাটা আনন্দের কোন ব্যাপার নয়, কারণ তারাই তো হার্ডওয়্যার ইনস্টল করবে, যে-সব হার্ডওয়্যার অন্যান্য ক্লাইম্বারদেরকে পাহাড়ে চড়তে সাহায্য করবে–রশির কুণ্ডলী, নোঙর, আইস স্ক্রু, পিটন, রানার ইত্যাদি।

দুটো দিন কোন রকমে কাটল, তৃতীয় দিন রানা চরম একঘেয়েমির শিকার। সার্ডিক লঙ্গিনাসকে নিয়ে পাহাড়ে চড়তে গেল বেলফোর, এটা দেখে একটা কাজের কথা মনে পড়ল ওর। লঙ্গিনাসের তাঁবুটা সার্চ করবার এরচেয়ে ভাল সুযোগ আর পাওয়া যাবে না।

রঘুকে বাইরে পাহারায় রেখে ভিতরে ঢুকল রানা। নিজের তাঁবুতে একাই থাকতে পছন্দ করে লঙ্গিনাস। গ্যাস স্টোভ, ক্লাইম্বিং গিয়ার, স্লিপিং ব্যাগ, কাপড়চোপড় ইত্যাদি যা থাকবার তাই আছে, কিন্তু স্নাইপার রাইফেলের সঙ্গে চেহারা মেলে এমন কিছু খুঁজে পাওয়া গেল না। নাৎসীরা ব্যবহার করত, এরকম একটা ছুরি ছাড়া তাঁবুর ভিতর অন্য কোন অস্ত্রও নেই।

দু'দিন পর লাঞ্চ খেয়ে দিবানিদ্রার আয়োজন করছে, গুলির শব্দ শুনে চমকে উঠল রানা। স্লিপিং ব্যাগ থেকে বেরিয়ে বুট পরল, ছুটে বেরিয়ে এসে দেখল বাইরে তুষার পড়ছে।

মেসের পিছন থেকে গুলির শব্দ ভেসে আসছে। তিন কি চারজন লোক এক জায়গায় দাঁড়িয়ে কী যেন দেখছে। এগিয়ে এসে রানা দেখল একটা ব্রাউনিং হাই-পাওয়ার হ্যান্ডগান দিয়ে বোতল আর টিন ক্যানে গুলি করে টার্গেট প্র্যাকটিস করছে বেলফোর। শেরপারা তার এই আচরণে রীতিমত ক্ষুব্ধ। কারণটা রানা উপলব্ধি করতে পারছে। গুলির আওয়াজ দেবতাদের অসন্তুষ্ট করবে।

'মন্টি, এটা কী করছ তুমি?' কঠিন সুরে জিজ্ঞেস করল রানা।

'দেখে কী মনে হচ্ছে তোমার? আঙুলের জড়তা কাটাচ্ছি, রানা। তোমাকে গুলি করার সময় যেন সমস্যা না করে।'

'শেরপারা দুঃখ পাচ্ছে, মন্টি। এ-সব বন্ধ করো।'

ঘাড় ফিরিয়ে রানার দিকে তাকাল বেলফোর। 'শেরপারা দুঃখ পেলে আমার কিছু করার নেই।'

'আমি বলছি পিস্তলটা তুমি সরাও।' তার দিকে এক পা এগোল রানা।

কাঁধ ঝাঁকিয়ে একটা পাথরের উপর পিস্তলটা রাখল বেলফোর, তারপর নিজের পাশ থেকে একটা আইস অ্যাক্স তুলে নিল। 'ঠিক আছে, এসো, আইস অ্যাক্স ছুঁড়ে দেখি কার হাতের টিপ কেমন। চলে এসো, রানা! বলো, কত করে বাজি?'

কথা না বলে মাথা নাড়ল রানা। তাঁবু থেকে অনেকেই ইতোমধ্যে বেরিয়ে এসেছে, তাদের মধ্যে লাবণ্যকেও দেখল ও।

'সে কী! তুমি আমার সঙ্গে খেলতে ভয় পাচ্ছ? নাকি তৃতীয় বিশ্বের পকেট খালি?'

'তুমি স্কুলছাত্রের মত করছ, মন্টি।'

আগে থেকে কিছু বুঝতে না দিয়ে হাতের কুড়ালটা অকস্মাৎ রানার দিকে ছুঁড়ে মারল বেলফোর। রানার ডান পায়ের এক ইঞ্চি দূরে জমিনে গাঁথল সেটা।

প্রচণ্ড রাগে কুড়ালের হাতলটা ধরে হ্যাঁচকা টান দিল রানা। 'ঠিক আছে, মন্টি। এসো, খেলি।'

'এই তো চাই!' সশব্দে হেসে উঠে আরেকটা কুড়ালের খোঁজে এদিক ওদিক তাকাচ্ছে বেলফোর। 'দেখা যাক, দু'জনের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ।' বব মার্লোর কুড়ালটা হাত বাড়িয়ে নিল সে। 'বব, প্লিজ, বোতল আর ক্যানগুলো একটু সাজিয়ে দাও। ভাল কথা,' ঘাড় ফিরিয়ে রানার দিকে তাকাল, 'কী বাজি ধরবে? বিদ্রূপ করছি না, তবে জানি সঙ্গে করে বেশি টাকা আনোনি তুমি, কাজেই বাজি জিতে ধনী হবার কোন সুযোগ আমার নেই–'

'আইডিয়াটা তোমার, মন্টি। তুমিই বলো।'

নিঃশব্দ হাসির সঙ্গে চারদিকে চোখ বুলাচ্ছে বেলফোর। লাবণ্যকে দেখতে পেল–চোখ বড় বড় করে তার দিকেই তাকিয়ে আছে।

'বেশ। যে জিতবে সে ডাক্তার লাবণ্যের সঙ্গে শুতে পারবে।'

'হোয়াট?' প্রবল এক ঝাঁকি খেয়ে আঁতকে উঠল লাবণ্য। 'কী বললে তুমি?'

রানা বলল, 'এ-সব কী, মন্টি? ছিহ্! তুমি এতটা নীচ–'

লাবণ্যের উদ্দেশে কেতাদুরস্ত ভঙ্গিতে মাথা নোয়াল বেলফোর। 'ভীষণ দুঃখিত, মাই ডিয়ার। স্রেফ ছোট্ট একটা কৌতুক।'

ইতোমধ্যে নিজেকে সামলে নিয়েছে লাবণ্য। হাসল সে। 'জানি। এ-ও জানি যে কৌতুকটা তুমি আসলে তোমার জননীকে নিয়ে করেছ, আমাকে নিয়ে নয়।' ঘুরে চলে যাচ্ছে সে।

'কেমন লাগল?' টিপ্পনী কাটল রানা।

শুনতে না পাওয়ার ভান করে বেলফোর বলল, 'আমি শ্রেষ্ঠ, এই বোধটাই হবে আমার পুরস্কার। ঠিক আছে?'

'বেশ।'

'শুরু করব?' জানতে চাইল বেলফোর।

ঠোঁটের কোণ বাঁকা করে একটু তাচ্ছিল্যের হাসি হাসল রানা। 'কেউ তোমাকে ধরে রাখেনি।'

রানার উদ্দেশে অবজ্ঞাসূচক মুখভঙ্গি করে টার্গেটের দিকে ফিরল বেলফোর। পোর্টেবল টেবিল, পাথর আর ক্যানভাস ব্যাগের উপর পাঁচটা বোতল আর পাঁচটা ক্যান রাখা হয়েছে।

আইস অ্যাক্স তুলে ছুঁড়ল বেলফোর। প্রথম বোতলটাকে নিখুঁতভাবে ফেলে দিল ওটা। হেসে উঠল সে। 'তোমার পালা, রানা।'

সরে এসে পজিশন নিল রানা, ওজনটা অনুভব করবার জন্য আইস অ্যাক্স ঘন ঘন এক হাত থেকে আরেক হাতে নিল, তারপর ছুঁড়ে দিল ক্ষিপ্রবেগে। দ্বিতীয় বোতলটা চুরমার হয়ে গেল।

'বাহ, দারুণ, রানা! তবে টার্গেট ভাঙতে পেরেছ বলে একটা পয়েন্ট দাবি

কোরো না আবার।'

কুড়ালগুলো সংগ্রহ করে খেলোয়াড়দের হাতে ফিরিয়ে দিল বব মার্লো। দুজনের এই চ্যালেঞ্জ আর প্রতিযোগিতা টিমের সবার মধ্যেই উত্তেজনার সৃষ্টি করেছে। কৌতূহল দমাতে না পেরে ডাক্তার লাবণ্যও আবার ফিরে এল।

আবার কুড়াল ছুঁড়ল বেলফোর। তৃতীয় বোতলটাকে দু'ইঞ্চি দূর থেকে পাশ কাটাল সেটা। 'ধুস শালা!'

পজিশনে দাঁড়িয়ে লক্ষ্যস্থির করল রানা, ছুঁড়ল অলস একটা ভঙ্গিতে। তৃতীয় বোতলটা তুষারে ছিটকে পড়ল।

তৃতীয়বার কুড়াল ছুঁড়তে যাচ্ছে বেলফোর। ছুঁড়ল। দুর্ভাগ্যই বলতে হবে, একচুলের জন্য মিস করল চতুর্থ টার্গেট। 'মর শালা!' গালিটা সম্ভবত নিজেকেই দিল সে।

রানা ভাবল, নিজের উপর নিয়ন্ত্রণ হারাচ্ছে মন্টি। তার আচরণে যুক্তি খুব কমই থাকছে। এএমএস-এর শিকার নয়তো?

চতুর্থ বোতলটা ফেলে দিল রানা, ফলে রাগ আরও একটু বাড়ল বেলফোরের। তবে তার কপাল আবার অত খারাপ নয়–পঞ্চম বোতলটা গুঁড়িয়ে দিল সে।

টিন ক্যান নিয়ে খেলা শুরুর একটু পরই দেখা গেল রানা দুই পয়েন্টে এগিয়ে আছে। টার্গেট বাকি আর মাত্র দুটো।

সময় নিয়ে লক্ষ্যস্থির করল বেলফোর, ক্যান ফেলে দিল। বাকি থাকল আর মাত্র একটা।

নিজের পজিশনে ফিরে এল রানা, লক্ষ্যস্থির করল, তারপর ছুঁড়ল। ক্যানটাকে স্পর্শ না করে বেরিয়ে গেল কুড়াল। দর্শকদের হতাশাব্যঞ্জক নিঃশ্বাস শ্রুতিগোচর হলো।

'ওহ্, তোমার সেই চিরকেলে মন্দ কপাল,' বলল বেলফোর, চতুর শিয়ালের মত হাসছে। নিজের কুড়ালটা মার্লোর হাত থেকে নিয়ে অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে লক্ষ্যস্থির করল। তারপর ধীরে ধীরে কুড়াল ধরা হাতটা তুলল। সেটা ছুঁড়ল গায়ের জোরে।

ক্যানের বদলে পাথরে আঘাত করল কুড়াল। ওটার উপরই রাখা ছিল ক্যানটা। পাথর ঝাঁকি খাওয়ায় ক্যানটা তুষারের উপর গড়িয়ে পড়ল।

'হাহ্! খেলা ড্র!' চেঁচিয়ে উঠল বেলফোর।

'না, মন্টি, ড্র হয়নি,' বলল রানা। 'তুমি ক্যানে লাগাতে পারোনি। লাগিয়েছ পাথরে।'

'তবু শালার টিনটা পড়েছে তো।'

এবার বব মার্লো নাক গলাল। 'ইয়ে, মানে, আমি যেহেতু এই প্রতিযোগিতার আনঅফিশিয়াল রেফারি, এ-ব্যাপারে মিস্টার রানার পক্ষই আমাকে সমর্থন করতে হবে, মন্টি। তুমি ক্যানে সত্যি লাগাতে পারোনি।'

'তোমাকে কোন শালা জিজ্ঞেস করেছে?' মার্লোর উদ্দেশে খেঁকিয়ে উঠল বেলফোর।

'তারচেয়ে মিস্টার রানাকে আরেকবার ছুঁড়তে দেয়া হোক,' দর্শকদের মধ্যে থেকে কেউ একজন বলল।

'হ্যাঁ, সেটা মন্দ হয় না।'

বেলফোর রাগে ফুঁসছে। 'ঠিক আছে, রানা। তুমি যদি লাগাতে পারো, বেশ, তোমারই জিত হবে। কিন্তু যদি মিস করো, জিতব আমি।'

'সেটাও আসলে ড্র হবে,' মনে করিয়ে দিল মার্লো।

'শাট আপ!' ধমক দিল বেলফোর। 'তুমি আসলে কার দলে বলো তো?'

'ঠিক আছে, মন্টি,' বলল রানা। 'আমি মিস করলে তুমি জিতবে।' আইস অ্যাক্সটা নিল ও, মার্লোর বসানো নতুন ক্যানটার উপর সমস্ত মনোযোগ এক করে ছুঁড়ল সেটা।

বন বন করে ঘুরে এগোল কুড়াল, লাগল কাছাকাছি একটা পাথরে, ধাক্কা খেয়ে ফেরত আসবার সময় ক্যানের গায়ে আঘাত করল। সেই সঙ্গে দর্শকরা উল্লাসে ফেটে পড়ল।

'উফ, কী সৌভাগ্য!'

'সত্যি দেখাল বটে!'

চোখে আগুন নিয়ে রানাকে দেখছে বেলফোর। 'তুমি চিট করেছ।'

'কীভাবে? খেলাটা তোমার ছিল। কোন নিয়মের কথা বলা হয়নি।'

রানার বুকে একটা আঙুল ঠেকাল বেলফোর। 'তুমি চিরকাল আমার ঘৃণার পাত্র, রানা। একদিন তোমার সঙ্গে আমার একটা শেষ বোঝাপড়া হবে।'

নিজের জায়গা ছেড়ে এক চুল নড়ল না রানা, তবে একটা কথাও বলছে না। রাগের মাথায় এখন যদি বেলফোরের সঙ্গে গুরুতর বিরোধে জড়িয়ে পড়ে, তাতে ওর অ্যাসাইমেন্টেরই ক্ষতি হবার বেশি সম্ভাবনা। ওর দলে রঘু ছাড়া আর কেউ নেই। বেলফোরের দলে ক'জন আছে জানা না গেলেও, সাদা চামড়ার সবাই তার হয়ে কাজ করলেও রানা অবাক হবে না।

প্লেনটার কাছে পৌঁছানো প্রথম কর্তব্য। তারপর দেখা যাবে।

উত্তপ্ত পরিবেশ ডাক্তার লাবণ্যই ঠাণ্ডা করল। 'মন্টি, মায়ের জাতকে নিয়ে তুমি যতই কটুকাটব্য করো, একজন ডাক্তার হয়ে আমি আমার রোগীর প্রতি অবহেলা দেখাতে পারি না। আমি চাই এখনি তুমি বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়ো।'

'কে তোমার রোগী? আমি?' বিদ্রূপের সুরে জিজ্ঞেস করল বেলফোর।

'হ্যাঁ, তুমি। তোমার মধ্যে আমি এএমএস-এর লক্ষণ দেখতে পাচ্ছি।'

'অসম্ভব–'

'একটা লক্ষণ হলো–যাই বলা হোক, অস্বীকার করা।'

বেলফোর লক্ষ করল টিমের সবাই তাকে দেখছে। 'ঠিক আছে, তোমার কথায় রানাকে এখন আমি ছেড়ে দিচ্ছি। কিন্তু ওকে আমি এখনই চ্যালেঞ্জ দিয়ে রাখলাম–কাঞ্চনের চূড়ায় ওর আগে উঠব আমি।'

'কিন্তু আমি তো চূড়ায় উঠতে চাই না,' বলল রানা।

'তারমানেই তুমি একটা কাপুরুষ।' হেসে উঠল বেলফোর।

'অন সেকেন্ড থট,' বলল রানা। 'যদি আমি উঠি, উঠব চূড়া থেকে তোমাকে

ফেলে দেয়ার জন্যে।'

'ও.কে.। দেখা যাবে কে কাকে ফেলে।'

পনেরো

এক হপ্তা পর রওনা হলো ওরা।

টিমের সামনে থাকল বেলফোর আর অ্যালভারেজ। ওদের পিছনে পারকার আর মার্লো। নিয়ম হলো ক্লাইম্বাররা জোড়ায় জোড়ায় থাকবে। এরপর রানা আর রঘু। এরপর দু'জন শেরপা, হাওয়ার্ড ফিলবিকে তাপলেজাং-এ রেখে বেস ক্যাম্পে যারা ফিরে এসেছে–অনন্ত আর নিশুতি। লঙ্গিনাস আর নর্টন গ্রিজ সবার পিছনে।

ক্যাম্প ওয়ান পাঁচ হাজার পাঁচশো মিটার উঁচু। তুষারস্রোতের তৈরি প্রান্তিক রেখা, ঢালু পাথরের রাজ্য আর গ্ল্যাসিয়ারের উপর দিয়ে হাঁটতে হবে ওদেরকে। গত হপ্তায় এ-ধরনের পথে অন্তত একবার সবাই হাঁটা প্র্যাকটিস করেছে। তবে ওদের দুর্ভাগ্য যে যাত্রার প্রথম দিনই বাতাস হয়ে উঠল ঝড়ের মত, সেই সঙ্গে তাপমাত্রা বেশ অনেকটা নেমে গেল।

প্রথম দিকে বরফে পিটন গেঁথে উপরে উঠতে খুব একটা সমস্যা হলো না। টেকনিক্যাল কলাকৌশল দরকার হলো আপার গ্ল্যাসিয়ারে পৌঁছানোর পর। একজন লোক চড়বে, তার সঙ্গী রশির সাহায্যে তার নিরাপত্তার ব্যবস্থা করবে। এই সাহায্যকারীকে বলা হয় বিলেয়ার। রশিটার এক মাথায় থাকবে অ্যাঙ্কার বা ক্র্যাম্পূন, সেটা পাথর বা বরফে আটকানো হবে। ক্লাইম্বার উপরে উঠবার সময় বিলেয়ার হয় রশি টানবে নাহয় ছাড়বে–যখন যেমন দরকার–একই সঙ্গে ক্লাইম্বারের পতন ঘটছে দেখলে প্রচলিত বিভিন্ন কৌশলের একটা ব্যবহার করে সেটা ঠেকাবার জন্যও প্রস্তুত থাকবে।

বেলফোর আগে আছে। নীচে থেকে রশি ছুঁড়ে সুবিধে করে দেওয়া হয়েছে তাকে। খাড়া পাহাড়ের গা বেয়ে গাঁথা বা আটকানো অ্যাঙ্করের কাছে পৌঁছাবে সে, তারপর হয় ওখান থেকেই নয়তো সুবিধেজনক কোন জায়গা থেকে আরেক প্রস্থ রশি ছুঁড়ে উপরে কোথাও অ্যাঙ্কর বা ক্র্যাম্পূন আটকাবে। ক্লাইম্বারদের মধ্যে শেষ লোকটা রশির অংশবিশেষ গুটিয়ে নেবে, নিজে উঠবে উপর থেকে ফেলা রশি ধরে।

কোনরকম অঘটন ছাড়াই রঘুকে নিয়ে ক্যাম্প ওয়ানে পৌঁছাল রানা। কিন্তু তারপরই আশ্চর্য একটা অনুভূতি হলো ওর. ও যেন ভয়ঙ্কর কোন বিপদের মধ্যে আছে। ভয় লাগছে, যে-কোন মুহূর্তে জিএম তার কুৎসিত ফণা তুলে ছোবল মারবে।

ভোরে রানা আর রঘুর ঘুম ভাঙাল শেরপারা। তারা ওদের জন্য গরম চা নিয়ে এসেছে।

স্লিপিং ব্যাগ থেকে আড়ষ্ট ভঙ্গিতে বেরিয়ে এল রানা, কয়েক মিনিট খক্ খক্ করে কাশল, তারপর চুমুক দিল ধূমায়িত মগে। নিজের ব্যাগ থেকে বেরুল রঘুও।

পাহাড়ে চড়বার মাসুল দিতে হচ্ছে দু'জনকেই। রানা ঘুমের ভিতরও অস্থিরতা বোধ করেছে, বিদঘুটে সব স্বপ্ন দেখেছে–হাই অলটিচ্যুডে এটা প্রায় স্বাভাবিকই। চিন্তার বিষয় হলো যত উপরে উঠছে ওরা, পরিস্থিতি ততই খারাপের দিকে যাচ্ছে। আজ ওরা ছয় হাজার মিটারে উঠবে। অক্সিজেনের জন্য ব্যাকুল হতে আর বেশি দেরি নেই।

বেলফোর নিজের তাঁবুটাকে ক্যাম্প ওয়ানের হেডকোয়ার্টার বলে ঘোষণা করেছে। তার এ-ধরনের মাতব্বরি সয়ে গেছে সবার। টিমের সবাইকে ডেকে ছোট একটা লেকচার ঝাড়ল সে।

'আমাদের মাথার ওপর যে আইস গ্ল্যাসিয়ারটা রয়েছে, ওটা ধরে আজ আমরা আরও পাঁচশো মিটার ওপরে উঠব। ওখানে ক্যাম্প টু সেট করা হবে।'

'বরফের ছোট আকৃতির কিছু ধাপ পাওয়া যাবে, রশি বাঁধতে কোন সমস্যা হবে না,' বলল অ্যালভারেজ।

'ছোট বলতে আবার খুব ছোট নয়,' বলল বেলফোর। 'একেকটা দশ থেকে বিশ মিটার লম্বা। তবে রশি আটকাতে কোন সমস্যা হবে না। সবার শরীর কেমন?'

'ভাল,' বলল কেউ কেউ, বাকি সবাই মাথা ঝাঁকাল।

'চলুন, তা হলে বেরিয়ে পড়ি।'

টিম কালকের ছকেই এগোল, বেলফোর আর অ্যালভারেজ আগে। রশি ঝোলাতে বিশেষ অসুবিধে হলো না। নিঃশব্দে উঠছে ওরা। বাতাস যত পাতলা হয়ে আসছে, তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে প্রতি পদক্ষেপে কমে যাচ্ছে ওদের শক্তি।

মাঝ দুপুরে ক্যাম্প টু-তে পৌঁছাল ওরা। নেতিয়ে পড়বার অবস্থা সবার। টমাস পারকার স্বয়ং গাইডদের একজন, বরফে হাঁটু দিয়ে পড়ল, অক্সিজেনের অভাবে ঘন-ঘন হাঁপাচ্ছে। বেলফোর ছাড়া এরা কেউই আসলে কাঞ্চনজঙ্ঘার এত উপরে আগে ওঠেনি।

শেরপা নিশুতিকে তার উপর নজর রাখবার দায়িত্ব দেওয়া হলো। বাকি সবাই ব্যস্ত হয়ে পড়ল তাঁবু খাটাতে।

কয়েক মিনিটের মধ্যে নিজের উপর নিয়ন্ত্রণ ফিরে পেল রানা। একমাত্র বেলফোর ছাড়া আর কারও মধ্যে এএমএস-এর লক্ষণ প্রকাশ পায়নি।

দুটো তাঁবুতে খেতে বসল ওরা। রানা আর রঘুর সঙ্গে বসল বেলফোর আর অ্যালভারেজ। বেলফোর তার সেলফোন বের করে মেমোরি ডায়াল পাঞ্চ করল। 'ক্যাম্প টু টু বেস। ক্যাম্প টু কলিং বেস।'

'হ্যালো? মিস্টার বেলফোর?' ডুনো কারমেলের কণ্ঠস্বর।

'মিস্টার কারমেল, আমরা পৌঁছেছি। আমি ক্যাম্প টু থেকে বলছি।'

'অভিনন্দন!'

'নীচে আপনাদের খবর কী?'

'সবাই একটু অস্থিরতা বোধ করলেও সিনেমা দেখে ভালই সময় কাটছে।

ডাক্তার জানতে চাইছেন আপনারা কেমন আছেন।'

'বলুন ভাল আছি। আমার বন্ধুদের একজন, গাইড পারকারের একবার একটু শ্বাসকষ্ট হয়েছিল, তবে এখন ভাল আছে। কাল আমরা ক্যাম্প থ্রিতে যাব, তারপর আপনাদের জন্যে অপেক্ষা করব।'

'ঠিক আছে।'

ফোন রেখে দিয়ে খাওয়ায় মন দিল বেলফোর।

একটু পরই বাইরে থেকে কারও কণ্ঠস্বর ভেসে এল, 'এই, বাইরে এসো!'

'কে···কার গলা?' জিজ্ঞেস করল বেলফোর।

'গলার আওয়াজ শুনে মনে হচ্ছে নর্টন গ্রিজ,' বলে মাথা দিয়ে ফ্ল্যাপ সরিয়ে মুখটা বাইরে বের করল রানা। কয়েক ফুট দূরে দাঁড়িয়ে রয়েছে নর্টন গ্রিজ, আঙুল খাড়া করে কী যেন দেখাচ্ছে।

'আসুন, দেখে যান,' বলল সে। তুষারে পড়ে থাকা গাঢ় একটা জিনিসকে ঘিরে ভিড় করেছে বাকি লোকজন।

রানার পিছু নিয়ে সবাই বেরিয়ে এল তাঁবু থেকে। তুষার আর বরফের উপর দিয়ে ঢাল বেয়ে খানিকটা উঠল ওরা ব্যাপারটা কী জানবার জন্য।

'ভাবছি কতদিন ধরে এখানে আছে ও,' বলল গ্রিজ, বরফে পরিণত হওয়া জিনিসটার দিকে আবার আঙুল তাক করল।

মানুষের একটা কঙ্কাল, পুরোদস্তুর ক্লাইম্বিং গিয়ার পরা।

সে-রাতে রানার স্বপ্নগুলো আতঙ্কের উৎস হয়ে উঠল। একবার একটা তুষার ধসে চাপা পড়ল, দম বন্ধ হয়ে মারা যাচ্ছে, শরীর পরিণত হচ্ছে শক্ত বরফে। হাত দিয়ে উন্মত্তের মত তুষার সরাতে গিয়ে অভিযাত্রী দলের সবার কঙ্কাল পেয়ে গেল। ওগুলোর মধ্যে একটা মন্টি বেলফোরের ভঙ্গিতে কথা বলে উঠল: 'ওহ্, তোমার কপাল মন্দ! কোনকালেই তুমি সেরা ছিলে না, রানা। তবে সেরা হওয়ার চেষ্টা করেছ। এখন নিজের দিকে তাকাও!'

একটা ঝাঁকি খেয়ে ঘুম ভেঙে গেল। আসলে রঘু ওকে ঝাঁকাচ্ছে। 'ভাইয়া, আগুন লেগেছে! উঠুন!'

'হোয়াট?' বিস্ময়ের ধাক্কা খেয়ে স্বপ্নের ঘোরটা কেটে গেল রানার। প্রথমেই লক্ষ করল, ঠাণ্ডা বাতাস ফুসফুসে হামলা করছে। কিছুক্ষণ কাশল ও।

'একটা তাঁবুতে আগুন লেগেছে!'

স্লিপিং ব্যাগ থেকে ছিটকে বেরিয়ে এল রানা, তাড়াতাড়ি বুট পরে রঘুর পিছু নিয়ে বেরিয়ে এল বাইরে। সূর্য মাত্র উঠছে, ওদের চারপাশের বরফে আশ্চর্য এক অপার্থিব কমলা আভা ছড়িয়ে পড়েছে।

একটা জ্বলন্ত তাঁবুর চারপাশে ছুটোছুটি করে তিনজন লোক আগুন নেভাবার চেষ্টা করছে। তাঁবুটা কার মনে করবার জন্য এক মুহূর্ত চিন্তা করতে হলো রানাকে।

'লঙ্গিনাস?'

'সে বেরিয়ে এসেছে। ওই যে, ওদিকে।' হাত তুলে দেখাল রঘু। যে তিনজন

আগুন নেভাবার চেষ্টা করছে তাদেরই একজন সার্ডিক লঙ্গিনাস। কম্বল আর কোদাল ব্যবহার করছে তারা। সাহায্য করবার জন্য লাফ দিয়ে এগোল রানা আর রঘু। কয়েক মিনিটের মধ্যেই নিভে গেল আগুনটা।

'কী করে ঘটল?' জিজ্ঞেস করল বেলফোর, হোঁচট খেতে খেতে ছুটে এল এইমাত্র। তার গলার আওয়াজ ভাঙা আর কর্কশ।

'শালার বাজ পড়া স্টোভটা!' বলল লঙ্গিনাস। 'পানি ফোটাবার চেষ্টা করছিলাম, তাঁবুতে আগুন ধরে গেল। দেখুন অবস্থা, সব শেষ।'

'কী কী গিয়ার হারিয়েছেন?'

'ঠিক জানি না। অতিরিক্ত কাপড়চোপড় গেছে।' পোড়া, আধ পোড়া আবর্জনার ভিতর থেকে কিছু কাপড়চোপড় আর টুলস বের করল লঙ্গিনাস। 'এগুলো বেঁচেছে, ঈশ্বরকে ধন্যবাদ।'

'ক্যাম্প থ্রিতে না পৌঁছানো পর্যন্ত আমার কিছু কাপড় ধার নিতে পারবেন উনি,' অ্যালভারেজ বলল। 'দু'জনের সাইজ তো একই হবে, মিস্টার লঙ্গিনাস?'

'বোধহয়। ধন্যবাদ।'

খানিক পর ব্রেকফাস্ট খেতে বসল সবাই। কারও মাথাই ঠিকমত কাজ করছে না, চিন্তা-ভাবনায় ত্রুটি বা গলদ থেকে যাচ্ছে।

ব্রেকফাস্টের পর একটা তাঁবুর সামনে রুট ম্যাপ নিয়ে আলোচনায় বসল ওরা। আজই প্রথম একটা বড় বাধার সামনে পড়তে হবে ওদেরকে। গ্ল্যাসিয়ার পেরোবার পর মুখোমুখি হতে হবে তথাকথিত 'আইস বিল্ডিং'-এর। ওদের সামনে দুটো পথ খোলা থাকবে। সহজ রুট হলো, বরফের খাড়া একটা ঢাল বেয়ে ছয়শো মিটার ওঠা। ঢালটা আইস বিল্ডিঙের বাম পাশের একটা আইস ওয়ালে। তারপর ঘুরে যাবে টিম, প্রথম তুষার মালভূমি পেরিয়ে ছয় হাজার ছয়শো মিটারে সেট করবে ক্যাম্প থ্রি। তবে এটা হবে খুবই খাড়া আরোহণ, প্রতিটি ইঞ্চি রশি ধরে ধীরে উঠতে হবে। জাপানিরা সরাসরি আইস বিল্ডিং বেয়ে উঠেছিল, এটাকেই বলা হচ্ছে বিকল্প রুট। সম্ভব, কিন্তু অত্যন্ত বিপজ্জনক। দীর্ঘ আলোচনার পর সিদ্ধান্ত হলো আইস বিল্ডিঙের বাম পাশ বেয়েই উঠবে ওরা, তারপর দিক বদলে, গ্ল্যাসিয়ার পেরিয়ে ফিরে আসবে কাঞ্চনজঙ্ঘার উত্তর মুখে।

আলোচনার এই পর্যায়ে লঙ্গিনাসের খোঁজ করল বেলফোর। এতক্ষণে সবার খেয়াল হলো, টিমের একজন সদস্য ওদের মধ্যে নেই।

'উনি হয়তো নিজের জিনিস-পত্র গুছিয়ে রাখছেন,' বলল গ্রিজ।

এই সময় পায়ের আওয়াজ পেয়ে ঘাড় ফেরাল সবাই। লঙ্গিনাস তাদের দিকেই হেঁটে আসছে, প্যাক করা গিয়ার নিয়ে রওনা হবার জন্য তৈরি। 'দুঃখিত,' বলল সে। 'কিছু মিস করলাম?'

'তেমন কিছু না,' বলল বেলফোর। 'আপনি শুধু আমাদের পিছু নেবেন। আমরা দশ মিনিটের মধ্যে রওনা হব।'

'আইস বিল্ডিং' অনেকগুলো স্তর নিয়ে ভারী সুন্দর অথচ অত্যন্ত বিপজ্জনক একটা আকৃতি, আসলে জিনিসটা বরফের টানেল ছাড়া কিছুই নয়। মালভূমিতে উঠবার জন্য শর্টকাট পথ হিসাবে ওটাকে ব্যবহার করা যেত, কিন্তু গাইডরা সবাই

বরফ ধসের আশঙ্কাটাকেই বড় করে দেখল। তাদের নির্দেশিত বাম ঢাল বেয়ে উঠছে ওরা।

ঢালটা পঁয়তাল্লিশ থেকে সত্তর ডিগ্রি খাড়া। তবে খানিক দূর উঠে একটা নালা পাওয়া গেল।

নালার অর্ধেকটা পেরিয়ে এসেছে, এই সময় রশি আটকানোর দায়িত্ব চাপল রানা আর রঘুর উপর। অ্যাঙ্কারে রশি আটকাচ্ছে রঘু, বেলফোর আর অ্যালভারেজের রেখে যাওয়া রশি ধরে উঠছে রানা। ওদের কাছ থেকে একশো মিটার উপরে রয়েছে তারা।

সামনের পথ সবচেয়ে খাড়া। আর ঠিক এই সময় অকস্মাৎ রানার বুটের তলা থেকে ছিটকে বেরিয়ে গেল ক্র্যাম্পুন। পায়ের তলায় কিছু নেই, রশি নিয়ে দ্রুত নেমে যাচ্ছে শরীর। বরফে পিঠ দিয়ে আইস অ্যাক্সের সাহায্যে নিজেকে থামাবার চেষ্টা করল রানা, কিন্তু কুড়াল ঠিকমত গাঁথতে পারছে না। রানার এই অবস্থা দেখে দ্রুত তৎপর হয়ে উঠল রঘু, হাতের রশি শক্ত করে ধরে রাখল।

ত্রিশ ফুট নামবার পর টান টান হলো রশি। প্রচণ্ড ঝাঁকি খেল রানা, শিরদাঁড়া সম্ভবত মাঝখান থেকে ভেঙে গেছে। আইস অ্যাক্সটা হাত থেকে ছুটে গেল, ব্যথায় চিৎকার বেরিয়ে এল গলা চিরে।

'ঝুলে থাকুন, ভাইয়া!' রঘুর ব্যাকুল কণ্ঠস্বর ভেসে এল।

রশির সঙ্গে ভারী একটা বস্তার মত ঝুলছে রানা। সবাই জানে কী ঘটেছে, ফলে স্থির হয়ে গেছে প্রত্যেকে।

'কী ঘটল?' উপর থেকে জানতে চাইল বেলফোর।

'ভাইয়া?' আবার ডাকল রঘু। 'আপনার হুঁশ আছে?'

মাথা একটু তুলে একটা হাত নাড়ল রানা।

'দোল খেয়ে পাঁচিলের দিকে যেতে পারবেন? তারপর পা রাখার একটা জায়গা খুঁজে নেবেন?'

'চেষ্টা করি,' বলল রানা। বাতাসে পা ছুঁড়ে দোল খেতে শুরু করল ও। বারকয়েক এদিক-ওদিক দুলে বরফের পাঁচিলের নাগাল পেলেও হাত দিয়ে ধরবার মত কিছু পেল না। এমন কিছুও নেই যাতে পা বাধানো যায়।

আবারও দোল খেতে শুরু করল রানা, তবে দিক সামান্য বদলে। বরফ প্রাচীরের গায়ে গাঁথা একটা অ্যাঙ্কর দেখতে পেয়েছে ও। প্রথমবার নাগাল পাওয়া গেল না। তারপর ধরতে পারল। ওখানে আরেক প্রস্থ রশি পাওয়া গেল, সেটা বেয়ে সাবধানে নামছে রানা। একটা কারনিসে এসে থামল, ইতোমধ্যে সেখানে পৌঁছে গেছে রঘু।

'কী হয়েছিল? আপনি ঠিক আছেন তো?' জিজ্ঞেস করল রঘু।

'আছি। তবে ভীষণ ভয় পেয়েছিলাম। শালার ক্র্যাম্পুন! বুটের তলা থেকে ছিটকে বেরিয়ে গেল!'

'এমন তো হবার কথা নয়।'

'কোথায় ওগুলো? তুমি পড়তে দেখেছ?'

'মনে হয় দেখেছি। ওদিকে কোথাও।' সাবধানে কারনিস ধরে খানিক দূর

এগোল ওরা। একটা ক্র্যাম্পূন পাওয়া গেল, দ্বিতীয়টা গভীর খাদে পড়ে গেছে।

সেটা তুলে নেড়েচেড়ে পরীক্ষা করল রানা। যে রিঙের ভিতর স্ট্র্যাপ ঢুকবে সেটা একটু বাঁকা করা হয়েছে, ফলে দুই মিলিমিটার মত একটা ফাঁক দেখা যাচ্ছে। মুহূর্তের জন্য চোখ থেকে গগলস খুলে ভাল করে দেখল রানা।

'রিঙটা ফাইল দিয়ে ঘষা হয়েছে,' বলল ও। 'দেখো, এটার কিনারায় খুদে দাঁত তৈরি হয়েছে। সন্দেহ নেই, কেউ একজন কারিগরি ফলিয়েছে!'

'শেষবার কখন দেখেছিলেন?'

'কেন, কাল সন্ধ্যায়। তারপর সারারাতই তো আমার তাঁবুতে ছিল। কে…?'

এক মুহূর্ত চিন্তা করল রানা। 'লঙ্গিনাস। ব্রেকফাস্টের সময় মীটিঙে বসে টিম, মনে আছে? মীটিঙে লঙ্গিনাস ছিল না। আমাদের তাঁবুতে ঢুকে স্যাবটাজ করার সময় পেয়েছে সে।'

মাথা ঝাঁকাল রঘু। 'সম্ভব। এ-ও হতে পারে যে তার আগে আগুনটা সে ডাইভারশন তৈরি করার জন্যে লাগিয়েছিল।'

এই সময় দু'জন শেরপা ওদেরকে ধরে ফেলল। লঙ্গিনাস আর গ্রিজ তাদের পিছনে আছে, খুব বেশি দূরে নয়। খানিকক্ষণ অপেক্ষা করতেই কারনিসে উঠে আসতে দেখা গেল তাদেরকে।

দেখেই হাসি হাসি মুখ করে রানা বলল, 'আমার ক্র্যাম্পূন খুলে গেছে। আপনাদের কারও কাছে স্পেয়ার থাকলে দিন।'

গ্রিজ বলল, 'আমার কাছে আছে। তবে ফিট করবে কি না জানি না। কী ঘটেছিল?'

'কী জানি। যেভাবেই হোক খুলে যায় আর কি।' সরাসরি লঙ্গিনাসের দিকে তাকিয়ে আছে রানা। লোকটা ওর দৃষ্টি এড়াবার জন্য অন্যদিকে তাকাল।

ব্যাকপ্যাক খুলে ভিতরে হাত গলাল গ্রিজ। একজোড়া ক্র্যাম্পূন পাওয়া গেল। ধারাল স্পাইকে কাপড় জড়ানো, অন্যান্য গিয়ারের যাতে ক্ষতি না হয়। রানার বুটে একটু ছোট হলেও, ফিট করল।

'ধন্যবাদ। ক্যাম্প থ্রিতে দেখা হলে বাকি সবাইকে আরও আনতে বলে দেব।'

'নীচে আসলে কী ঘটছে বলো তো?' জিজ্ঞেস করল বেলফোর। বেশ অনেকটা দূরে রয়েছে সে।

রঘুর সংকেত পেয়ে আবার সবাই উঠতে শুরু করল।

চার ঘণ্টা পর মালভূমিতে পৌঁছাল ওরা, সী লেভেল থেকে ছয় হাজার ছয়শো মিটার উপরে। সবাই কাশছে: চেষ্টা করছে ধীরে ধীরে, বড় করে শ্বাস নিতে।

'অক্সিজেনের ব্যবস্থা করা যায় না?' গ্রিজকে খুব বেশি হাঁপাতে দেখে জিজ্ঞেস করল রানা।

গাইডদের একজন, বব মার্লো, বলল, 'আরও উপরে না উঠলে আমাদের কারও অক্সিজেন দরকার নেই। আপনার যদি এখনই দরকার হয়, সবটুকু খরচ করে ফেলবেন। ক'টা যেন আনা হয়েছে?'

'তিনটে,' তাড়াতাড়ি জবাব দিল গ্রিজ। 'তবে শেরপাদের কাছে টিমের পুরো

সাপ্লাই আছে।'

তৃতীয় গাইড, টমাস পারকার, বলল, 'কিন্তু সবই আমাদের রেখে দিতে হবে। অক্সিজেন দরকার হবে ক্যাম্প ফাইভে, যেখানে প্লেনটা আছে।'

'ঠিকই বলছে ওরা,' দুই গাইডকে সমর্থন করল বেলফোর। 'প্লেনের কাছে কতক্ষণ থাকতে হয় কেউ আমরা জানি না। গ্রিজ, অক্সিজেন ছাড়াই চালিয়ে নেয়ার চেষ্টা করো, ঠিক আছে?'

কাশতে কাশতেই মাথা ঝাঁকাল গ্রিজ।

রানার দিকে তাকাল বেলফোর। 'ওখানে কী হয়েছিল তোমার?'

'কিছু না,' বলল রানা। স্যাবটাজের কথাটা প্রচার করে কাউকে সতর্ক করতে চাইছে না ও। 'ক্র্যাম্পূন খুলে গিয়েছিল। নিশ্চয়ই ভাল করে আটকাইনি আমি। আমারই দোষ।'

'এ-ধরনের কিছু আর যেন না ঘটে, রানা। তোমাকে আমার যতই অসহ্য লাগুক, হারাতে হলে কষ্ট পাব।'

'ধন্যবাদ, মন্টি। শুনে স্বস্তি পেলাম।'

নিজের তাঁবুর দিকে চলে গেল বেলফোর। ঘাড় ফিরিয়ে লঙ্গিনাসের দিকে তাকাল রানা, দেখাদেখি রঘুও। লঙ্গিনাস গ্রিজকে তাঁবু খাটাতে সাহায্য করছে।

লঙ্গিনাস দায়ী? নাকি অন্য কারও কাজ?

অন্তত ক্যাম্প থ্রিতে নিরাপদে পৌঁছানো গেছে। এখানে পরিবেশের সঙ্গে নিজেদেরকে খাপ খাইয়ে নেওয়ার জন্য এক হপ্তা থাকতে হবে ওদের। টিমের বাকি সবাই দু'একদিনের মধ্যে মিলিত হবে ওদের সঙ্গে।

তবে রানা জানে টিমের কেউ একজন ওর অস্তিত্ব মুছে ফেলতে চাইছে।

ষোলো

বাকি সবাই পরদিনই বেস ক্যাম্প থেকে কয়েক গ্রুপে ভাগ হয়ে আসতে শুরু করল। প্রথম গ্রুপে ডুনো কারমেল থাকল, নিজের ইকুইপমেন্টের সঙ্গে বয়ে নিয়ে এসেছে লাইটওয়েট ল্যাপটপ স্যাটেলাইট ফোন। তার সঙ্গী হয়ে পৌঁছাল ডাক্তার লাবণ্য। পৌঁছেই সে ঘোষণা দিল: 'আমার প্রথম কাজ লিড টিমের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা, তবে রাতটুকু অঘোরে না ঘুমিয়ে নয়। তাকে দেখে রানার বিশেষ সুস্থ বলে মনে হলো না, তবে তারপরই মনে পড়ে গেল ক্যাম্প থ্রিতে পৌঁছাতে ওর নিজের কেমন লেগেছিল।

পরদিন ডাক্তারের তাঁবুতে হাজির হলো ও।

বুকে স্টেথোস্কোপ লাগিয়ে রানার শ্বাস-প্রশ্বাস পরীক্ষা করবার সময় লাবণ্য জানতে চাইল, 'কেমন বোধ করছেন?'

তেরপলের উপর হাঁটু ভাঁজ করে মুখোমুখি বসেছে ওরা।

'এখন ভাল। তবে ক্যাম্প থ্রিতে পৌঁছে মনে হচ্ছিল নরকে আছি।'

'ভাল ঘুম দরকার।'
'আপনারও,' বলল রানা।
'এটা আমার চাকরি,' বলল লাবণ্য। 'কাশুন, প্লিজ।'
কাশল রানা। শুকনো আর অত্যন্ত কর্কশ শোনাল আওয়াজটা।
ভুরু কোঁচকাল লাবণ্য। 'গলায় ব্যথা আছে?'
'আছে।'
'কিছু লজেন্স দিচ্ছি। যথেষ্ট পানি খাচ্ছেন?'
'খাচ্ছি।' আবার কাশল রানা।
'তা হলে আরও বেশি করে খান।' ব্যাগ থেকে বের করে কিছু ভিটামিন সি আর ইউক্যালিপটাস লজেন্স দিল লাবণ্য। 'আপনার বাকি সব ঠিক আছে।'
'কমপ্লিমেন্ট বলে ধরে নিলাম।'
হাসল লাবণ্য, কিন্তু তারপরই কপাল কুঁচকে চোখ বন্ধ করল, চোখের এক পাশ আঙুল দিয়ে চেপে ধরেছে। 'উফ্! মাথাব্যথাটা যাচ্ছে না।'
'আপনার আসলে বিশ্রাম দরকার,' বলে একটু ঝুঁকল রানা, লাবণ্যের ঘাড়ের পিছনে একটা হাত রেখে ম্যাসাজ শুরু করল। হাসিটা ফিরে এল আবার।
'উম-ম্-ম্, ভাল লাগছে,' বলল লাবণ্য। 'পরবর্তী চব্বিশ ঘণ্টা এভাবে চালিয়ে যেতে পারবেন?'
'সিরিয়াসলি,' বলল রানা, 'আপনি পুরোপুরি সুস্থ তো?'
'হ্যাঁ, মাথাব্যথাটা ছাড়া। সেটাও ভাল হয়ে যাচ্ছে। এবার যান, আপনার সঙ্গীকে পাঠিয়ে দিন, প্লিজ।'
হাত ফিরিয়ে নিয়ে তাঁবু থেকে বেরিয়ে এল রানা।
এই ঘটনার প্রায় তিন ঘণ্টা পর রানা দেখল প্রায় ছুটে এসে লাবণ্যের তাঁবুতে ঢুকল বেলফোর। বাইরে দাঁড়িয়ে রয়েছে ডুনো কারমেল, হাবভাব দেখে মনে হচ্ছে হারিয়ে গেছে লোকটা, কী করবে না করবে জানে না। তার দিকে এগিয়ে জানতে চাইল ও, 'খারাপ কিছু ঘটেছে?'
'হ্যাঁ,' বলল কারমেল। 'ডাক্তার লাবণ্য অসুস্থ।'
তাঁবুর ভিতর মাথা গলাল রানা। লাবণ্যের পাশে হাঁটু গেড়ে রয়েছে বেলফোর। লাবণ্য স্লিপিং ব্যাগে শুয়ে। ওদের সঙ্গে গাইডদের একজন, বব মার্লোকে দেখা যাচ্ছে।
'আমরা ব্যাপারটা সামলে নিয়েছি, রানা, তুমি নিজের কাজে যেতে পারো,' খেঁকিয়ে উঠল বেলফোর।
'ঠিক আছে, আপনি থাকুন,' দুর্বল গলায় বিড়বিড় করল লাবণ্য। 'ভগবান, তুমি আমার মরণ দাও।'
'অ্যাকিউট অলটিচ্যুড সিকনেস,' রানাকে বলল মার্লো।
'আমার অনুভূতি হচ্ছে–মাথাটা যেন বিস্ফোরিত হবে,' বলল লাবণ্য। 'মা গো! এরকম আমার কক্ষনো হয়নি!' জোরে জোরে কাশছে সে, বড় করে শ্বাস নিতে গেলেই হাঁপিয়ে উঠছে।
'ডার্লিং ললিতা, তুমি নিজেই বলেছ, এটা যখন তখন যাকে খশি ধরতে

পারে,' বলল বেলফোর। 'এখন, প্লিজ, অনুমতি দাও, আমি তোমাকে ক্যাম্প টু-তে নামিয়ে নিয়ে যাই। যত দ্রুত সম্ভব নীচে পৌঁছাতে হবে তোমাকে। আমি বয়ে নিয়ে যাব–'

'চুপ করো, মন্টি!' ধমকে উঠল লাবণ্য। 'আমি কোথাও যাচ্ছি না। এটা কেটে যাবে। আমাকে নিয়ে ব্যস্ত হয়ো না তো। আই হেট ইট!'

'আমি শুধু চেষ্টা করছি–'

'প্লিজ, আমাকে শুধু একা থাকতে দাও! বেরোও এখান থেকে!' প্রায় চেঁচিয়ে উঠল লাবণ্য।

আড়ষ্ট হয়ে উঠল বেলফোর; শুধু বিব্রত নয়, রেগেও গেছে। সিধে হয়ে সরে এল সে, চোখ বুলাল রানার উপর, তারপর তাঁবু থেকে বেরিয়ে গেল।

'আমরা এখন কী করব?' লাবণ্যকে জিজ্ঞেস করল মার্লো।

'আমি দুঃখিত। মন্টি ঠিকই বলেছে। ক্যাম্প টু-তে নেমে যাওয়া দরকার। কিন্তু সে শক্তি সত্যি নেই আমার। তিন দিন হলো ঘুমাইনি, কিছু মুখে দিইনি, বাথরুমে যাইনি–' কেঁদে ফেলবার অবস্থা হলো তার, কিন্তু সে শক্তিও পাচ্ছে না।

'দাঁড়ান, আমি গেমাও ব্যাগ নিয়ে আসি,' বলল রানা।

তাঁবু থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে ও, লাবণ্য বিড়বিড় করল, 'আশ্চর্য, কথাটা আমার কেন মনে পড়েনি! উনি তো ওটার কথা অভিযানের শুরুতেই বলেছিলেন আমাকে।'

মেজর সাখাওয়াত হোসেনের মডিফাইড ডিভাইসটা শেরপাদের কাছ থেকে নিয়ে আবার তাঁবুতে ফিরে এল রানা। ভিতরে ঢুকে ব্যাগটা সীল করবার আগে ওকে ধন্যবাদ দিল লাবণ্য, সবাইকে জানাতে বলল আগামী কয়েক ঘণ্টা তাকে যেন একা থাকতে দেওয়া হয়। এয়ার পাম্প করবার জন্য ব্যাগটার যেহেতু নিজস্ব জেনারেটর আছে, মাত্র কয়েক মিনিটের মধ্যে বাতাসে ফুলে উঠল ওটা।

গেমাও ব্যাগ সাময়িকভাবে এএমএস-এর লক্ষণ দূর করে, তবে পুরোপুরি সুস্থ হবার জন্য রোগীকে সাধারণত নীচে নামতে হয়।

তাঁবু থেকে বেরিয়ে এসে গগলস্ পরা চোখ তুলে রানা দেখল সূর্য এখনও আকাশের যথেষ্ট উপরে রয়েছে, তারমানে রাত নামবার আগেই ক্যাম্প টু-তে পৌঁছাবার সময় পাবে লাবণ্য। নামতে স্বভাবতই অনেক কম সময় লাগে।

ডুনো কারমেলের কাছে চলে এল রানা। তার স্যাটেলাইট লিঙ্কআপটা একবার ব্যবহার করতে চায় শুনে তাঁবুতে ওকে একা রেখে বেরিয়ে গেল সে।

টেলিফোনের অপরপ্রান্তে প্রিয়বন্ধু সোহেলকে পেল রানা। 'ছয় হাজার ছয়শো মিটার উপর থেকে বলছি। লঙ্গিনাস সম্পর্কে কিছু জানা গেছে?'

'না, তবে নেপালে অনন্ত মিশ্রের রিপ্লেসমেন্ট কমল থাপার কাছ থেকে ইন্টারেস্টিং ইন্টেলিজেন্স পাওয়া গেছে।'

'যেমন?'

'কাঠমাণ্ডুতে ওরা জিএম-এর কমিউনিকেশন আড়ি পেতে শুনেছে। যে লোকটা ওখানে তোকে খুন করতে চেষ্টা করেছিল সে আসলেই জিএম-এর ভাড়া করা খুনী। তার এক সহকারীকে অ্যারেস্ট করেছে নেপালি পলিশ।'

'তারপর?'

'সে তার জবানবন্দিতে স্বীকার করেছে যে তোদের টিমে জিএম ঢুকে পড়েছে। তাদের সংখ্যা বা পরিচয় সম্পর্কে অবশ্য কিছুই জানা যায়নি।'

'এরকম একটা ধারণা প্রথম থেকেই ছিল আমার।'

'তোর কাউকে সন্দেহ হয়?'

'লঙ্গিনাস হতে পারে।'

'তার সঙ্গে জিএম-এর লিঙ্ক আছে জানতে পারলে আমি তোকে একটা কোড করা মেসেজে পাঠাব। শোন, আরও খবর আছে।'

'বল।'

'আমরা জানতে পেরেছি, রুশ অভিযানের খরচ যোগাচ্ছে মস্কোর কয়েকজন সামরিক কর্মকর্তা, যাদের সম্পর্কে এক মাইল লম্বা ফাইল আছে আমাদের অফিসে। শুধু এটুকু বলি, এরা সবাই রুশ মাফিয়ার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রাখে। মোদ্দা কথা, মাত্র একটা কারণেই কাঞ্চনজঙ্ঘায় উঠছে তারা।'

'টিপটা দেয়ার জন্যে ধন্যবাদ। রাখি–'

'পিছন দিকে খেয়াল রাখিস, দোস্ত।'

টেলিফোন ছেড়ে তাঁবু থেকে বেরিয়ে এল রানা। ওখানে দাঁড়িয়ে ঠাণ্ডায় ঠকঠক করে কাঁপছে ডুনো কারমেল।

'ধন্যবাদ। ভেতরে ঢুকে গরম হন তাড়াতাড়ি।'

'তা ঢুকছি। তবে এই একই কথা আপনি আপনার বন্ধুকেও বলতে পারেন।' ইঙ্গিতে বেলফোরের তাঁবুটা দেখাল কারমেল, তারপর নিজের তাঁবুতে ঢুকে পড়ল।

বেলফোরকে রানা বরফের একটা নিরেট বোল্ডারে আইস অ্যাক্স ছুঁড়তে দেখল। যেন একটা ঘোরের মধ্যে রয়েছে সে। কুড়াল ছুঁড়ল, হেঁটে গিয়ে তুলে আনল, আগের পজিশনে দাঁড়িয়ে আবার ছুঁড়ল–এভাবে বারবার।

রানা ভাবল তার সঙ্গে যোগ দেয়, তবে মন থেকে সায় পেল না।

তিন ঘণ্টা পর গেমাও ব্যাগ থেকে বেরিয়ে এসে ডাক্তার লাবণ্য জানাল, দু'দিনের জন্য ক্যাম্প টু-তে নামছে সে। রানা তার সঙ্গী হতে চাইল, কিন্তু লাবণ্য জানাল তার কোন প্রয়োজন নেই। স্বেচ্ছাসেবক হবার প্রস্তাব দিতে সাহসই হলো না বেলফোরের, তবে জোর দিয়ে বলল যে লাবণ্যের সঙ্গে একজন শেরপা যাবে।

দু'দিন পর নিজের তাঁবুতে বসে একটা থ্রিলার পড়ছে রানা, এই সময় ফ্ল্যাপ তুলে ভিতরে মাথা গলাল ডুনো কারমেল। 'আপনাকে আমি একটা জিনিস দেখাতে চাই, মিস্টার রানা।'

ডেনিশ লোকটার পিছু নিয়ে তার তাঁবুতে ঢুকল রানা। ল্যাপটপের মনিটরে ঝাপসা একটা ফটোগ্রাফ দেখা যাচ্ছে।

'দেখতে পাচ্ছেন, এটা একটা স্যাটেলাইট ফটো,' বলল কারমেল। 'স্পেস থেকে দেখা কাঞ্চনজঙ্ঘার উত্তর মুখ, তবে বহুগুণ ম্যাগনিফাই করা। দেখুন, এটা হলো আমাদের ক্যাম্প।' স্ক্রিনের একটা দাগের দিকে আঙুল তাক করল সে।

ধীরে ধীরে রানার উপলব্ধিতে ধরা পড়ছে, আসলে কী দেখছে ও।

'এদিকে একটা জিনিস রয়েছে, কাল যেটা ছিল না।' আরেকটা গাঢ় দাগের দিকে রানার দৃষ্টি আকর্ষণ করল কারমেল, ওদের সামান্য পুবে। 'রাশিয়ানদের ক্যাম্প।'

'আমরা জানতাম কাছাকাছি আছে ওরা,' বলল রানা। 'তাই বলে এত কাছে? কত দূরে হবে–এক হাজার মিটার?'

'কম। হয়তো আটশো মিটার।'

'ধন্যবাদ,' বলল রানা। 'আপনি ওদের ওপর একটা চোখ রাখুন, প্লিজ। কোন রকম তৎপরতা দেখলে অবশ্যই আমাকে জানাবেন।'

'হ্যাঁ, অবশ্যই,' বলল কারমেল, তারপর রানা চলে যাচ্ছে দেখে ডাকল, 'মিস্টার রানা?'

'ইয়েস?'

'কানে তো তুলো গুঁজে রাখিনি, তাই আপনার আর মিস্টার বেলফোরের কিছু কথাবার্তা শুনতে পেয়েছি। সে-সব থেকে বুঝেছি, প্লেন অ্যাক্সিডেন্ট তদন্ত করাই একমাত্র উদ্দেশ্য নয় আপনাদের। এটা সম্ভবত একটা সিক্রেট মিশন। ঠিক?'

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে দৈত্যাকার লোকটার কাঁধ চাপড়ে দিল রানা। 'দুঃখিত, মিস্টার কারমেল, ব্যাপারটা ক্লাসিফায়েড। শুধু এইটুকু জেনে রাখুন, প্লেনটা থেকে একটা জিনিস খুঁজে বের করতে হবে আমাকে। জিনিসটা আমাদের–বাংলাদেশের।'

'আর মিশনও বোধহয় একটা নয়, দুই বা তারচেয়েও বেশি, কী বলেন?'

'হ্যাঁ, প্রতিদ্বন্দ্বী থাকাটা স্বাভাবিক।'

কাঁধ ঝাঁকাল কারমেল। 'ঠিক আছে, আমি অনধিকার চর্চা করতে চাই না। তবে কখনও যদি মনে হয় আমি কোন সাহায্যে আসব, বলতে ভুলবেন না। দ্যাট'স অল।'

'ধন্যবাদ। আপনার সাহায্য অনেক আগে থেকেই নিচ্ছি আমি,' বলে তার তাঁবু থেকে বেরিয়ে এল রানা।

ফিরবার পথে ডাক্তার লাবণ্যকে দেখতে পেল ও। 'হ্যালো। কখন ফিরলেন?'

'এক ঘণ্টা হলো,' বলল লাবণ্য। হাত তুলে নিজের তাঁবুটা দেখাল রানাকে। 'আমি ওখানে।'

'গলার আওয়াজ তো একদম স্বাভাবিক।'

'আমার সবই এখন স্বাভাবিক।' হাসল লাবণ্য। 'আসলে এখানে প্রথমবার আসার আগে ক্যাম্প টু-তে অতিরিক্ত আরও দু'দিন থাকা উচিত ছিল আমার। এবার তো উঠতে আমার প্রায় কোন অসুবিধেই হয়নি। জানেন, পুরো চার ঘণ্টাও নিইনি।'

'আপনি ফিরে আসায় আমি খুশি,' বলল রানা।

'ওহ্, শুনুন মশাই, গেমাও ব্যাগের জন্যে প্রণাম জানাই, সেই সঙ্গে এককোটি ধন্যবাদ। ওটার জন্যেই তো বাবা-মা আমাকে হারাননি।'

'এভাবে বলবেন না। আপনাকে আমি ডিনার খাওয়াতে পারি?' সুযোগ মত প্রস্তাবটা দিয়ে বসল রানা।

হেসে উঠল লাবণ্য। 'আপনি দেখছি হাল ছাড়তে জানেন না। এখানে আপনি আমাকে কোথায় ডিনার খেতে নিয়ে যাবেন, শুনি?'

অবশেষে সিদ্ধান্ত হলো পরিবেশের সঙ্গে যথেষ্ট অভ্যস্ত হওয়া গেছে, কাজেই এবার ক্যাম্প ফোর-এ ওঠা যায়। মার্লো, পারকার আর অ্যালভারেজ বেলফোরকে নিয়ে কয়েকবার প্র্যাকটিস রান-ও সম্পন্ন করেছে; তাদের রিপোর্ট হলো, ক্যাম্প ফোর-এ পৌঁছাতে দু'দিন লাগবে, খুব বেশি হলে তিন দিন।

প্রথম দিনটা সব দিক বিবেচনায় ভালই গেল। দ্বিতীয় দিন ত্রিশ ডিগ্রি উঁচু একটা ঢাল পড়ল সামনে, খাদের উপর দিয়ে এগিয়ে শেষ হয়েছে পাথুরে পাঁচিলে। শেরপারা ভাঁজ খুলল একটা অ্যালুমিনিয়াম মই-এর, বরফের মোটা চাদরের উপর ফেলা হলো সেটা। একজন নয়, তিনজন বিলেয়ার দিয়ে সাহায্য করল বেলফোরকে। সাবধানে মই বেয়ে পাহাড়-প্রাচীরে পৌঁছাল সে, পৌঁছেই অ্যাঙ্কার গাঁথল পাথরে। তারপর ঘুরল সে, ওদের দিকে তাকাল। এই সময় তার চোখ পড়ল খাদের নীচে।

'এই! নীচে মানুষ!' হাত তুলে দেখাল সে।

এক এক করে সবাই ওরা মই বেয়ে এপারে চলে এল। পাশাপাশি দাঁড়িয়ে নীচে তাকিয়ে দৃশ্যটা দেখছে সবাই। খাদের নীচে ওটা একটা লাশ। কোন মহিলা। গায়ে আলগা ভাবে একটা কম্বল জড়ানো। দেখে মনে হলো এতটুকু পচন ধরেনি।

'নিশ্চয়ই প্লেনটার কোন প্যাসেঞ্জার,' বলল রানা। 'কাপড়চোপড় দেখেই তো বোঝা যাচ্ছে, ওগুলো ক্লাইম্বিং ড্রেস ন.।'

সিদ্ধান্ত হলো, সার্চ করবার জন্যে লাশটা তোলা দরকার। রশি আর অ্যাঙ্কারের সাহায্যে শেরপারা নীচে নেমে লাশটা তুলে আনল।

মহিলা নীল জিনস, টেনিস শূ আর একটা সোয়েট শার্ট পরে আছে। প্রেশারাইজড একটা প্লেনে একজন ট্যুরিস্টের এরকম ড্রেসই পরবার কথা। প্লেন ক্র্যাশ করবার পরও বেঁচে ছিল, চেষ্টা করেছে পাহাড় থেকে নামবার।

বরফ ভেঙে মহিলার গা থেকে কম্বলটা খুলল রানা। সার্চ করে একটা আমেরিকান পাসপোর্ট পাওয়া গেল।

'সেরেনা মেলোডি, ঠিকানা ওয়াশিংটন ডি.সি,' বলল রানা। 'তারমানে মার্কিন সিনেটরের স্ত্রী ইনি।'

মাথার খুলিটা ফাটা দেখে অ্যালভারেজ মন্তব্য করল, 'বেচারি পড়ে গিয়েছিলেন।'

বেলফোর বলল, 'লাশটা আপাতত এখানেই থাকুক। আজ রাতে ক্যাম্প থ্রিতে নামিয়ে নেয়া যাবে।'

সবাই বিষণ্ন মনে আবার রওনা হলো। সামনের চড়াইটা খুব কঠিন, কাজেই মনোযোগ হারানো চলবে না।

অবশেষে ক্যাম্প ফোর-এ পৌঁছাল ওরা। পরদিন আবার বেরিয়ে পড়ল সবাই, গন্তব্য 'দা গ্রেট সিক্রি টেরেস', সাত হাজার নয়শো মিটার উপরে।

মার্লো আর গ্রিজ অক্সিজেন নিচ্ছে।

শুরু থেকে একত্রিশ দিনের মাথায় লিড টিম শেষ পর্যন্ত ওদের গন্তব্যে পৌঁছাল।

গ্রেট সিক্রি টেরেস আশ্চর্য, প্রায় অপ্রার্থিব একটা স্বল্প ঢালু মালভূমি, এত সাদা যে চোখ ধাঁধিয়ে যায়। এত উঁচুতে এরকম একটা মালভূমি কল্পনায় সহজে আসে না। বাকি পাহাড় আর মাত্র ছয়শো ছিয়াশি মিটার উঁচু, মালভূমির উপর খাড়া হয়ে আছে ভয়ঙ্কর প্রহরীর মত।

শেরপারা ক্যাম্প ফাইভ সেট করতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। রানা, বেলফোর আর রঘু ওদের সামনে ছড়িয়ে থাকা ধ্বংসাবশেষ পরীক্ষা করছে। ভাঙা একটা ডানা তুষার আর বরফের ভিতর অর্ধেকটা ডুবে রয়েছে। লেজের কয়েকটা টুকরো পাওয়া গেল ওখান থেকে চল্লিশ মিটার দূরে। আরও ষাট মিটার দূরে পাওয়া গেল ফিউজিলাজ, প্রায় অক্ষত অবস্থায়। দ্বিতীয় ডানাটা হয় তুষার আর বরফের নীচে পুরোপুরি ডুবে গেছে, নয়তো বিচ্ছিন্ন হয়ে খসে পড়েছে মালভূমি থেকে।

কেবিনের দরজাটা হাঁ-হাঁ করছে। প্লেন থেকে যদি কেউ কোনদিকে গিয়েও থাকে, অনেক আগেই তার পায়ের ছাপ চাপা পড়ে গেছে।

রানা যথেষ্ট দৃঢ়কণ্ঠে বলল কথাটা: 'প্লেনের ভেতরে সবার আগে আমাকে ঢুকতে হবে।'

সবাই জানে কার উদ্দেশে বলা হয়েছে কথাটা। সে-ই জবাব দিল। কাঁধ ঝাঁকাল বেলফোর। 'বী মাই গেস্ট।'

'এসো, রঘু,' হাঁটু সমান গভীর তুষার ভেঙে প্লেনটার দিকে এগোবার সময় ডাক দিল রানা।

সতেরো

একটা টর্চ জ্বেলে অন্ধকার কেবিনে ঢুকল রানা। জানালা দিয়ে ঢোকা আলো এত ম্লান যে ভিতরে ভৌতিক একটা পরিবেশ তৈরি হয়েছে, গা ছমছম করে উঠল রানার। গর্ত দিয়ে তুষার ঢুকে ফিউজিলাজের বহু জায়গায় স্তূপ হয়ে আছে। কেবিনের ভিতর বাতাসের একটানা একটা হাহাকার আছে, স্নায়ুর জন্য পীড়াদায়ক।

প্রায় সব সিটেই লাশ রয়েছে।

ককপিটে আলো ফেলল রানা। পাইলট আর কো-পাইলট যে যার সিটে বসা; সামনের দিকে নুয়ে আছে, ঠাণ্ডায় জমে জমাট বরফ। আরেকজন লোককে দেখা গেল ককপিট আর কেবিনের মাঝখানের আইল-এ। পোশাক দেখে ক্রু বলে মনে হলো না।

'হাত লাগাও, একে তুলি,' রঘুকে বলল রানা।

তোলা মানে সিধে করা। চিৎ করতে মুখটা দেখা গেল। মুখের অর্ধেকটা কালো বরফ। আসলে লাল রক্ত কালো হয়ে গেছে। লোকটার ঘাড়ে একটা বুলেটের গর্ত।

এই লোকের ফটো দেখেছে রানা। 'হাইজ্যাকারদের একজন।'

মাথা ঝাঁকাল রঘু। 'আমার মনে আছে।'

'এসো, ওদিকে দেখি।' লাশ টপকে মেইন কেবিনে ফিরে এল রানা। লাশগুলো এরইমধ্যে গোনা হয়ে গেছে ওর। 'প্যাসেঞ্জারদের জন্যে প্লেনে সিট ছিল বারোটা। আর ক্রু বলতে পাইলট, কো-পাইলট, অ্যাটেনড্যান্ট।' হাত তুলে সিঙ্গেল সিটে বসা এক তরুণীকে দেখাল ও, প্যাসেঞ্জারদের দিকে মুখ করে বসে আছে। 'এই মেয়েটা। ফ্লাইটে সিট বুক করেছিল দশজন প্যাসেঞ্জার। তারমানে দুটো খালি সিট থাকার কথা, ঠিক? আমি নয়টা লাশ গুণলাম।'

'ক্যাম্প ফোরের কাছে পাওয়া মহিলাকে নিয়ে দশটা,' বলল রঘু।

'কিন্তু তিয়েন চাও আর তিন হাইজ্যাকারকে নিয়ে হয় চোদ্দ। একজন হাইজ্যাকারকে পেয়েছি, হলো এগারো। বাকি তিনটে লাশ গেল কোথায়?'

'দাঁড়ান, ভাইয়া, এখানে একজন চেয়ারে বসে নেই,' বলল রঘু, হাতের টর্চ কেবিনের পিছন দিকে তাক করে রেখেছে। এই লোকটার কাপড়চোপড়ও ককপিটের কাছে পাওয়া হাইজ্যাকারের মত।

'হ্যাঁ, এ-ও তাদের একজন,' লাশটা পরীক্ষা করে বলল রানা। 'তারমানে, আর দু'জনকে পাওয়া যাচ্ছে না। এখন দেখা যাক প্যাসেঞ্জারদের মধ্যে তিয়েন চাও আছে কিনা।'

প্লেনের দু'দিকে টর্চের আলো ফেলল দু'জন, এক এক করে প্রতিটি লাশের মুখ দেখছে। লাশগুলো সবই বিভিন্ন বয়সী শ্বেতাঙ্গদের। অন্তত তিনজন চোখ খুলে তাকিয়ে আছে, দৃষ্টিতে জমাট ভয়।

'সর্বনাশ, রঘু!' রানা হতাশ। 'প্লেনে তো সে নেই!'

'ভাইয়া, আমি ভাবছি, ওই মহিলা যদি প্রাণে বেঁচে গিয়ে কেবিন থেকে বেরিয়ে যেতে পারেন, তিয়েন চাও-ও তো তা পারে, তাই না? কিংবা বাকি হাইজ্যাকার? তবে কেউ তারা বেশিদূর যেতে পারেনি। আশপাশেই কোথাও পাওয়া যাবে।'

'যদি না ওই মহিলার মত পাহাড়ের মুখ থেকে খসে পড়ে গিয়ে থাকে।'

প্লেন থেকে বেরিয়ে এসে রানা দেখল বেলফোর আর মার্লো ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করছে। বেশি দূরে নয়, উদ্বিগ্ন একটা ভাব নিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে কারমেল; তার পিঠের কাছেই দেখা যাচ্ছে লঙ্গিনাসকে।

'তো?' জিজ্ঞেস করল বেলফোর।

'প্লেনে নেই সে,' বলল রানা। 'আমরা আশপাশটা সার্চ করতে যাচ্ছি। আমার সঙ্গে একা শুধু রঘু থাকবে।'

'নেই? নেই মানে? ঠিক জানো?' বেলফোরের গলায় সন্দেহ।

'নিজে দেখছ না কেন?' জিজ্ঞেস করল রানা। 'তা ছাড়া, তিয়েন চাও তো

তোমার মাথাব্যথা নয়।'

'স্কিন-সেভেনটিন তোমাদের, এটা আমি মেনে নিয়েছি। আসলে কখনোই অস্বীকার করিনি। তবে উদ্ধার করতে পারলে অবশ্যই ওটা আমি ইংল্যান্ডে ফিরিয়ে নিয়ে যাব। তারপর দরদাম নিয়ে ব্রিটিশ সরকার বাংলাদেশ সরকারের সঙ্গে একটা সমঝোতায় আসবে–'

মুহূর্তের জন্য রানা ভাবল, বেলফোর জিএম-এর অপারেটর হতেও পারে। কিন্তু তা কী সম্ভব? সাধারণত রানার ইন্সটিঙ্কট অত্যন্ত ধারাল, কিন্তু আকাশের এত কাছাকাছি এসে ওর অনুভূতি আর রিফ্লেক্স ভোঁতা আর শ্লথ হয়ে গেছে। সবাইকে সন্দেহ করছে ও।

'আমরা চাওকে খুঁজতে যাচ্ছি।' রঘুকে নিয়ে হাঁটা ধরল রানা।

নিজেকে সামলে নিয়ে বাকি সবার দিকে তাকাল বেলফোর। 'হ্যাঁ, আসুন, ক্যাম্প তৈরি করি।'

দ্বিতীয় দিন ক্যাম্প ফাইভ তৈরি হয়ে গেল, টিমের বাকি সবাই উঠেও এল অকুস্থলে। গাইডরাসহ নেপাল সরকারের সকল কর্মচারী বিশেষ একটা দায়িত্ব নিয়ে এখানে পৌঁছেছে, সেটা হলো উদ্ধার করা সবগুলো লাশ কাঠমাণ্ডুতে নিয়ে যেতে হবে। দেরি না করে স্যালভিজ অপারেশন শুরু করে দিল তারা। প্রথম কাজ প্লেন থেকে সরিয়ে ক্যাম্প ফোরে লাশগুলো নামানো, প্রতিবার একটা করে। নীচের চারটে ক্যাম্পেই কর্মীদের প্রস্তুত থাকতে বলা হয়েছে। এক পাল চমর গরু ব্যবস্থা করেছে সর্দার, লাশগুলো বেস ক্যাম্প থেকে নিয়ে তাপলেজাং-এ পৌঁছে দেবে, ওখান থেকে প্লেনে করে পাঠানো হবে কাঠমাণ্ডুতে।

তিনদিন পার হয়ে গেল, তিয়েন চাও বা বাকি হাইজ্যাকারের কোন হদিশ বের করতে পারল না রানা।

সাত হাজার নয়শো মিটারে শারীরিক পরিবর্তন বিস্মিত করছে ওদেরকে। রানা অনুভব করছে ওর হাত-পা স্লো মোশান-এ নড়ছে। ব্যাপারটা ডাইভিং সুট পরে পানির তলায় থাকবার মত। নিশ্ছিদ্র গরম কাপড় মুড়ে রেখেছে ওকে, ত্বকের প্রতিটি ইঞ্চি ঢাকা, পিঠে বহন করছে অক্সিজেন ক্যানিস্টার আর মুখের ভিতর ঢুকে পড়েছে একটা হোস।

রানার উদ্বেগ হলো, টিম হয়তো আগামী তিনদিন চলবার মত যথেষ্ট অক্সিজেন সঙ্গে করে নিয়ে আসেনি।

কারমেলের ল্যাপটপের সাহায্যে ঢাকায় একটা মেসেজ পাঠিয়েছে রানা, বিসিআই হেডকোয়ার্টারকে জানিয়েছে প্লেনে তিয়েন চাও নেই। সোহেলের মাধ্যমে রাহাত খান নির্দেশ পাঠিয়েছেন, নেপালিদের স্যালভিজ অপারেশন শেষ না হওয়া পর্যন্ত অনুসন্ধান চালিয়ে যেতে হবে ওকে।

ক্লান্ত এবং হতাশ, তাঁবু থেকে বেরিয়ে এসে ওর সঙ্গীকে দেখতে পেল রানা। 'ধুত্তোর, রঘু!' বলল ও। 'তুমি নিজে যদি প্লেনটা থেকে এই মালভূমিতে বেরিয়ে আসতে, কোন দিকে যেতে বলো তো?'

'আমি নীচে নামার চেষ্টা করতাম…ওদিক দিয়ে,' বলল রঘু, হাত তুলে দক্ষিণ

দিকটার ঢালটা দেখা।

'ওদিকটা প্রথমেই দেখেছি, মনে আছে?'

'আবার হয়তো দেখা দরকার, ভাইয়া। ওদিকে অনেক ফাটল আছে, সবগুলোয় আমরা উঁকি দিইনি।'

'কথাটা মন্দ বলোনি। সেদিন বরফ খুব নড়বড়ে অবস্থায় পেয়েছিলাম আমরা।' তারপর রানার মনে পড়ল। 'আমরা কিন্তু মালভূমির পুবদিকটাও দেখিনি। চলো, ওদিকটা আগে দেখে আসি।'

তুষার ঠেলে এগোচ্ছে ওরা, বেলফোরের হাঁক-ডাক শোনা গেল।

'শালার জ্বালাতন আর কী!' বলল রানা। 'এসো, দেখি আবার কী চায় সে।'

ঘুরে ক্যাম্প হেডকোয়ার্টারে চলে এল ওরা। দেখা গেল সবাই এখানে জড়ো হয়েছে। ওদের জন্য অপেক্ষা না করেই লেকচার ঝাড়তে শুরু করে দিয়েছে বেলফোর।

'...গরুগুলোকে বেল ক্যাম্পে আনা হয়েছে, কিন্তু এর বেশি আর কিছু করার উপায় নেই আমাদের। ওহ্, রানা, তোমরা এসেছ। আমি এদেরকে বলছিলাম, এখানে আমাদের থাকবার সময় কমিয়ে আনতে হবে। যত তাড়াতাড়ি নেমে যাওয়া যায় ততই ভাল।'

'কেন?' জানতে চাইল রানা। 'কী ঘটল?'

'ঘটেনি, ঘটতে যাচ্ছে।'

'মানে?'

'ঝড় আসছে,' বলল কারমেল। 'কয়েক মিনিট আগে ওয়েদার রিপোর্ট পেয়েছি আমি। পর পর দুটো ঝড় আসছে এদিকে, আপার অলটিচ্যুডে আঘাত হানবে আজ রাতে।'

'বড় ঝড়?'

'মারাত্মক। সঙ্গে মরশুমের প্রথম বৃষ্টি। একটা আজ, একটা কাল।'

'থাকতে হলে শেল্টার বানাতে হবে,' বলল বেলফোর। 'নয়তো নেমে যেতে হবে।'

'আমাদের পক্ষে এখনই নামা সম্ভব নয়,' বলল রানা। 'আমাদের তাঁবু যথেষ্ট মজবুত, দু'একটা ঝড় অবশ্যই ঠেকাতে পারবে। আমরা ঝড় চলে না যাওয়া পর্যন্ত থাকছি।'

'জানতাম এ-কথাই বলবে। আমিও চাই না ব্যর্থ হয়ে ফিরে যাও তুমি।' বেলফোর ইতস্তত করছে।

গাইডদের একজন, পারকার, বলল, 'সেক্ষেত্রে যার যার ওপর ছেড়ে দেয়া হোক নীচে নামবে না এখানে থাকবে। ঝড় আসার আগে আমাদের কেউ কেউ ক্যাম্প থ্রি পর্যন্ত নামার সময় পাবে। পরদিন বেস ক্যাম্পে পৌঁছানো যাবে। শুধু মনে রাখতে হবে এখানকার কাজ শেষ করার জন্যে আবার সবাইকে ফিরে আসতে হবে।'

'কতটুকু বাকি আছে?' জানতে চাইল অ্যালভারেজ।

'শেষ করতে আরও দু'দিন লাগবে, আজকের বাকি সময়টা বাদ দিয়ে। দিনে

তিনটের বেশি লাশ নামানো সম্ভব নয়। বাকি আছে ছয়টা।'

'আপনি কী বলেন?' বেলফোরকে জিজ্ঞেস করল গ্রিজ।

'আমি থাকছি।'

'আমিও,' জানাল লাবণ্য।

শিরদাঁড়া খাড়া করল বেলফোর। 'না, তুমি থাকছ না।'

'শোনো, আমার ব্যাপারে–'

'ডার্লিং, তোমার কোন কথাই আমি–'

'কে তোমার ডার্লিং, হ্যাঁ? বললাম না, আমি থাকব!' খেপে উঠল লাবণ্য।

তার দিকে চোখ গরম করে তাকাল বেলফোর। 'বেশ, ভাল কথা। আর কে থাকতে চান?'

দেখা গেল রানা, বেলফোর, রঘু, লাবণ্য, কারমেল, অ্যালভারেজ, মার্লো, পারকার, লাসনাস আর তিনজন শেরপা ছাড়া বাকি সবাই নেমে যাবে। তবে সবাই প্রতিশ্রুতি দিল যে দু'দিন পর ঝড় কেটে গেলে ফিরে আসবে তারা।

একটা ব্যাপারে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই, ভাবল রানা–যারা থাকতে চাইছে তাদের মধ্যে অবশ্যই জিএম-এর এজেন্ট আছে।

সবাই চলে যাবার এক ঘণ্টা পর বাড়তে শুরু করল বাতাসের গতিবেগ।

মালভূমির পুব দিকের শেষ মাথায় নিখোঁজ লোকগুলোকে খুঁজছে রানা, এই সময় ওর সেল ফোন বেজে উঠল। গ্লাভস পরা হাত পারকার পকেটে ডুবিয়ে সেটা বের করা এক মহা ঝামেলার ব্যাপার।

'ভাইয়া, আমি বোধহয় ওদেরকে পেয়েছি!' অপরপ্রান্তে রঘু উত্তেজিত।

'কোথায় তুমি?'

'যেখানে ওরা থাকতে পারে বলে ভেবেছিলাম। একটা ফাটলের ভেতর। চলে আসুন, ভাইয়া।'

মালভূমিটা এত বড় যে রঘুর কাছে পৌঁছাতে প্রায় এক ঘণ্টা লেগে যাবে রানার।

দুপুরের শেষদিকে ওখানে পৌঁছাল ও। বাতাসের ক্ষিপ্রতা আরও বেড়েছে। আকাশেও শুরু হয়েছে কুৎসিত দর্শন মেঘের বিরতিহীন মিছিল। ওদের হাতে খুব বেশি সময় নেই।

রঘু ওকে পথ দেখিয়ে প্রথমে একটা ফাটলের উপর দিয়ে একশো ফুট হাঁটিয়ে নিয়ে এল, এটার উপর প্রকৃতির তৈরি আইস ব্রিজ রয়েছে। আরও পঞ্চাশ ফুট দূরে দ্বিতীয় ফাটলটা। ভিতরে আঁটসাঁট হয়ে আটকে আছে দুটো লাশ।

'তুমি সত্যি একটা রত্ন, হে। ধন্যবাদ, রঘু। ওগুলো ওখান থেকে তুলে আনতে লোকজনের সাহায্য লাগবে,' বলল রানা।

ফোনে অ্যালভারেজকে পাওয়া গেল। সে আসতে না আসতে শুরু হল তুষারপাত। তারপর দেখা গেল, একা আসেনি, বেলফোরকেও নিয়ে এসেছে। বাতাসের গতি বাড়ায় ফ্রিজিং পয়েন্ট থেকে আশি ডিগ্রি নীচে নেমে গেল তাপমাত্রা। হাত তুলে ওদের দুজনকে লাশ দুটো দেখাল রানা।

বেলফোর বলল, 'কাল পর্যন্ত অপেক্ষা করলে ভাল হয়, প্রথম ঝড়টা পার না হওয়া পর্যন্ত। মিস্টার কারমেল বলছিলেন, দুটো ঝড়ের মাঝখানে বারো ঘণ্টা পরিচ্ছন্ন আবহাওয়া পাব আমরা।'

'আমি এখনি নামছি,' বলল রানা। 'হাতে কম করেও এক ঘণ্টা সময় আছে। রঘুকে রশি লাগাতে সাহায্য করো তোমরা।'

'তুমি পাগলামি করছ, রানা। তবে ঠিক আছে। আমারও প্রচণ্ড কৌতূহল হচ্ছে।'

লাশগুলোর কাছে পৌঁছাতে চল্লিশ মিনিট লাগল রানার। একটা জেড-পুলি সিস্টেম সেট করেছে ওরা, বিশেষ করে দুর্গম-বরফের রাজ্যে ভারী জিনিস-পত্র নিরাপদে তোলাতুলিতে এটা খুব কাজ দেয়।

ফাটলের এক দেয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে অপর দেয়ালে পা বাধিয়েছে রানা। এভাবে একটু একটু করে নামতে হলো। প্রথম লাশটাকে বরফ থেকে ছাড়িয়ে সিধে করতে আইস অ্যাক্স ব্যবহার করতে হলো। এটা তৃতীয় হাইজ্যাকারের মৃতদেহ।

দ্বিতীয় লাশটা আরও পাঁচ ফুট নীচে। ফাটল ক্রমশ সরু হয়ে যাওয়ায় নড়াচড়ার জায়গা কমে যাচ্ছে রানার। রঘু ঠিক মতই রশি ছাড়ছে। লাশের কাছে পৌঁছাবার পরও ওটার চারপাশের লোহার মত শক্ত বরফ ভাঙতে বিশ মিনিট লেগে গেল।

'বাতাস বাড়ছে, রানা,' ফোনে বলল বেলফোর। 'তাড়াতাড়ি উঠে এসো।'

'প্রায় শেষ করে এনেছি,' বলল রানা। 'আর পাঁচ মিনিট।'

অবশেষে লোকটার মুখে লেগে থাকা চাদরের মত বরফ ভেঙে ফেলল রানা। চেহারাটা অবিকৃত, তাই চিনতে কোন সমস্যা হলো না। লোকটা তিয়েন চাও।

'পেয়েছি তাকে,' ফোনে বলল রানা। 'বগলের নীচে রশি বাঁধছি, তোমরা টেনে তোলো।'

বেলফোর, অ্যালভারেজ আর রঘু রশি টেনে লাশটা ফাটলের মুখে তুলে এনেছে, এই সময় ভয় ধরানো প্রচণ্ডতার সঙ্গে আঘাত হানল ঝড়।

'যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তাঁবুতে ফিরতে হবে!' চিৎকার করছে বেলফার, কিন্তু বাতাসের গর্জনে তার কথা প্রায় চাপা পড়ে গেল।

একটা প্লাস্টিক স্লেজে চাও-এর লাশ ফেলা হলো, তারপর চারজন ছুটল ক্যাম্পের দিকে। ইতোমধ্যে ঝড় রুদ্রমূর্তি ধারণ করেছে। কোথায় যাচ্ছে ওরা নিজেরাও বলতে পারবে না।

তারপর রানা সবাইকে পথ দেখাল, হাত তুলে দেখাল কোথায় ওর তাঁবুটা। 'তোমরা থেমো না,' তাগাদা দিল ও। 'যে যার নিজের তাঁবুতে চলে যাও।'

রানার তাঁবুতে বেলফোর জোর করে ঢোকে কী করে। অ্যালভারেজকে নিয়ে চলে যেতে হলো তাকে।

রঘুর সাহায্যে চাও-এর লাশ একটা স্লিপিং ব্যাগে ভরল রানা। তারপর বলল, 'তুমিও তোমার তাঁবুতে যাচ্ছ, তবে ঘুমাতে নয়। চোখ-কান যতটা সম্ভব খোলা রেখে সতর্ক থাকবে। আর ফোনটা যেন সব সময় হাতের কাছে থাকে।'

রঘু চলে যেতে তাঁবুর ফ্ল্যাপ বন্ধ করে দিল রানা, কিন্তু তারপর বাতাসের গর্জনে কান পাতা দায় হয়ে উঠল। একটা লাশের সঙ্গে রাত কাটানোর শখ কারুরই হবে না, কিন্তু জিএম অপারেটরের ভয়ে রানা কোন ঝুঁকি নিতে রাজি নয়। কেউ পাহারায় আছে জানলে সে বা তারা লাশের কাছে আসবার আগে দশবার ভাববে।

রানার অনুরোধে লাবণ্য ধারাল, চোখা কিছু ইন্সট্রুমেন্ট আর টুল আগেই রেখে গেছে তাঁবুতে, তবে সে জানে না এগুলো দিয়ে কী করবে ও।

লাশ জমে বরফ হয়ে আছে। হিটার অন করা আছে। একটা স্টোভও জ্বালল রানা। ফ্রস্টবাইট চিকিৎসার জন্য ব্যবহার করা হয়, এরকম স্ট্যান্ডার্ড-ইস্যু কেমিক্যাল হট প্যাকস চাও-এর বুকে বসিয়ে জ্বালল ও। গায়ের কাপড়চোপড় লোহার মত শক্ত করে রাখা বরফ এবার গলতে শুরু করল।

দশ মিনিটের মধ্যে চাও-এর শার্ট খুলে বুকটা বের করতে পারল রানা। চামড়া ঠাণ্ডা আর শক্ত। লাশের বুকের উপর দিকটা সাবধানে পরীক্ষা করে চামড়ার পকেট দেখতে পেল রানা, যেখান দিয়ে পেসমেকারটা ঢোকানো হয়েছে। জায়গাটায় সম্প্রতি কোন কাটাকুটি করা হয়নি।

রানাকে এখন চামড়া নরম না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে।

বাইরে ফুঁসছে প্রকৃতি। সময় কাটাতে তাঁবু খুলে প্রবেশ মুখটা পনেরো মিনিট ধরে পরিষ্কার করল রানা। বড় একটা ঝড়ের পর অনেক পর্বতারোহী তাঁবুর ভিতর মারা যায়। তুষারের বিশাল স্তূপ অনেক সময় গোটা একটা তাঁবু মুড়ে ফেলে, শাবল ছাড়া আটকা পড়লে ওই তাঁবু থেকে কার সাধ্য বেরোয়।

তাঁবুতে ফিরে এসে চাও-এর চামড়া পরীক্ষা করল রানা। এখনও রাবার রাবার লাগছে, তবে কাটবার মত নরম হয়েছে।

লাবণ্যের টুলস থেকে একটা স্ক্যালপেল নিয়ে লাশের বুকের চামড়া চারকোনা করে কাটছে রানা। কাজটা সহজ নয়, যেন লেদার কাটছে। চৌকো ঘর তৈরি হবার পর একটা কোণা ধরবার জন্য কাঁচি ব্যবহার করল ও, তারপর টেনে চামড়া তুলে নিতে নীলচে-বেগুনি ভিতরের মাংস আর গোল্ড-প্লেটেড পেসমেকারটা দেখতে পেল।

স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল রানা। ভাল করে দেখবার জন্য মুখ থেকে অক্সিজেন মাস্কটা খুলে ফেলল ও। ক্লিপারস্ দিয়ে লেড কেটে আঙুল দিয়ে ধরল পেসমেকারটা, তারপর টান দিয়ে বের করে আনল।

আনন্দে আত্মহারা রানা। ফোন তুলে রঘুকে সুখবরটা দেবে। নাম্বার পাঞ্চ করে কথা বলতে শুরু করেছে, এই সময় তীক্ষ্ণ একটা ব্যথা অনুভব করল মাথার পিছনে। সব অন্ধকারে ঢাকা পড়বার আগে তাঁবুটা চরকির মত ঘুরল একপাক।

লাশের গায়ে মুখ থুবড়ে পড়ল রানা। তারপর আর নড়ল না।

আঠারো

বাইরে থেকে তাঁবুর গায়ে রানার ছায়া পড়তে দেখেছে সার্ডিক লঙ্গিনাস, অপেক্ষা করছিল ওটাকে কায়দামত একটা পজিশনে পাওয়ার জন্য। এখনি খুন করতে চায় না, তাই মাথায় একটা পাথর ঠুকে রানাকে অজ্ঞান করেছে সে।

এরপর লঙ্গিনাস ফ্ল্যাপ ছিঁড়ে ক্রল করে তাঁবুর ভিতরে ঢুকল। লাশের গা থেকে ঠেলে নিচে নামাল রানাকে, ওর মুঠো খুলে পেসমেকারটা বের করে নিল অনায়াসে।

মোবাইল ফোনে কথা বলছে লঙ্গিনাস। 'তুমি তো?'

'হ্যাঁ,' অপরপ্রান্ত থেকে উত্তর এল। ঝড়ের কারণে আওয়াজ অস্পষ্ট।

'কোথায় তুমি?'

'যে রনদিভুতে আমরা একমত হয়েছিলাম। এই ঝড়ের মধ্যে আর কোথায় থাকব? ওটা তুমি পেয়েছ?'

'হ্যাঁ।'

'গুড। নিশ্চিত হও, রানার জ্ঞান যেন না ফেরে।'

'ঠিক আছে।' যোগাযোগ কেটে দিল লঙ্গিনাস। মোবাইল রেখে দিয়ে পারকার ভিতর থেকে বড় একটা ছোরা বের করল সে।

এরপর লঙ্গিনাস রানার মাথার চুল ধরে মাথাটা পিছন দিকে টানল, ফলে ওর গলাটা পুরোপুরি উন্মুক্ত হয়ে পড়ল। ছুরির ফলা গলায় ঠেকিয়ে জবাই করতে যাচ্ছে। এই সময় তাঁবু ভেদ করে একটা বুলেট ছুটে এল।

লঙ্গিনাসের মগজ আর রক্ত ছলকে পড়ল রানার শরীরে। জার্মান লোকটা কাত হয়ে পড়ে গেল একপাশে।

ক্রল করে তাঁবুতে ঢুকল মন্টি বেলফোর, হাতে ব্রাউনিং নাইন এমএম। লঙ্গিনাসের হাত থেকে পেসমেকারটা নিয়ে পকেটে রাখল সে, তারপর পিস্তলটা ঠেকাল রানার মাথায়।

হঠাৎ ফেলে দেওয়া রানার ফোনটা এতক্ষণে শব্দজট সহ জ্যান্ত হয়ে উঠল। 'ভাইয়া? আপনি লাইনে?' ঝড়ের কারণে শব্দগুলো বেলফোর বুঝতে পারল না, তবে গলার আওয়াজটা রঘুর বলে সন্দেহ করল। 'জানি না আপনি আমার কথা শুনতে পাচ্ছেন কিনা, তবে আমি রওনা হয়ে গেছি!'

ড্যাম, ভাবল বেলফোর। তাড়াতাড়ি অস্ত্র রেখে দিয়ে মাথাটা ঢাকল সে, দ্রুত বেরিয়ে এল তাঁবু থেকে।

*

ঝড় উপেক্ষা করে রানার তাঁবুর দিকে এগোচ্ছে রঘু। রাগে মনে মনে নিজের মুণ্ডুপাত করছে সে। তার উচিতই হয়নি ভাইয়াকে একা রেখে আসা। ভাগ্যিস সে তার বিশেষ চশমা পরেছিল চোখে। এই চশমায় দূরের জিনিস অনেক কাছে

দেখায়। একটা মূর্তিকে তাঁবুতে ঢুকতে দেখে সে, সেটার পিছু নিয়ে ঢোকে আরেকটা।

চোখে গগলস থাকলেও ভাল দেখতে পাচ্ছে না রঘু। সামনে একটা আকৃতি রয়েছে, মনে হলো সচল। তারপর বোঝা গেল একজন মানুষ। রঘু এগোচ্ছে। একদম মুখোমুখি হয়ে থামল ওরা। বেলফোরকে চিনতে পারল রঘু।

কথা বলতে যাবে, বেলফোরের হাতে একটা পিস্তল দেখল সে। দ্রুত পাক খেল রঘু, অস্ত্র ঝলসে উঠবার মুহূর্তে শরীরটা ঘুরিয়ে নিচ্ছিল বলে কাঁধ ছুঁয়ে বেরিয়ে গেল বুলেটটা। আরও একটু ঘুরে মুখ থুবড়ে পড়ল ও তুষারের উপর।

চারদিকে তাকিয়ে নিশ্চিত হয়ে নিল বেলফোর, কেউ তাকে দেখেনি। বাতাসের একটানা গর্জনে গুলির শব্দ চাপা পড়ে গেছে। ও জানে না রঘু আসলে মরেনি, মরবার ভান করে পড়ে আছে।

মুখে ঠাণ্ডা তুষার অনুভব করে চোখ মেলল রঘু। বেলফোরের কাঠামোটা অস্পষ্টভাবে দেখতে পাচ্ছে সে–ঘুরল, ক্যাম্পসাইট থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। ধীরে ধীরে বসল সে, তারপর চেষ্টা করে দাঁড়াতেও পারল। মোটা কাপড়ের পোশাক আর আত্মরক্ষার জন্য অকস্মাৎ ঘুরে যাওয়াটা প্রাণে বাঁচিয়ে দিয়েছে তাকে। বুলেটটা বুকে লাগবার কথা, কিন্তু চলে গেছে কাঁধ ছুঁয়ে। তবে প্রচণ্ড জ্বালা অনুভব করছে সে। রেসপারেটার থেকে গভীর ভাবে বাতাস নিচ্ছে।

পিঠের অক্সিজেন ভর্তি ক্যানিস্টারটা অ্যাডজাস্ট করে নিয়ে বেলফোরের পিছু নিল রঘু।

'আপনার পায়ে পড়ি, জাগুন!'

চড়গুলো কঠিন, ব্যথা পাচ্ছে রানা। মাথার ব্যথাটা দপ্ দপ্ করছে, চোখের দৃষ্টি সম্পূর্ণ ঝাপসা। কেউ একজন ওর উপর হুমড়ি খেয়ে রয়েছে। গলার আওয়াজটা মেয়েলি।

'ভগবান, ওকে জাগিয়ে দাও!' মরিয়া হয়ে প্রার্থনা শুরু করল ডাক্তার লাবণ্য। 'মা, দেশে ফিরে কালীঘাটে তোমার পুজো দেব–'

গুঙিয়ে উঠল রানা। বমি পাচ্ছে ওর। তবে চোখের সামনে থেকে ঝাপসা ভাবটা অনেকটাই কেটে গেছে। লাবণ্যকে দেখতে পাচ্ছে ও, কাপড় দিয়ে ওর মুখ মুছিয়ে দিচ্ছে।

'এখন কেমন লাগছে আপনার? একেবারে ঠাণ্ডা মেরে গিয়েছিলেন। মাথায় একটা ক্ষত দেখলাম–কী করে হলো? কথা বলুন!'

'এখন ভাল আছি,' বলল রানা।

'বসতে পারবেন?' লাবণ্যের কণ্ঠস্বরে শুধু তাগাদা নয়, কান্নার ভাবও লুকিয়ে আছে।

ধীরে ধীরে বসল রানা। মাথার পিছনে হাত ঠেকিয়ে ফোলাটা অনুভব করল।

'ধরে নিয়েছিলাম মারা গেছেন। কেউ তো বেঁচে নেই!' বলল লাবণ্য। রানা বুঝতে পারছে, তার গলায় নিখাদ আতঙ্ক।

'কী বললেন আপনি?'

শুধু আতঙ্কিত নয়, হতভম্ব আর দিশেহারা দেখাচ্ছে লাবণ্যকে। ঝর ঝর করে কেঁদে ফেলল সে। 'সবাই মারা গেছে। সবাই–সিমন অ্যালভারেজ, টমাস পারকার, ডুনো কারমেল, সর্দার। না, সবাইকে আমি খুঁজে পাইনি। কিন্তু ওদিকে ছ'টা লাশ পড়ে আছে। শুনুন, রানা, ওরা খুন হয়েছে! ওদের প্রত্যেককে গলা কেটে জবাই করা হয়েছে! ওকেও দেখুন–' সার্ডিক লঙ্গিনাসের লাশের দিকে হাত তুলল সে। 'ওর মাথায় গুলি করা হয়েছে!'

খবরটা ঝট করে বাস্তব দুনিয়ায় ফিরিয়ে আনল রানাকে। 'কাদেরকে পাওয়া যাচ্ছে না?' দ্রুত জানতে চাইল ও।

'মন্টি, মার্লো···আর কে জানি না। আমার মাথা ঠিকমত কাজ করছে না।'

'রঘু?'

'তাকেও আমি দেখিনি।'

বাইরে এখনও প্রকৃতি গজরাচ্ছে। ফ্ল্যাপ সরিয়ে উঁকি দিল রানা। অন্ধকার রাত, দৃষ্টিসীমা নেই বললেই চলে। ঘুরে তাঁবুর ভিতর দৃশ্যটা খুঁটিয়ে দেখল।

চাও-এর লাশ যেখানে ফেলে রেখেছিল ও, সেখানেই পড়ে আছে। তার পাশে কাত হয়ে রয়েছে লঙ্গিনাস। বড় ছোরাটা কাছেই। তাঁবুতে বুলেটের একটা ফুটো।

'কী ঘটেছে আমি জানি,' বলল রানা। 'লঙ্গিনাস। তাঁবুর বাইরে থেকে সেই আমাকে কিছু দিয়ে আঘাত করে। তারপর পেসমেকারটা আমার হাত থেকে নিয়ে নেয়।'

'পেস···কী?'

'ওটা আমার দরকার,' বলল রানা। 'কিন্তু লঙ্গিনাস নিজের কাছে রাখতে পারেনি। তাকে গুলি করে পেসমেকারটা আরেকজন নিয়ে গেছে।'

'কীসের পেসমেকার? এ-সব কী বলছেন আপনি?' লাবণ্য কিছুই বুঝতে পারছে না।

হাত তুলে চাও-এর লাশটা দেখাল রানা।

কাপড়ের আবরণ সরিয়ে লাশের বুকটা দেখল লাবণ্য, আঁতকে উঠে পিছন দিকে সামান্য কাত হলো। 'ভগবান!' বিহ্বল দেখাচ্ছে তাকে। 'এই লোকের বুক কেটে পেসমেকার বের করেছে কেউ?'

'হ্যাঁ, আমি। শুধু ওটার জন্যেই এই অভিযানে এসেছি আমি। জিনিসটার ভিতরে ক্লাসিফায়েড মিলিটারি ইনফরমেশন লুকানো আছে। বাংলাদেশের সম্পত্তি, আমি নিতে এসেছি। সাহায্য করুন, নড়াচড়ার জায়গা বের করি।'

লাশ দুটো তাঁবুর বাইরে বের করে দিল ওরা।

'এখানে আমাদেরকে সারারাত অপেক্ষা করতে হবে,' তাঁবুতে ফিরে এসে বলল রানা। 'এরকম ঝড়ের মধ্যে বাইরে বেরুনো চলে না। এখন অন্তত আরাম করে লম্বা হতে পারব।'

'ব্যাপারটা আমি বুঝছি না,' বলল লাবণ্য। 'এই পেসমেকারে কী আছে?'

'গোপন সামরিক তথ্য।'

'তারমানে এই স্যালভিজ অপারেশন স্রেফ একটা কাভার স্টোরি?'

মাথা ঝাঁকাল রানা।

হাত দুটো বুকে ভাঁজ করল লাবণ্য। 'ভগবান, রক্ষে করো!' হঠাৎ চোখ গরম করে রানার দিকে তাকাল সে। 'কিন্তু এতগুলো নিরীহ মানুষ যে মারা গেল, তার কী হবে?'

'সেজন্যে দায়ী জিএম-গ্রুপ অভ মার্সেনারি বলে একটা আন্তর্জাতিক অপরাধী চক্র। এ-সবই নেপালি সরকার আর পুলিশকে সময় মত জানানো হবে। আপনি বরং যারা মারা গেছে তাদের কথা বলুন। শুরু করুন প্রথম থেকে।'

'আপনারা ওই লোকটার লাশ নিয়ে ফিরে আসার পর আমি সাপ্লাই টেন্টে চলে যাই, আমার মেডিকেল হেডকোয়ার্টারে। ঘণ্টা দুয়েক ঘুমাবার পর জেগে উঠি। কী-কারণে যেন খুব অস্থির লাগছিল। বাইরে বেরিয়ে আপনার তাঁবুর দিকে আসছি, দেখি মন্টির তাঁবুর ফ্ল্যাপ খোলা, ভেতরে বাতাস ঢুকছে। ঢুকে দেখি তাঁবু খালি।'

'তার সঙ্গে আর কার থাকার কথা তাঁবুতে?'

'বব মার্লোর। তাঁবুতে সে-ও ছিল না।'

'বলে যান।'

এরপর অ্যালভারেজ আর পারকারের তাঁবুতে যায় লাবণ্য। তাদেরকে নয়, তাদের লাশ দেখতে পায় সে—দু'জনকেই গলা কেটে জবাই করা হয়েছে। এরপর তার মাথার ঠিক ছিল না, ফলে পাশের তাঁবুতে ঢোকে। ওটা ছিল শেরপাদের। সেখানেও একই দৃশ্য। গলাকাটা লাশ। কারমেলও তার তাঁবুতে মরে পড়েছিল, রক্তে ভেসে যাচ্ছিল মেঝে। এরপর উন্মাদিনীর মত ছুটতে ছুটতে এখানে, রানার তাঁবুতে চলে আসে সে।

লাবণ্য থামতে রানা বলল, 'আপনি বেঁচে গেছেন নিজের তাঁবুতে না থাকায়। কাউকে ফোনে পাওয়ার চেষ্টা করেছেন?'

'হ্যাঁ, কিন্তু এই ঝড়ের মধ্যে কানেকশন পাওয়া অসম্ভব। সব চ্যানেলই ঘ্যারঘ্যার করছে।'

চিন্তা করছে রানা। খুনগুলো কী লঙ্গিনাস করেছে? ছোরাটা পরীক্ষা করল ও। ফলায় শুকনো রক্ত লেগে রয়েছে। লঙ্গিনাস নিশ্চয়ই ওকে জবাই করতে যাচ্ছিল, ঠিক এই সময় গুলি খেয়েছে। কিন্তু কার গুলি?

এই সময় রানা লক্ষ করল ওর মোবাইল ফোন তাঁবুর এক কোণে অন করা অবস্থায় পড়ে রয়েছে। ওটা তুলে রঘুর নাম্বার পাঞ্চ করল ও। ডিজিটাল ডিসপ্লেতে মেসেজ এল—'নো কানেকশান'।

'বললাম না এই ওয়েদারে আপনি কানেকশান পাবেন না,' বলল লাবণ্য।

ফোন রেখে দিয়ে চোখ বুজল রানা।

'যে জিনিসটার খোঁজে এসেছেন, সেটা কতটা গুরুত্বপূর্ণ?'

'খারাপ লোকের হাতে পড়া ঠেকানোর জন্যে প্রাণ দিয়ে হলেও চেষ্টা করতে হবে, এতটাই গুরুত্বপূর্ণ। এ এমন এক টেকনোলজি, আন্তর্জাতিক ক্ষমতার ভারসাম্য একেবারে নষ্ট হয়ে যাবে।'

'আপনি কখনও মানুষ খুন করেছেন?' হঠাৎ নরম সুরে জানতে চাইল লাবণ্য।

মুখে কিছু না বলে মাথা ঝাঁকাল রানা। 'আপনি করেননি—আমি ধরে নিচ্ছি।'

'আমি জানতাম,' মাথা নেড়ে অস্ফুটে বলল লাবণ্য। 'সেজন্যেই আপনার প্রতি অদ্ভুত একটা আকর্ষণ বোধ করেছি।'

'খুনীরা আপনাকে টানে?'

'তা আমি বলতে চাইনি। ওই থার্মোসটায় কি পানি আছে?' রানার হাত থেকে ওটা নিয়ে পানি খেল লাবণ্য। 'কী জানেন, আমি সব সময় ভাবি, একজন মানুষ আরেকজন মানুষকে কীভাবে খুন করে। আমি নিজে তো মানুষকে বাঁচাবার চেষ্টা করি।'

'ভেবে কোন কূল-কিনারা পান?'

'এখন বোধহয় পাচ্ছি। আপনি স্বীকার করতে ইতস্তত করলেন না বা ভয়ও পেলেন না; এর মানে হলো, জিজ্ঞেস করলে আপনি আপনার কাজের যথার্থতা ব্যাখ্যা করতে পারবেন। ধরে নিতে হয় আপনি যেহেতু একটা ন্যায় যুদ্ধে আছেন, মানুষ খুন করাটা আপনার কাছে স্রেফ একটা বিষাক্ত সাপ মারার চেয়ে বেশি কিছু নয়।'

'দাঁড়ান,' বলল রানা। 'আপনি ঠাণ্ডায় ঠকঠক করে কাঁপছেন।' বিভওয়্যাক স্যাকটা টেনে এনে খুলল ও। 'ঢুকুন, ভেতরে ঢুকে পড়ুন।'

এক মুহূর্ত ইতস্তত করে লাবণ্য বলল, 'প্রথমে আপনি ঢুকলে ভাল হয়, প্লিজ।'

উনিশ

মালভূমির উপর বেলফোরকে অনুসরণ করবার যথাসাধ্য চেষ্টা করল রঘু। বাতাসের এত বেশি শক্তি যে পায়ের সামনে পা ফেলা ভয়ানক কষ্টসাধ্য হয়ে দাঁড়াল। বেলফোরের পায়ের দাগ তৈরি হবার কয়েক মুহূর্ত পরই চাপা পড়ে যাচ্ছে, কাজেই সচল থাকতে নিজেকে বাধ্য করছে রঘু, তা না হলে ট্রেইলটা হারিয়ে ফেলবে। তারপর সামনে পড়ল পাথরের মুখ; অ্যাঙ্কার আর রশি জায়গা মত ঝুলছে।

বাতাসের বিরুদ্ধে এগোবার চেয়ে পাথর বেয়ে উপরে ওঠা সহজ মনে হলো রঘুর। প্রায় ঘণ্টাখানেক সময় লাগলেও, চূড়ায় উঠে এল সে। এখানে আবার তুষার আর বাতাস হামলা চালাল। দৃষ্টিসীমার শেষপ্রান্তে একটা ঝাপসা আকৃতি দেখা গেল। ভাল করে খানিক দূর এগোতে বুঝল ওটা একটা তাঁবু। বেলফোর নিশ্চয়ই ওটার ভিতর আশ্রয় নিয়েছে। আরেক দিকে এগোল রঘু। তাকে অন্য কোন আশ্রয় খুঁজে নিতে হবে।

কিছুক্ষণ পর একটা ফাটল দেখতে পেল সে। খানিকটা নীচে নেমে আইস অ্যাক্স দিয়ে ফাটলের গায়ে একটা গর্ত খুঁড়ল। ভিতরে ঢুকে ভাঁজ করা হাঁটু বুকের কাছে এনে চোখ বুজল। চোখে ঘুম চলে এল প্রায় সঙ্গে সঙ্গে।

*

রঘুর ঘুম ভাঙল হঠাৎ। ঝড় থেমে গেছে, নতুন আরেকটা দিনের আলো ছড়িয়ে

পড়ছে পাহাড়ে। ভয়ানক ঠাণ্ডা লাগছে তার, গোটা শরীর আড়ষ্ট, তবে বেঁচে আছে।

বাম হাতটার উপর চোখ পড়ল। সম্ভবত গর্ত খোঁড়ার সময় গ্লাভটা হারিয়েছে, ফলে ফ্রস্টবাইট যা ক্ষতি করবার করে ফেলেছে। আঙুলগুলো হয়েছে গাঢ় নীল, বাকি হাত বেগুনি। আঙুল নাড়তে চেষ্টা করে পারল না। চামড়াতেও কোন সাড়া নেই।

গর্ত থেকে বেরিয়ে এসে ফাটল থেকে উপরে উঠল রঘু। চেষ্টা করে দাঁড়াতে পারল, ব্যাকপ্যাক খুলে চকলেট খেল, তারপর গরম একটা চাদর বের করে হাতটায় জড়াল। প্যাকটা আবার পিঠে আটকে নিয়ে তাঁবুর দিকে এগোল সে। 'আমি রঘু কাপুরুষ নই,' আপনমনে বিড় বিড় করল। 'বেলফোর সাহেব তোমার খবর ভাল নয়।'

গ্ল্যাসিয়ার পেরিয়ে এসে তুষারের উপর শুয়ে পড়ল রঘু। বেলফোরের সঙ্গে মার্লোকে দেখা যাচ্ছে, দু'জন মিলে সদ্য খোলা তাঁবু ভাঁজ করছে। এখনি কাছে না গিয়ে ওরা কী করে দেখবার সিদ্ধান্ত নিল রঘু, তারপর পরিস্থিতি বুঝে ভেবে দেখবে কী করা যায়।

একটু পরই রওনা হয়ে গেল ওরা, প্রকাণ্ড পাহাড়ের উত্তর দিকে যাচ্ছে। ওদের উদ্দেশ্যটা কী? চূড়ায় উঠবে? অর্থাৎ পাগল হয়ে গেছে?

রিজ-এর উপর দিয়ে পিছু নিল রঘু। এই পথ ধরে দীর্ঘ বহু বছর অভিযাত্রীরা আসা-যাওয়া করেছে। তবে বেলফোর আর মার্লো বেশি উপরে উঠল না। রিজ পেরিয়ে একটা সমতল জায়গায় নামল ওরা। এখানে চারটে তাঁবু দেখা যাচ্ছে।

এটা রাশিয়ানদের ক্যাম্প।

পিছনে রয়ে গেল রঘু, বিশেষ চশমাটা বের করে চোখে তুলল, বেলফোরের প্রতিটি নড়াচড়া লক্ষ করছে।

সিঙ্গেল তাঁবুতে রাতটা খুব কষ্টে কেটেছে বেলফোর আর মার্লোর। রাশিয়ানদের সঙ্গে দেখা করবার জন্য অস্থির হয়ে ছিল বেলফোর, ঠিক জানত না আগের আলোচনা অনুসারে চুক্তিতে আসা উচিত হবে কিনা। ভোরের দিকে সিদ্ধান্ত নেয় কী করবে, তারপর মার্লোর সঙ্গে বসে একটা প্ল্যান তৈরি করে।

রুশদের ক্যাম্পে দু'জন লোক অভ্যর্থনা জানাল ওদেরকে, দুজনের হাতে একটা করে একে-ফোরটিসেভেন। তারা ওদেরকে পথ দেখিয়ে একটা তাঁবুতে নিয়ে এল। এখানে তাদের লিডার বরিস বিলোভিচ অপেক্ষা করছে।

লোকটা জোসেপ স্টালিনের মত দেখতে, গোঁফটা কালো আর চওড়া, ভুরু অস্বাভাবিক ঘন। 'মিস্টার বেলফোর?' ইংরেজিতে প্রশ্ন করল সে। 'গরম চা দিতে বলি?'

'ধন্যবাদ, বরিস,' জবাব দিল বেলফোর। 'এত কিছুর পর মুখোমুখি দেখা হওয়াটা দারুণ আনন্দময় একটা অভিজ্ঞতা, কী বলো?'

'তা বটে, তা বটে।' বিলোভিচ কৌতূহল নিয়ে মার্লোর দিকে তাকাল।

'ইয়ে, এ আমার সহকারী, বব মার্লো,' তাড়াতাড়ি বলল বেলফোর। 'বরিস

বিলোভিচ।'

হ্যান্ডশেক করে বসল ওরা।

একজন গার্ড চা পরিবেশন করল। গা একটু গরম হতে বেলফোর বলল, 'তো হ্যাঁ, স্কিন-সেভেনটিনের স্পেসিফিকেশন আছে আমার কাছে। দাম···কয়েক বিলিয়ন।'

'ঠিক আছে, জিনিসটা আগে দেখাও,' বলল রুশ লিডার।

'জিনিসটা মাইক্রোডট-এর আকারে রয়েছে। শালার জিএম এটা পাওয়ার জন্যে পাগলা কুত্তা হয়ে উঠেছিল। কিন্তু শিকে ছিঁড়েছে আমার কপালে। এমনকী মাসুদ রানাকেও হারিয়ে দিয়েছি আমি। ওকে নিশ্চয় চেনো তুমি–'

'চিনলেই কি, আর না চিনলেই বা কি!' তাচ্ছিল্যের হাসি হাসল বিলোভিচ। 'ব্যবসা করতে নেমে কাউকে ভয় করলে চলে না। আমরা কী? রাশিয়ান মাফিয়া। রাশিয়ার সমস্ত বড় ব্যবসা আমাদের হাতে চলে আসছে–'

'এবার তা হলে ব্যবসার কথাই হোক, বরিস,' বলল বেলফোর। 'এখানে পৌঁছানোর জন্যে হাজার হাজার মাইল পার হতে হয়েছে আমাকে। রনদিভু হিসেবে শালার জায়গা একটা বেছেছ বটে!'

সহাস্যে কাঁধ ঝাঁকাল বিলোভিচ। 'স্কিন-সেভেনটিন কতটা মূল্যবান আমি জানি। এ-ও জানি যে জিএম এটা পাওয়ার জন্যে মরিয়া হয়ে উঠেছে।'

'তাই নাকি? কীভাবে বুঝলে?'

'ঢুকে পড়েছিল আমার দলেও। যাক, বাদ দাও জিএম প্রসঙ্গ। শোনো। ওপরে উঠে এসে আমি কিন্তু স্কিন-সেভেনটিন পাহাড় থেকে নীচে নামানোর ঝামেলা থেকে তোমাকে বাঁচিয়ে দিয়েছি। কে জানে তোমার কপালে কী ঘটত না ঘটত। কাঞ্চনজঙ্ঘা বিপজ্জনক জায়গা। যা ঝড়টা গেল!'

'আটঘণ্টা পর আরেকটা আসছে,' বলল বেলফোর। 'ওটা পৌঁছাবার আগেই চলে যেতে চাই আমরা। তো এবার কাজের কথা হোক।'

'হোক।'

'স্টার্টিং প্রাইস সম্পর্কে আমরা একমত হয়েছিলাম–এক বিলিয়ন ডলার। আমরা দু'জনেই জানি জিনিসটার দাম আরও অনেক বেশি। এখন তুমি কত টাকা অফার করতে চাও?'

'দুই বিলিয়ন মার্কিন ডলার। পঞ্চাশ হাজার ডলারের আনকাট ডায়মন্ড এখনি আমরা তোমাকে দিতে পারি। বাকিটা তুমি কাঠমাণ্ডুতে পাবে, এখান থেকে আমরা বেরিয়ে যাবার পর।'

'তুমি কি পাগল?' জিজ্ঞেস করল বেলফোর। এই ভয়ই করছিল সে।

'আমি কি পাগল? কী বলতে চাও তুমি?'

'তোমার ধারণা স্রেফ পঞ্চাশ হাজার ডলারের হীরে নিয়ে এটা আমি হাতছাড়া করব?'

'তুমি কী ভেবেছিলে?' জানতে চাইল রাশিয়ান বিলোভিচ। হঠাৎ করে উত্তেজনায় টান টান হয়ে উঠল পরিবেশটা। 'না, এ-কথা উন্মাদও তো ভাববে না যে ক্যাশ দই বিলিয়ন ডলার নিয়ে কাঞ্চনজঙ্ঘায় উঠব আমরা। ডায়মন্ডগুলো

আনতেই কত ঝামেলা পোহাতে হয়েছে।

'কোথায় ওগুলো?'

গার্ডদের একজনকে ইঙ্গিত করল বিলোভিচ। একটা সাধারণ ওয়াটার থার্মোস নিয়ে এল গার্ড। ছিপি খুলে ভিতরের জিনিসগুলো বেলফোরকে দেখাল সে। অফ-কালার স্টোন-এ থার্মোসটা ভরে আছে।

বেলফোর মাথা ঝাঁকাল। 'এ আমি যথেষ্ট বলে মনে করি না,' ধীরে ধীরে, সাবধানে বলল সে। 'জিএম এরচেয়ে অনেক বেশি দেবে।'

'মিস্টার বেলফোর, জিনিসটা পাওয়ার আশা নিয়ে আমরাও অনেক দূর থেকে এখানে এসেছি। স্পেসিফিকেশনটা তুমি আমাদের কাছেই বিক্রি করবে, তা না হলে পরিস্থিতি অপ্রীতিকর হয়ে উঠবে।'

মার্লোর দিকে ফিরে সূক্ষ্ম একটা সংকেত দিল বেলফোর। 'কিন্তু, বরিস, বাস্তবতাকে অস্বীকার করলে চলবে কেন, বলো! তোমার সঙ্গে শেষবার আমার কথা হবার পর জিনিসটার দাম আকাশে উঠে গেছে। জিএম চাইছে, আমেরিকানরা চাইছে, আমার দেশ ইংল্যান্ড চাইছে, বাংলাদেশ বলছে ওটা তাদের, ইজরায়েলিরা চাইছে…এও কানে এসেছে যে কিছু ইটালিয়ানও এটা পাওয়ার আশা করছে…'

কোড ওয়ার্ড 'ইটালিয়ান' শুনে বিদ্যুৎ খেলে গেল মার্লোর শরীরে। পকেট থেকে পিস্তল বের করে দুই গুলিতে গার্ড দু'জনের কপাল ফুটো করে দিল সে। বেলফোরও নিজের ব্রাউনিং বের করে বিলোভিচের মাথায় ঠেকাল। মেঝে থেকে একটা একে/ফোরটিসেভেন তুলে তাঁবুর ফ্ল্যাপে লক্ষ্যস্থির করল মার্লো।

ছুটে এসে ভিতরে ঢুকল আরও দু'জন রাশিয়ান। ঢুকেই দেখল তাদের লিডারের খুব বিপদ।

'ওদেরকে হাতের অস্ত্র ফেলে দিতে বলো,' নির্দেশ দিল বেলফোর। সহকারীদের উদ্দেশ্যে রুশ ভাষায় কিছু বলল বিলোভিচ। হাতের অস্ত্র ফেলে দিল ওরা।

এরপর আবার মার্লোকে একটা সংকেত দিল বেলফোর। এক সেকেন্ড পর মার্লো লোক দু'জনের খুলি উড়িয়ে দিল।

'এবার বরিস,' বলল বেলফোর। 'তুমি এখন সম্পূর্ণ একা। রাশিয়ান মাফিয়া ঠিক কত টাকা দিতে চায় আমাকে?'

দু'তিন সেকেন্ড চেষ্টা করবার পর একটা ঢোক গিলতে পারল বিলোভিচ। তার কথা জড়িয়ে যাচ্ছে। 'দুই…দুই…বিলিয়ন এ-এখন, আরও দু-দুই বিলিয়ন কা-কাঠমাণ্ডুতে পৌঁছাবার পর।'

'তোমার সঙ্গে আছে?'

'হ্যাঁ, ডায়মন্ডে।'

'কোথায়?'

ইঙ্গিতে একটা ব্যাগ দেখাল বিলোভিচ। ব্যাগের মুখ খুলে ভিতরে তাকাল মার্লো। আরও অনেকগুলো থার্মোস দেখতে পেল সে। সেগুলো খুলেও দেখল। প্রতিটি আনকাট ডায়মন্ডে ভর্তি।

'এই ডায়মন্ডগুলো তুমি আগে কেন দিতে চাওনি আমাদেরকে?' জিজ্ঞেস

করল বেলফোর।

বাঁধ ঝাঁকিয়ে নার্ভাস ভঙ্গিতে হাসল বিলোভিচ। 'আমি একজন ব্যবসায়ী। কর্তাদের বলতাম সব ডায়মন্ডই দেয়া হয়েছে তোমাকে, যদিও বেশিরভাগই নিজের জন্যে সরিয়ে রাখতাম।'

'আচ্ছা। তো ধন্যবাদ, বরিস, তোমার অফার আমি গ্রহণ করলাম,' বলে ট্রিগার টানল বেলফোর। বুলেটটা খুলি ভেদ করে বেরিয়ে যাবার সময় বিলোভিচের মাথাটা বিস্ফোরিত হলো।

ক্যাম্পে এখন শুধু ওরা দু'জন। এক মুহূর্ত পর মার্লো বলল, 'ক্রিস্ট, বেলফোর, আমরা বিরাট ধনী হয়ে গেলাম!' সে তার ভাগের অর্ধেক থার্মোস নিজের প্যাকে ভরতে শুরু করেছে।

বাকিগুলো নিয়ে নিজের প্যাকে ভরল বেলফোর। 'চলো।'

তাঁবু থেকে বেরিয়ে এসে ঢাল বেয়ে নর্থ রিজ-এর দিকে এগোল দু'জন। একটা আইসওয়ালকে পাশ কাটিয়ে এল ওরা, এই সময় বরফ ঢাকা একটা বোল্ডারের মাথা থেকে লাফ দিল রঘু। তার টার্গেট ছিল মার্লো। তুষারে পড়ে গেল দু'জনেই, মার্লোর হাত থেকে রাইফেলটা ছুটে গেছে। বরফের উপর দিয়ে পিছলে পাহাড়-প্রাচীরের কিনারা থেকে শূন্যে লাফ দিল সেটা।

দু'জনেই উঠে দাঁড়াতে পারল। ভাল হাতটা দিয়ে মার্লোর মুখে যে ঘুসিটা মারল রঘু, দেখলে মোহাম্মদ আলিও প্রশংসা করত। ছিটকে বেলফোরের গায়ে পড়ল সে, দু'সারি থেকেই একাধিক দাঁত পড়ে গেছে।

ব্রাউনিং শুধু বের করে এনেছে বেলফোর, এই সময় ওর গায়ে ধাক্কা খেল মার্লো। সে-ও অস্ত্রটা হারাল। যেন ডানা গজিয়েছে ওটার, উড়ে গিয়ে পড়ল রঘুর পিছনে বাতাসের জড়ো করা তুষারের স্তূপে।

রঘু পিছাল। দুই শত্রু আর তুষার স্তূপের মাঝখানে দাঁড়িয়েছে।

তিনজনই ওরা গভীর খাদের ভয়ঙ্কর কাছে চলে এসেছে।

'তোমাদের দু'জনকেই আমি অ্যারেস্ট করছি,' বলল রঘু। 'আমার সঙ্গে তোমাদেরকে ক্যাম্প ফাইভে যেতে হবে।'

বেলফোর হেসে উঠল। কী করা উচিত জানে না, বেলফোরের দেখা দেখি মার্লোও হেসে উঠল।

'ও, তাই নাকি!' বলল বেলফোর। 'দেখো দেখি শালার বেটা শালা কালা আদমির স্পর্ধা! আরে, ব্যাটা শুয়োর, তারচেয়ে বিশ রুপি পাবি ব্যাগগুলো ঘাড়ে করে বয়ে নিয়ে চল।'

'পেসমেকারটা আমাকে দাও, সাহেব,' বলল রঘু। 'তা হলে তোমাদেরকে আমি জানে মারব না।'

'মার্লো, লোকটা দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছে। তুমি ওকে পাহাড় থেকে ফেলে দাও।'

শক্ত-সমর্থ আর লম্বা-চওড়া পুরুষ মার্লো, নির্দেশ পেয়েই রঘুকে ধরতে এল। কিন্তু রঘুর ভাল ট্রেনিং নেওয়া আছে, তার ক্ষিপ্রতাও বেশি।

'আইয়ো গুর্খালি!' রঘুর গলা থেকে রণহুঙ্কার বেরিয়ে এল, হাতে বেরিয়ে এল কুকরি।

স্যাঁৎ করে কুকরি চালিয়ে পরিচ্ছন্ন আর মসৃণভাবে মার্লোর মুণ্ডুটা ধড় থেকে নামিয়ে দিল রঘু। মুণ্ডু শূন্যে পাক খেল, উড়ে পার হলো পাহাড়-প্রাচীরের কিনারা।

শরীরটা তারপরও দাঁড়িয়ে থাকল। কাঁপছে। এটার কাছে যে-কোন ভৌতিক দৃশ্য ম্লান হয়ে যাবে। মুণ্ডুহীন, খাড়া ধড় থেকে রক্ত উথলাচ্ছে।

দৃশ্যটা দেখে বেলফোর নার্ভাস, ঘুরেই ছুটল সে।

এক লাথিতে মার্লোর খাড়া লাশটা কিনারা থেকে নীচে ফেলে দিয়ে বেলফোরকে ধাওয়া করল রঘু।

বেলফোরের সামনে দাঁড়িয়ে আছে পিচ্ছিল একটা পাথরের মুখ, কিন্তু তবু সে থামল না। আইস অ্যাক্স কাজে লাগিয়ে চড়তে শুরু করল। খাঁজ, ভাঁজ, ফাটল আর গর্তে হাত বা পা আটকে উঠছে সে। অন্যান্য ইকুইপমেন্ট ব্যবহার করবার সময় নেই। একজন নেটিভ তাকে তাড়া করেছে। এখন তাকে এই আসুরিক শক্তিই শুধু বাঁচাতে পারে।

পাঁচিলের নীচে দাঁড়িয়ে, মুখ তুলে দেখছে রঘু। বেলফোর এরইমধ্যে ত্রিশ ফুট এগিয়ে গেছে। রঘু জানে না, পাথর বেয়ে ওঠা তার পক্ষে সম্ভব কিনা। বাম হাতটা বেকার। এক হাতে কী করে উঠবে! হায়, তা হলে কী শত্রুকে চলে যেতে দেবে সে?

রঘুর মাথায় সেই মন্ত্রটা ফিরে এল। কাপুরুষ হওয়ার চেয়ে মরে যাওয়া ভাল।

দৃঢ় প্রতিজ্ঞ একটা ভাব নিয়ে পাথরে আইস অ্যাক্স গাঁথল রঘু, খাঁজে পা বাধিয়ে উঠতে শুরু করল। খুব ধীরে এগোচ্ছে সে, বিশ্রাম নেওয়ার জন্য খানিক পর পর থামতে হচ্ছে। ওদিকে রিজ-এর মাথায় খুব দ্রুত পৌঁছে যাচ্ছে বেলফোর।

বিশ ফুটের মত উঠেছে রঘু, এই সময় রেসপারেটার-এর বাতাসে লক্ষ করবার মত পরিবর্তন ধরা পড়ল। অক্সিজেন ক্যানিস্টার খালি হয়ে গেছে! মুখ থেকে রেসপারেটার বের করে আনল সে। ঠাণ্ডা বাতাস নিল ফুসফুসে।

মুখ তুলে তাকাতে রিজ-এ বেলফোরকে বসে থাকতে দেখল রঘু। তার হাতে চকচকে ধাতব কী যেন একটা রয়েছে। ছেড়ে দিল বেলফোর, সোজা রঘুর দিকে নেমে আসছে জিনিসটা। ওটা একটা লাইটার, সরাসরি রঘুর আহত কাঁধটায় এসে পড়ল। যতটা না ব্যথা, তারচেয়ে বিস্ময়ের ধাক্কায় হাত থেকে আরেকটু হলে আইস অ্যাক্সটা ফেলে দিচ্ছিল সে।

রঘু বুঝতে পারছে, তাকে নামতে হবে। আর উপরে ওঠা সম্ভব নয়, চেষ্টা করলে স্রেফ মারা পড়বে।

প্যাক থেকে একটা আইস স্ক্রু বের করল বেলফোর। শূন্যে ঝুলিয়ে ধরল জিনিসটা, তারপর ছেড়ে দিল।

রঘুর মাথায় পড়ল ভারী স্ক্রু। পাথরে গাঁথা কুড়ালের হাতল ধরে ঝুলে থাকল সে, ভগবানকে বলছে গর্ত থেকে পা যেন না পিছলায়। একনাগাড়ে হাঁপাচ্ছে সে। জানত না ব্যথা কখনও এত তীব্র হতে পারে।

কয়েক সেকেন্ড পর আরেকটা আইস স্ক্রু তার কপালে আঘাত করল। এবার

আর রঘু ভারসাম্য ধরে রাখতে পারল না।

বাতাসে পিঠ দিয়ে পতন শুরু হলো রঘুর। পাথরে লেগে ফুটবলের মত ছিটকে গেল সে, খাদের কিনারা পার হয়ে নীচে নেমে যাচ্ছে। রঘুর কোথাও কোন ব্যথাবোধ নেই, তার মাথার ভিতর বারবার শুধু একটা চিন্তাই আসা-যাওয়া করছে: কাপুরুষ হওয়ার চেয়ে মরে যাওয়া ভাল···কাপুরুষ হওয়ার চেয়ে···

বব মার্লোর কাছে অর্ধেক ডায়মন্ড ছিল, সেজন্য নিজের ভাগ্যকে অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ আর অভিশাপ দিচ্ছে বেলফোর। ইংল্যান্ডের কথা ভুলে গিয়ে কোন নতুন একটা রাষ্ট্রে বিলাসিতার মধ্যে বসবাস করতে হলে প্রচুর টাকা দরকার তার।

সবই ঠিকঠাক মত ঘটত, শুধু যদি জিএম নাক না গলাত। তা সত্ত্বেও, এটা এখনও একা তারই শো। আর এই শো কাউকে সে নষ্ট করতেও দেবে না—না ওদেরকে, না রুশদের, না শালার কোন গুর্খাকে, আর রানাকে তো নয়ই।

স্কিন-সেভেনটিনের একজন ক্রেতা দরকার তার। কেন, জিএম-ও তার সম্ভাব্য ক্রেতা হতে পারে! জিনিসটা ওদের খুব দরকার। ওদের অযোগ্য প্রতিনিধি, সার্ডিক লঙ্গিনাস, জিনিসটা উদ্ধার করে নিয়ে যেতে শোচনীয়ভাবে ব্যর্থ হয়েছে। ওরা হয়তো তাকে বেশ ভাল টাকা সাধবে। হাজার হোক, এর আগে তাকে ওরা জিনিসটা চুরি করাবার কাজে লাগিয়েছিল।

দরকার শুধু ওদের একজন কর্তাগোছের কারও সঙ্গে কথা বলা। তার জানা নেই হিউগো ভেনিনির কনট্যাক্ট কে ছিল। কয়েক মাস আগে ভেনিনি যখন জিএম-এর অল্প টাকার প্রস্তাবটা নিয়ে তার সঙ্গে কথা বলল, তখনই সে বুঝতে পারে ভেনিনি লোকটা অত্যন্ত লোভী আর বোকা।

ভেনিনির সঙ্গে সে যুক্তি করে, জিএম-এর নির্দেশ মেনেই কাজ করবে তারা, তবে স্পেসিফিকেশনটা ডেলিভারি দেওয়ার বদলে হারিয়ে ফেলবে, আসলে বেচে দেবে রাশিয়ান মাফিয়ার কাছে। ভেনিনি জিএম-এর প্রতিশোধের কথা ভেবে খুব ভয় পাচ্ছিল। আশ্বাস দিয়ে তার সেই ভয় বেলফোর কাটিয়ে দেয়।

তারপর আর কী! দু'জন মিলে কাজ হাসিল করে ফেলল। সাফল্যের সঙ্গে ফর্মুলাটা চুরি করেছে তারা, তারপর জিএম-এর কাছ থেকেও দূরে সরিয়ে এনেছে।

এখন তার কাজ বিরাট একটা দাম হাঁকা।

জিএম কী তার উপর প্রতিশোধ নিতে চাইবে? তারা কী তার সঙ্গে ব্যবসা করতে অসম্মতি জানাবে? মনে হয় না। ফর্মুলাটা তাদের খুবই দরকার। সম্ভাব্য ক্রেতাদের মধ্যে তাদের আগ্রহই সবার চেয়ে বেশি হওয়ার কথা। ইজরায়েলিরা খুব কম টাকা অফার করবে। ইটালিয়ান টিমের আড়ালে ওরা আসলে কারা তা সে জানে না। ওই টিমটা সম্ভবত একটা ইউরোপিয়ান কনসর্টিয়াম তৈরি করে পাঠিয়েছে।

কৌশলটা হলো, জিএম যোগাযোগ করবার আগে সে যদি ওদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারত! তার কানেকশনের কোন অভাব নেই, কিন্তু কোনটা

কাজে লাগবে বলা মুশকিল।

এখন সে ক্যাম্প ফাইভে ফিরে যাবে, সযত্নে সরিয়ে রাখবে পেসমেকারটা, আর যে-কোন মূল্যে এড়িয়ে থাকবে রানাকে–আদৌ এখনও যদি সে বেঁচে থাকে আর কি।

আকাশের দিকে তাকাল বেলফোর। আবার কালো মেঘ জমতে শুরু করেছে। ঝড়টা সম্ভবত তিন কী চার ঘণ্টা পর আসবে। তার আগেই ক্যাম্পে ফিরতে হবে তাকে।

মুশকিল হলো, সে খুব ক্লান্তবোধ করছে। মাথাটাও হঠাৎ প্রচণ্ড ব্যথা করছে। অক্সিজেন ক্যানিস্টার পরীক্ষা করে দেখল। প্রায় খালি হয়ে এসেছে। এটাই বোধহয় মাথাব্যথার কারণ। অক্সিজেনের শেষ ক্যানিস্টার বের করে রেসপারেটারের সঙ্গে জোড়া লাগাল সে। নতুন বাতাস ভাল লাগছে। ক্যাম্প ফাইভে তাড়াতাড়ি ফিরে যাওয়াটা এ জন্যই জরুরী। তার আরও অক্সিজেন দরকার।

পাঁচ মিনিট লাগল চকলেট আর পানি খেতে। তারপর রওনা হলো বেলফোর। এখন শুধু রানার সঙ্গে দেখা না হলেই হয়।

রানা আর লাবণ্য সারাটা সকাল ধরে ক্যাম্পের চারধারে নিখোঁজ লোকদের খুঁজে বেড়াল। ঝড়টা তুষারের উপর থেকে সব ছাপ মুছে দিয়ে গেছে, কাজেই অনুসরণ করবার মত কিছু না পেয়ে ওরা সিদ্ধান্ত নিল অপেক্ষা করে দেখা যাক কেউ ফেরে কিনা।

পারকার আর অ্যালভারেজের লাশ তাঁবু থেকে বের করে আনল লাবণ্য, ওগুলোকে কবর দিতে হবে। রানা ঢুকল ডুনো কারমেলের তাঁবুতে। তার লাশটা উজ্জ্বল হলুদ আর সবুজ পারকায় পুরোপুরি ঢাকা। দেখে রানার বুক থেকে একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল। অত্যন্ত দুঃখজনক ঘটনা। লোকটাকে সত্যি খুব ভাল লেগে গিয়েছিল ওর।

লাশটা বাইরে বের করবার আগে রানা সিদ্ধান্ত নিল, কারমেলের স্যাটেলাইট ফোনের মাধ্যমে গোটা ব্যাপারটা বিসিআই হেডকোয়ার্টার ঢাকাকে রিপোর্ট করা দরকার।

সোহেলকে পাওয়া গেল। স্কিন-সেভেনটিন উদ্ধার করবার আশা প্রায় নেই বললেই চলে, তাকে এরকম একটা ধারণা দিয়ে যোগাযোগ কেটে দিল ও।

কাজ ফেলে রাখবার কোন মানে হয় না ভেবে কারমেলের লাশ তাঁবু থেকে বের করবার প্রস্তুতি নিল রানা। তারপর হঠাৎ ছেড়ে দিল হলুদ আর সবুজ পারকা, ভাবল, বেশ কিছুক্ষণ হলো একা রয়েছে লাবণ্য, দেখা দরকার কী করছে সে।

তাঁবু থেকে বেরিয়ে এসে তার নাম ধরে ডাকল রানা। কোন সাড়া নেই।

নিজের তাঁবুর কাছে ফিরে এসে আবার ডাকল রানা।

'এদিকে আমি!' এবার সাড়া দিল লাবণ্য। বিধ্বস্ত প্লেনের ফিউজিলাজের সামনে ব্যস্তভাবে তুষার খুঁড়ছে সে। আরেকটা কোদাল নিয়ে রানাও হাত লাগাল কাজটায়।

'প্রথমেই আমাদের উচিত ছিল প্যাসেঞ্জারদের নীচে না পাঠিয়ে এখানে কবর

দেয়া,' বলল রানা। 'প্লেনে ক'টা আছে আর?'

'জানি না, পাঁচ কি ছয়টা হবে,' বলল লাবণ্য।

কয়েক মিনিট কাজ করবার পর বিশ্রামের জন্য একটা পাথরে বসল ওরা, অক্সিজেন নিল, পানি খেল যে যার বোতল থেকে।

'আমার খিদে পেয়েছে,' বলল লাবণ্য। 'ফ্রিজ থেকে কিছু বের করে সেদ্ধ করলে কেমন হয়?'

'দারুণ হয়!' উৎসাহ দেখাল রানা।

হেসে উঠে সিধে হলো লাবণ্য, কিন্তু তাকে অবাক করে দিয়ে নিজেই ঝট করে দাঁড়িয়ে পড়ল রানা, তারপর প্রায় ধাক্কা দিয়ে একপাশে ঠেলে দিল, হোলস্টার থেকে বের করে ফেলেছে চকচকে ওয়ালথার পিস্তল।

দূরে একটা গুলি করল রানা।

লাবণ্য চেঁচিয়ে উঠল।

'ঠিক ওখানেই দাঁড়াও!' গর্জে উঠল রানা, হাতের পিস্তল একচুল নড়ছে না।

দেখবার জন্য ঘুরল লাবণ্য। দেখে হতভম্ব হয়ে গেল।

পঞ্চাশ ফুট দূরে দাঁড়িয়ে রয়েছে মন্টি বেলফোর। হাত দুটো আত্মসমর্পণের ভঙ্গিতে মাথার উপর তোলা।

বিশ

দাঁড়িয়ে থাকল বেলফোর, নিজের জায়গা ছেড়ে নড়ছে না। তার দিকে হেঁটে আসছে রানা, পিস্তলটা এখনও বেলফোরের দিকে তাক করা।

লাবণ্য বিমূঢ় ও বোবা। দু'জনকে দেখছে।

'পিস্তলটা সরাও, রানা,' বলল বেলফোর। 'আমাকে মন্দলোক বা ভিলেন ধরে নিলে ভুল করবে তুমি।'

'কী করে বুঝব তুমি সত্যি কথা বলছ?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'আরে বোকা, আমি তোমার অমূল্য প্রাণটা বাঁচিয়েছি। ভিলেন হলো বব মার্লো আর সার্ডিক লঙ্গিনাস। তারাই তোমাকে খুন করতে চেষ্টা করে, তারপর পেসমেকারটা নিয়ে পালিয়ে যায়।'

'সেটা কোথায়? তুমিই বা এতক্ষণ কোথায় ছিলে?'

'লঙ্গিনাস আর মার্লোকে আমি তোমার তাঁবুতে ঢুকতে দেখি,' ব্যাখ্যা দেওয়ার ভঙ্গিতে শুরু করল বেলফোর, তার আচরণ সম্পূর্ণ শান্ত আর স্বাভাবিক। 'চোখে সিডব্লিউএস নিয়ে তাকিয়েছিলাম। ব্যাপারটা আমার ভাল ঠেকেনি, তাই তোমার তাঁবুর কাছে এসে বাইরে দাঁড়িয়ে থাকি। এই সময় একটা গুলি হলো। লাফ দিয়ে তাবুর ভিতর ঢুকলাম আমি।

'ওরা আগেই তোমার মাথায় আঘাত করেছিল। লঙ্গিনাসকে গুলি করে মার্লো। জানি না কী কারণে লঙ্গিনাসের ওপর খেপল সে। আমার ধারণা এর জন্যে দায়ী লোভ।

'যাই হোক, তাকে আমি চমকে দিই। আতঙ্কিত হয়ে আমাকে ধাক্কা দিয়ে তাঁবু থেকে ছুটে বেরিয়ে যায় সে। ধাওয়া করে নর্থ রিজ-এ পৌঁছাই আমি।'

গল্পটা বিশ্বাসযোগ্য, তবে কী যেন ঠিক নেই। 'বলে যাও,' তাগাদা দিল রানা।

'বলার বাকি আছে শুধু এটুকু যে মার্লো পড়ে গেছে। তাকে আমি একবারও নাগালের মধ্যে পাইনি। একটা খাদের কিনারায় ছিল সে, পা পিছলে গেছে। দেখতেই পাচ্ছিল যে আমি তার পিছনে লেগে আছি, ফলে তাড়াহুড়ো করতে গিয়ে ভুল জায়গায় পা দিয়ে ফেলে। তখন প্রচণ্ড ঝড় বইছে।'

'তা হলে পেসমেকারটা?'

'ওটা মার্লোর সঙ্গে চিরকালের জন্যে হারিয়ে গেছে। আমি কী এবার হাত দুটো নামাতে পারি?'

'পকেটগুলো খালি করো। তোমার অস্ত্রটাও বের করে দাও। স্বস্তি বোধ করব।'

'অস্ত্র নেই, রানা। বের করে মার্লোকে গুলি করতে যাচ্ছিলাম, কিন্তু শালার রাউনিংটা বরফে পড়ে পিছলে গেল—সোজা খাদে।'

এগিয়ে এসে বেলফোরের পারকায় চাপড় মেরে সার্চ করল রানা। 'ঠিক আছে, মন্টি। তবে সাবধান, হঠাৎ নড়াচড়া কোরো না। জানি না কেন ট্রিগার ধরা আঙুলটা বড্ড নিশপিশ করছে।'

হাত নামাল বেলফোর। চারদিকে তাকিয়ে বলল, 'আর সবাই কোথায়?'

'কেউ বেঁচে নেই,' বলল লাবণ্য, হাতে একটা আইস অ্যাক্স নিয়ে ওদের দিকে হেঁটে এল। 'তুমি ফিরে আসায় সবার হিসাবই পাওয়া যাচ্ছে, শুধু রঘুবীর বাদে। মার্লোর ব্যাপারটাও তো তুমি কনফার্ম করলে।'

'রঘু,' বলল রানা, তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে বেলফোরের গগলস পরা চোখের দিকে। 'আমরা জানি না কোথায় আছে সে। তুমি জানো, মন্টি?'

মাথা নাড়ল বেলফোর। 'না। তিয়েন চাও-এর লাশ নিয়ে আসার পর থেকে তাকে আর আমি দেখিনি। কী বললে, বাকি সবাই মারা গেছে? শেরপারাও?'

'হ্যাঁ,' বলল লাবণ্য। 'ওরা সবাই নিজেদের তাঁবুতে খুন হয়েছে। আমাদের ধারণা লঙ্গিনাস দায়ী।'

'তারমানে ওদেরকে তোমরা কবর দিচ্ছিলে? আমি যখন আসি?'

'হ্যাঁ,' বলল লাবণ্য। 'আমরা ঠিক করেছি রাতটা এখানে থাকব। আসুক ঝড়। কাল ফিরব।'

'বেশ। ভাল।' সন্তুষ্ট দেখাল বেলফোরকে। 'চলো, তোমাদেরকে সাহায্য করি।'

ওয়ালথারটা পকেটে ভরে রাখল রানা। লাবণ্য যেখানে গর্ত খুঁড়ছিল, সেখানে এসে দাঁড়াল তিনজন। 'তুমি কিছু খেয়েছ?' বেলফোরকে জিজ্ঞেস করল লাবণ্য। 'কাজ শুরু করার আগে তোমাকে কিছু এনে দেব?'

'খুব ভাল হয় যদি এক কাপ গরম চা খাওয়াতে পারো, ললিতা,' হাসিমুখে বলল বেলফোর।

লাবণ্যকে থামিয়ে দিল রানা, বলল, 'দাঁড়াও। মন্টি, তোমার সঙ্গে কি রাশিয়ানদের দেখা হয়েছে?'

বেলফোর সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিল, 'আসলে, হয়েছে। তবে আমি শুধু ওদের ক্যাম্পসাইট দেখেছি, ব্যস। ওটা রিজ-এর ওদিকটায়। আমরা ওটাকে এড়িয়ে যাই।'

রানার চোখ সরু হয়ে গেল। 'আমরা?'

বেলফোর কুঁকড়ে গেল। জানে মুখ থেকে বেফাঁস কথা বেরিয়ে গেছে। বিন্দুমাত্র ইতস্তত না করে ছোঁ মারল সে, লাবণ্যের হাত থেকে আইস অ্যাক্সটটা কেড়ে নিয়ে সবেগে ঘোরাল রানার দিকে।

ছোট্ট কুড়ালের ফলা রানার ডান কাঁধে গেঁথে গেল। ব্যথায় গুঙিয়ে উঠল ও, লাবণ্য শুরু করল চিৎকার। টান দিয়ে কুড়ালটা খুলে নিয়ে ঘুরল বেলফোর, ছুটল যে-পথ দিয়ে একটু আগে এসেছে।

বরফে হাঁটু গাড়ল রানা, এক হাতে চেপে রেখেছে আহত কাঁধ। ক্ষত থেকে রক্ত বেরুতে দেখা গেল। তার পাশে বসে সেটা পরীক্ষা করছে লাবণ্য।

রানা তাকিয়ে আছে বেলফোরের দিকে। সে খাড়া পাহাড়-প্রাচীরের দিকে যাচ্ছে। 'এই জায়গা ছেড়ে কোথাও তুমি যেয়ো না,' বলে লাবণ্যের হাতটা কাঁধ থেকে সরিয়ে দিয়ে বেলফোরের পিছু নিল ও।

'রানা, তুমি আহত!' প্রতিবাদ করল লাবণ্য।

জবাব দিল না রানা।

দু'জনের কারও কাছেই ব্যাকপ্যাক নেই। রানার কাছে পিস্তল আছে, আর আছে আইস অ্যাক্স, কিন্তু অক্সিজেন ক্যানিস্টার নেই।

পাহাড়-প্রাচীর বেয়ে দ্রুত উঠে যাচ্ছে একটা গিরগিটি, নীচে থেকে বেলফোরকে দেখে অন্তত তাই মনে হলো। তার মত দক্ষ পর্বতারোহী খুব কমই দেখেছে ও, স্বীকার করতে হলো রানাকে। বেলফোরের রুটই অনুসরণ করছে ও, তবে গতি অনেক শ্লথ। মনে হলো সব সেই আবার আগের মত স্লো মোশানে ঘটছে। বাতাসের অভাবে হাঁপাচ্ছে ও। প্রতিটি নড়াচড়া পীড়ন আর অত্যাচার।

ত্রিশ মিনিট পর পাহাড়-প্রাচীরের মাথায় পৌঁছে গেল বেলফোর। রানা খুব বেশি পিছিয়ে নেই, তবে উঠবার গতি মন্থর। উপরে উঠে এসে একদম নেতিয়ে পড়ল ও, অক্সিজেনের অভাবে খাবি খাচ্ছে ফুসফুস। আচ্ছন্ন বোধ করছে ও। যেন কোন দিশা খুঁজে পাচ্ছে না। এখন যদি দাঁড়ায়, নির্ঘাত পড়ে যাবে।

শুধু যদি সঙ্গে একটা অক্সিজেন ক্যানিস্টার থাকত!

মাথার উপর কালো হয়ে উঠছে আকাশ। হিম ঠাণ্ডা হাড় পর্যন্ত জমিয়ে ফেলবে। মুখে ফোঁটা পড়ছে, মনে করিয়ে দিল মাফলার দিয়ে উন্মুক্ত চামড়া ঢেকে ফেলতে হবে। বাতাসের গতিবেগ দ্রুত বাড়ছে।

ফুসফুসে যেন আগুন ধরে গেছে। এখন যদি পাঁচিল বেয়ে নীচে নামতে চায়, আছাড় না খেয়ে পারবে কি?

আরে! ও ভুলল কী ভাবে?

পারকার সাইড পকেটে হাত ভরল রানা। মেজর হোসেনের দেওয়া ছোট

টিউবটার অস্তিত্ব অনুভব করল। বের করে এনে মুখে ঢোকাল।

ইমার্জেন্সী এয়ার ব্রিদার আল্লাহর দান। অক্সিজেন ঠাণ্ডা আর শুকনো লাগছে, তবে রানার শিরা-উপশিরায় বিপুল শক্তি যোগান দিতে শুরু করল। আচ্ছন্ন আর দিশেহারা ভাব দ্রুত কাটিয়ে উঠল রানা। কয়েক মিনিট পর নতুন শক্তি আর উদ্যম নিয়ে ধাওয়া শুরু করল আবার।

এখন ওরা পাথর আর বরফের তৈরি একটা নালা ধরে উঠছে, হাঁটু সমান তুষার ভেঙে। এই পথ ওদেরকে ওয়েস্ট রিজ-এ পৌঁছে দেবে। ওয়েস্ট রিজ কাঞ্চনজঙ্ঘার চূড়া থেকে মাত্র একশো মিটার নীচে।

অক্সিজেন ছাড়াই উঠছে বেলফোর। এমনকী দুঃসাহসী প্রফেশন্যাল পর্বতারোহীরাও এই উচ্চতায় অক্সিজেন ছাড়া চড়বার কথা ভাবতে পারে না। অনেকটা উপরে উঠে এসে দৃষ্টিপথ থেকে বেলফোরকে হারিয়ে ফেলল রানা। থামল ও, চারদিকে দ্রুত চোখ বুলাচ্ছে। গেল কোথায় বেজন্মাটা! তুষারপাত এরই মধ্যে তার পায়ের ছাপ ঢেকে দিয়েছে?

অকস্মাৎ একটা কারনিস থেকে লাফ দিল বেলফোর। রানার ঘাড়ে পড়ল সে, তবে কুড়ালটা মাথায় লাগাতে পারল না। ছিটকে পড়ল দু'জনেই, কিছুটা গড়াল, তারপর সিধে হয়ে ধস্তাধস্তি শুরু করল। বেলফোরের নাকে-মুখে পর পর দুটো ঘুসি মারল রানা, কিন্তু যথেষ্ট জোর না থাকায় তেমন কাজ হলো না।

রানার মাথা লক্ষ্য করে আবার কুড়াল চালাল বেলফোর। সরাসরি না লাগলেও, পাশ ঘেঁষে বেরিয়ে যাবার সময় খুলিতে ঘষা খেল। তাতেই অবশ পাথর হয়ে গেল রানা, মুহূর্তের জন্য অসহায়। দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে গেছে, হাঁপাচ্ছেও আবার। ধারণা করল, কুড়াল এবার ওর বুকে গাঁথবে বেলফোর। তবে সেরকম কিছু ঘটল না।

মাথাটা ঝাঁকিয়ে চোখের সামনে থেকে সর্ষে ফুলগুলো বিদায় করল রানা, ধীরে ধীরে সিধে হলো। দৃষ্টিশক্তি ফিরে এসেছে, তবে মাথাটা ভয়ানক দপ দপ করছে।

বেলফোর পালিয়ে গেছে। পাহাড়ের আরও উপরে উঠছে সে—চূড়ার দিকে। ইমার্জেন্সি ব্রিদার থেকে আরও কিছুক্ষণ অক্সিজেন নিল রানা, তারপর উঠতে শুরু করল।

তুষারপাতের গতি দ্রুত বাড়ছে। তারই সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে বাতাসের গর্জন।

বেলফোর ভাবছে, এই নরক থেকে আমি বেরুতে চাই।

তার সমস্ত শক্তি ব্যবহার করা হয়ে গেছে। রিজার্ভও প্রায় শেষ হবার পথে। খিদে পেয়েছে তার। পিপাসায় গলা শুকিয়ে কাঠ। এত কষ্ট হচ্ছে, ইচ্ছে করছে চিৎকার করে। সে জানে, এসব লক্ষণ কী প্রমাণ করে। হাই অলটিচ্যুড সেরিব্রাল ইডিমা-য় আক্রান্ত হচ্ছে সে। খুব তাড়াতাড়ি নীচে নেমে না গেলে স্ট্রোক হতে পারে তার।

কিন্তু নামতে হলে চূড়ায় তাকে উঠতেই হবে। তার বাঁচার একমাত্র উপায় চূড়ায় পৌঁছে কাঞ্চনজঙ্ঘা থেকে সিকিমের দিকে নেমে যাওয়া। রানাকে ফাঁকি দিয়ে পালাতে পারলে সিকিমে সে ঠিকই হারিয়ে যেতে পারবে। ওখানে তার

লোকজন আছে।

বেলফোরের মাথা ঠিকমত কাজ করছে না। করলে প্রথমেই সে ভাবত সিকিমে পৌঁছাতে কম করেও তিন থেকে চারদিন লাগবে তার। আরও লাগবে তাঁবু, স্লিপিং ব্যাগ, সাপ্লাই।

ওয়েস্ট রিজ-এ পৌঁছাল বেলফোর। চূড়া ধরে এখন তাকে একশো মিটার এগোতে হবে। ওদিকের কিনারাটাই দু'দেশের সীমান্ত হিসাবে স্বীকৃত। কিনারা থেকে নামলেই সিকিম।

বেলফোরের ধারণা সে দৌড়াচ্ছে। আসলে প্রতি দশ সেকেন্ডে একবার পা ফেলছে সে। তার দৃষ্টিতে চারপাশের সব কিছু ঝাপসা। নিজেকে মনে করিয়ে দিল, উদ্দেশের প্রতি অবিচল থাকাটা জরুরী। সে এই মুহূর্তে দুনিয়ার তৃতীয় উচ্চতম পর্বতশৃঙ্গে রয়েছে।

কেন মনে হচ্ছে সে একটা চরকির মধ্যে বসে আছে? যেন কোনমতেই চূড়ার মাঝখানে পৌঁছাতে পারছে না। প্রবল তুষারপাতের ভিতর মার্কার, বিভিন্ন দেশের পতাকা, লোকজনের ফেলে যাওয়া স্পাইক ইত্যাদি দেখতে পাচ্ছে বলে মনে হলো। তারমানে সত্যি সে কাঞ্চনজঙ্ঘার চূড়ায় উঠেছে! ক্রল করে এগোতে চেষ্টা করল বেলফোর। তারপর একেবারে হঠাৎ অন্ধ হয়ে গেল।

এ শুধু অপ্রত্যাশিত অভিজ্ঞতা নয়। এরচেয়ে বেশি আতঙ্কিত করবার মত ঘটনা মানুষের জীবনে আর খুব কমই আছে। চোখ গেছে, এরপর শুরু হলো খুলির ভিতর সচল একটা ব্যথা। বেলফোর ভাবল, তার মাথাটা না ফেটে যায়।

আর্তনাদ করে উঠে বরফের উপর গড়াগড়ি খাচ্ছে সে। একটু পরই গড়াগড়ি থামল, শুরু হলো অক্সিজেনের জন্য হাঁসফাঁস। হাতে ঠেকল একটা ফ্ল্যাগপোল–আট হাজার পাঁচশো আটানব্বুই মিটারে উঠেছে সে।

বেলফোরকে ধরে ফেলল রানা। পড়ে গেল ও-ও, বেলফোরের পাশেই। পকেট থেকে ইমার্জেন্সি ব্রিদার বের করে শ্বাস নিল। হিমালয় পর্বতমালা ওর সবগুলো দিকে যত দূর দৃষ্টি চলে ছড়িয়ে রয়েছে। ও যেন একটা প্লেন থেকে দৃশ্যটার উপর চোখ বুলাচ্ছে।

'কে ওখানে?' নিঃশ্বাসের সঙ্গে জানতে চাইল বেলফোর।

'আমি তোমার সেই অক্সফোর্ডের পুরানো বন্ধু,' হাঁপাতে হাঁপাতে কোন রকমে বলল রানা। ব্রিদারটা সরিয়ে রাখল।

বেলফোর যেন ধাঁধায় পড়ে গেল। কে? 'ও, আচ্ছা,' তারপর বলল সে। 'রানা। প্রায় ভুলেই গিয়েছিলাম কার কাছ থেকে পালাচ্ছি,' এটা বোধহয় স্বগতোক্তি, অস্ফুটে। 'আমরা মাথায় উঠে এসেছি, তাই না?'

'হ্যাঁ।'

'তুমি···কেমন আছ তুমি?'

'বেঁচে আছি।' কাশল রানা। 'তোমার অবস্থা বিশেষ সুবিধের মনে হচ্ছে না, মন্টি।'

'না,' স্বীকার করল বেলফোর। 'আমি ভাল নেই। শালার চোখে কিছুই দেখছি না। ব্যাড···ব্যাড লাক। তোমার কাছে বাতাস আছে নাকি?'

'আছে।'

'চাইলে তো দেবে না। দেবে?' মিনতি জানাল বেলফোর, তবে মান-সম্মান খুইয়ে নয়। 'পুরানো দিনের বন্ধুত্বের কথা স্মরণ করে?'

'পেসমেকারটা কোথায়?' ঠাণ্ডা, কঠিন সুরে জিজ্ঞেস করল রানা।

কাশতে কাশতে বিষম খেল বেলফোর। প্রায় এক মিনিট প্রচণ্ড কষ্ট পেল সে। ধীরে ধীরে দম ফিরে পেয়ে বলল, 'দেখলে, হাসতে চেষ্টা করলে কী অবস্থা হচ্ছে?'

'আমি মনে করি এটা একটা ফেয়ার অফার, মন্টি,' বলল রানা। 'অক্সিজেনের বদলে পেসমেকার।'

'ইউ বাস্টার্ড!'

তারপর দু'জনেই চুপচাপ। ঝড় আরও বিপজ্জনক হয়ে উঠছে। বাতাসের আর্তনাদে কান পাতা দায়। রানা অনুভব করল সাব-জিরো টেমপারেচার পারকা ভেদ করছে। এখান থেকে ওদেরকে চলে যেতে হবে।

'কী হলো, মন্টি? তোমার জন্যে আমি এখানে সারাদিন দাঁড়িয়ে থাকতে পারব না।'

পকেটে হাত ভরতে গেল বেলফোর। খপ করে তার কব্জি চেপে ধরল রানা। 'ভয় নেই, রানা,' বলল বেলফোর। 'পিস্তলটা সত্যি নেই।'

সোনার তৈরি জিনিসটা বের করে মুঠো খুলল বেলফোর। তার তালু থেকে নিল রানা, পরীক্ষা করে দেখল এটাই তিয়েন চাও-এর পেসমেকার কিনা, তারপর একটা পাউচে রেখে দিল। এরপর ইমার্জেন্সি ব্রিদার-এর মাউথপীস বেলফোরের ঠোঁটের ফাঁকে ঢুকিয়ে দিল।

'জিএম তোমাকে কত টাকা দিচ্ছিল?' জিজ্ঞেস করল রানা।

হাসতে চেষ্টা করে আবার কিছুক্ষণ কাশল বেলফোর। 'আমি জিএম নই, রানা। কখনোই ছিলাম না। জিএম ছিল হিউগো ভেনিনি; আমি না।' শ্বাস নেওয়ার ফাঁকে ফাঁকে গল্পটা বলে গেল সে।

'জিএম তাকে টাকার লোভ দেখিয়ে স্কিন-সেভেনটিন চুরি করতে রাজি করায়...হাস্যকর পনেরো হাজার পাউন্ডের বিনিময়ে আমার সাহায্য চায় সে...আমার পাল্টা প্রস্তাব ছিল—জিএম-কে বোকা বানিয়ে জিনিসটা আমি রাশিয়ান মাফিয়ার কাছে বেচব, সে আমাকে সাহায্য করুক।

'...রুশ মাফিয়ার সঙ্গে আগেও আমি কাজ করেছি...ভেনিনি টাকার লোভে আমার প্রস্তাবে রাজি হয়...'

'তা হলে পেসমেকার আর তিয়েন চাও-এর ব্যাপারটা—?'

'ওটা প্রথম থেকেই জিএম-এর প্ল্যান ছিল...তুমি যখন বেলজিয়ামে নাক গলালে, জিএম তাদের স্কিম বদল করল...আগের রুট বাতিল করে নতুন রুট বাছাই করা হলো...'

'নেপালে যেহেতু আমার কানেকশান আছে, তাই হাইজ্যাকারদের ভাড়া করা, হোটেল থেকে চাওকে কিডন্যাপ করা, তারপর তাকে প্লেনে তুলে সিকিমের একটা এয়ারফিল্ডে পৌঁছে দেয়ার প্ল্যান তৈরি করতে আমার কোন সমস্যাই হয়নি।

'...সেখানে চাওকে আমার লোকেরা লুকিয়ে রাখত...প্ল্যান ধরে ভেনিনিই বেশিরভাগ আয়োজন করে...ফর্মুলাটা বিক্রি করার পর টাকাটা আমরা দু'জন ভাগ করে নিতাম, কিন্তু সে অসতর্ক মানুষ...জানতাম জিএম তার কল্লা নেবে, আর তারপর সব টাকা একা আমার হয়ে যাবে...শালার কী ভাগ্য, এখানে এসে ট্যুরিস্ট প্লেনটা বিধ্বস্ত হলো, এই শালার অভিশপ্ত পাহাড়ে...

'...আমি জানতাম স্কিন-সেভেনটিন চাও-এর শরীরে কোথাও আছে, কিন্তু ঠিক কোথায় তা জানতাম না। সেটা তুমি জানতে...সেজন্যেই তোমাকে বেঁচে থাকতে দিই আমি। জানতাম তুমিই আমাকে দেখাবে পেসমেকারটা কোথায় আছে।'

ইমার্জেন্সি ব্রিদারটা রানাকে ফিরিয়ে দিল বেলফোর। 'তুমি বরং রওনা হয়ে যাও,' বলল সে। 'ঝড় মারাত্মক হয়ে উঠছে।'

'তুমি আমার সঙ্গে নামছ,' বলল রানা।

মাথা নাড়ল বেলফোর। 'চাই না আমার কোর্টমার্শাল হোক। ওটার মুখোমুখি হওয়া সম্ভব নয়। জেলখানাতেও মরতে পারব না। না, তারচেয়ে এখানে মরা কোটিগুণ ভাল। আমাকে তুমি এখানে ফেলে যাও। দুনিয়ার মাথায় মরতে দাও আমাকে।'

'রঘুর কথা বলো,' গম্ভীর কণ্ঠস্বর রানার।

'আমাকে ঠেকাবার প্রাণপণ চেষ্টা করেছে সে। তারপর পড়ে গেল। তবে জেনো, কাপুরুষের মত মরেনি লোকটা। আমার ঠিক উল্টো। সত্যি দুঃখিত, রানা।'

হঠাৎ রানা আরেকজনের উপস্থিতি সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠল। প্রথমে ভাবল ভৌতিক কিছু, কিংবা তথাকথিত সেই তুষারমানব। তবে না, একটা ব্যাকপ্যাক আর অক্সিজেন নিয়ে উঠে আসছে ডাক্তার লাবণ্য। মুখ থেকে রেসপারেটার ফেলে দিয়ে চেঁচামেচি শুরু করে দিল সে, 'ওহ্, ভগবান! তোমরা এখানে কী করছ? আমাদের নামতে হবে না?'

'ললিতা–' শুরু করল বেলফোর, 'অভিনন্দন।'

'কী?'

'অভিনন্দন,' বেলফোর হাঁপাচ্ছে। 'কাঞ্চনজঙ্ঘায় যে-সব মেয়ে উঠেছে তাদের সংখ্যা তুমি এক হাতের গিঁটেই গুণতে পারবে।'

খবরটা বিস্মিত করল লাবণ্যকে। সব ভুলে হেসে উঠল সে। তারপর রানার পাশে হাঁটু গাড়ল। 'আমি অবশ্য তাদের একজন হবার জন্যে উঠিনি। উঠেছি তোমাদেরকে ধরার জন্যে।'

'তোমরা দু'জনেই,' বলল বেলফোর, 'যাও। আমি এখানে থাকব।'

সিধে হলো রানা, লাবণ্যের হাত ধরে টানল। 'এসো।'

'সে কী!'

'ও এখানে থাকবে।'

'তা কী করে হয়?' হাতটা ছাড়িয়ে নেওয়ার চেষ্টা করল লাবণ্য। 'এসো, ওকে আমরা অক্সিজেন দিই। আমরা ওকে নীচে নামিয়ে নিয়ে...'

কাশল বেলফোর, বিষম খেলো, তারপর হঠাৎ নিস্তেজ হয়ে গেল। দ্রুত

তাকে পরীক্ষা করল লাবণ্য। পালস্ নেই।

আবার লাবণ্যের বাহু ধরে টানল রানা। এবার ওর সঙ্গে রওনা হলো লাবণ্য। তার আগে রানাকে অতিরিক্ত একটা অক্সিজেন ক্যানিস্টার দিল সে।

একুশ

'তুমি জেগেছ?' জানতে চাইল লাবণ্য।

কাল রাতে প্রচণ্ড ঝড়ের মধ্যে অসুস্থ হয়ে পড়েছিল রানা, সঙ্গে লাবণ্য না থাকলে চূড়া থেকে ক্যাম্পে ফিরতে পারত কিনা সন্দেহ। লাবণ্য ওকে গরম সুপ খাইয়েছে, তারপর ওকে নিয়ে বিভওয়্যাক স্যাকে ঢুকে ঘুম পাড়িয়ে দিয়েছে।

ধীরে ধীরে নড়ল রানা। সারাটা রাত একেবারে মড়ার মত ঘুমিয়েছে ও।

তাঁবুর মাথা থেকে রোদ ঢুকছে ভিতরে। কতক্ষণ তারা ঘুমিয়েছে বলতে পারবে না লাবণ্য, তবে এটা যে নতুন একটা দিন তা তো বোঝাই যাচ্ছে। কতটুকু কী ক্ষতি হলো দেখবার জন্য বুট পরে তাঁবু খুলল সে। প্রবেশ পথ তুষার আর বরফে সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে গেছে। পথ তৈরি করবার জন্য হাতে কোদাল নিতে হলো।

আওয়াজ শুনে উঠে বসল রানা। 'এটা কোন্ সাল?'

'যে সালে আমাদের মরণ হবে, যদি না তাড়াতাড়ি বরফ খুঁড়ে বেরুই,' বলল লাবণ্য। 'কেমন আছ এখন?'

'ভাল।' হঠাৎ কাঁধের ব্যান্ডেজটা খেয়াল করল, বেলফোর যেখানে কুড়াল মেরেছিল। 'ধন্যবাদ, লাবণ্য। অসংখ্য।'

'হয়েছে। ক্লান্ত হবার আগে চায়ের সঙ্গে কিছু খেয়ে নিই, কী বলো?'

কয়েক ঘণ্টা ঘুম জাদুর মত কাজ করেছে। অতি দ্রুত সতেজ হয়ে উঠল রানা। কাঁধে বেশ ব্যথা আছে, তবে প্রায় সব কাজই করতে পারছে। পথ বের করবার জন্য লাবণ্যের সঙ্গে সে-ও কোদাল হাতে নিল। তারপর প্লেনের ফিউজিলাজ থেকে লাশ বের করবার কাজটায় ফিরে গেল লাবণ্য, রানা পথ করে নিয়ে ঢুকল ডুনো কারমেলের তাঁবুতে। তার স্যাটেলাইট টেলিফোনটা ব্যবহার করবে।

ক্যাম্প ফোর-এ নামবার আগে আরেকবার বিসিআই হেডকোয়ার্টার ঢাকার সঙ্গে কথা বলতে চায় রানা। বেস ক্যাম্পের কার্তিক সুলক্ষণকেও জানিয়ে রাখতে চায় যে ওরা রওনা হচ্ছে।

তাঁবুর ভিতর ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে রানা অ্যাড্রেনালিনের বিস্ফোরণ অনুভব করল।

কারমেলের পোর্টেবল্ টেবিলে স্যাটেলাইট ফোনটা নেই। ঝড় শুরু হবার আগে কেউ একজন তাঁবুতে ঢুকেছিল।

লাশটা এখনও তাঁবুতে রয়েছে, উজ্জ্বল রঙের পারকায় মোড়া। কী ছিল না

ছিল তা যদি স্মরণ করতে ভুল না হয় রানার, তাঁবু থেকে একটা প্যাক নিখোঁজ হয়েছে। ওই প্যাক আর ফোন ছাড়া সব আগের মতই আছে।

কী ভেবে কারমেলের প্যাকটার পাশে চলে এল রানা। অন্যান্য জিনিসের সঙ্গে তাঁবুর কোণে পড়ে রয়েছে সেটা। কাপড়চোপড়ের ভিতর হাত ডোবাতে একটা রাইফেলের পার্টস পেল: স্টক, ব্যারেল, টেলিস্কোপ সাইট–আর ৭.৬২ মিমি কার্টিজ। এটা একটা গ্যাস-অপারেটেড স্নাইপার রাইফেল, অনেকটা বেলজিয়ান এফএন এফএএল-এর মত।

রানার শিরদাঁড়ায় ঠাণ্ডা বরফ একটা অনুভূতি। এ কীভাবে হয়! অভিযানের সময় ওকে আর রঘুকে গুলি করবার জন্য এই অস্ত্রটা ব্যবহার করা হয়েছে। এই রাইফেলের গুলিতে মারা গেছে ডেভ হোয়াইট। স্নাইপার ছিল ডুনো কারমেল!

তাঁবুর মেঝেতে পড়ে থাকা লাশটার দিকে ঘুরে গেল রানা। এগিয়ে এসে পারকাটা হ্যাঁচকা টান দিয়ে লাশের উপর থেকে তুলে নিল।

লাশ কারমেলের নয়। একজন শেরপার লাশ, মাল টানার জন্য বেস ক্যাম্প থেকে নতুন এসেছিল। বাকি সবার মত তারও গলা কাটা হয়েছে।

লাফিয়ে সিধে হলো রানা, ছুটে বাইরে বেরিয়ে এল। 'লাবণ্য!' ডাকল ও। প্লেনের পাশে নেই সে। গভীর তুষার ভেঙে যত জোরে পারা যায় ছুটল ও। ফিউজিলাজের পাশে লাবণ্যের ছাড়াও আরেকজনের পায়ের ছাপ পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে এখন।

প্লেনের খোলা হ্যাচে দাঁড়িয়ে রয়েছে কারমেল, হাতের আগ্নেয়াস্ত্র লাবণ্যের মাথায় তাক করা।

'হ্যালো, রানা,' বলল সে। 'হাত দুটো মাথার পাশে তোলো।'

তুলল রানা।

হাতের অস্ত্র অত্যন্ত সাবধানে লাবণ্যের দিকে তাক করে আছে কারমেল। বলল, 'ডাক্তার লাবণ্য, রানার পারকার সাইডে একটা পাউচ আছে, ওটা থেকে ওয়ালথারটা বের করো। দু'আঙুলে ধরে বের করবে, প্লিজ।'

তাই করল লাবণ্য। কারমেলের নির্দেশে ছুঁড়ে দিল পিস্তলটা। কয়েক ফুট দূরের তুষারে পড়ল সেটা, প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ডুবে গেল। লাবণ্যকে আবার নিজের পাশে টেনে নিল কারমেল। 'শুনলাম এখনও তুমি ক্যাম্প ফাইভে আছ,' বলল সে। 'তাই ভাবলাম একটু বেড়িয়ে যাই। খুব খারাপ কথা যে লঙ্গিনাস তোমাকে আর ডাক্তার লাবণ্যকে খুন করেনি। তার ওপর নির্দেশ ছিল...'

'ওকে ছেড়ে দাও, কারমেল।'

'না, রানা। যে কাজ লঙ্গিনাস এলোমেলো করে ফেলেছে সেটা আমাকে শেষ করতে হবে। বুঝতেই পারছ, সে আমার হয়ে কাজ করছিল। জিএম আমাকে ভাড়া করে, আমি লঙ্গিনাসকে ভাড়া করি। পাঁচশো বছর নেপাল সরকারের চাকরি করলেও যে টাকা বেতন পাব না, জিএম আমাকে তারচেয়ে বেশি টাকা সাধল।

'কিন্তু একই সঙ্গে এ-ও বলে দিল, আমার ভাড়া করা লোক যদি ব্যর্থ হয়, তা হলে তারা ধরে নেবে আমি ব্যর্থ হয়েছি। কাজেই আমাকে দেখতে হবে আমি ব্যর্থ হইনি।

'আর ওই ব্যাটা উজবুক বেলফোরটা! এর মধ্যে একটা ফ্রিল্যান্স এজেন্টও আছে, কে জানত! শালা আমার প্ল্যানটার বারোটা বাজিয়েছে।'

'আচ্ছা, তা হলে এই ঘটনা,' বলল রানা। 'টিমে দু'জন জিএম অপারেটর থাকবে, এটা আমি ধারণা করিনি। লঙ্গিনাস ছিল মাসলম্যান, আর তুমি হলে ব্রেন, তাই না?'

'তুমি যা বলো,' বলল কারমেল। 'এটা আমার প্রশংসা বলেই ধরে নিলাম।'

চোখ সরু করল রানা। 'আড়ি পেতে আমার কথা শুনেছ। আমার প্রতিটি মুভ সম্পর্কে জানতে তুমি। কাঠমাণ্ডুতে হিটম্যানকে তুমিই ভাড়া করে আমার পিছনে লাগিয়ে দাও।'

'ওই লোকটা ছিল খুব বাজে অ্যামেচার।'

'আমরা কখন কোথায় ছিলাম বা গেছি, সব তুমি জানতে। এতক্ষণ কোথায় লুকিয়ে ছিলে বলো তো?'

'লঙ্গিনাসের জন্যে অপেক্ষা করব বলে ক্যাম্প ফোর-এ নেমে যাই আমি, কিন্তু সে পৌঁছায়নি। হ্যাঁ, ঢাকার সঙ্গে তোমাকে কথা বলতে শুনে জানতে পারি তুমি তখনও বেঁচে আছ। মোবাইল ফোনের এই একটা সমস্যা। ওগুলোয় আড়ি পাতা পানির মত সহজ।

'আমি অপেক্ষায় থাকি ডাক্তারকে নিয়ে কখন তুমি নামবে। কিন্তু ওরকম ভয়ঙ্কর ঝড়ের মধ্যেও ওখানে থেকে যাবার সিদ্ধান্ত নাও তুমি। কাজেই তোমাকে চমকে দেয়ার জন্যে সকাল বেলা আমাকেই উঠে আসতে হলো। এবার জিনিসটা দাও।'

'জিনিসটা মানে যদি পেসমেকার হয় তা হলে সেটার কথা চিরকালের জন্যে ভুলে যাও। বেলফোরের কাছে ছিল, তার সঙ্গে পাহাড়ের নীচে ওটাও পড়ে গেছে।'

রানাকে খুঁটিয়ে দেখল কারমেল। 'ভারী হতাশ হলাম। তোমার জন্যেও খুব খারাপ হলো। ঠিক আছে, এবার মার্চ করে মালভূমির ওদিকের কিনারায় চলো। তোমরা দু'জন পাখির মত উড়বে।'

'তুমি আমাদেরকে গুলি করছ না কেন?' জানতে চাইল রানা। 'কিংবা জবাই না করারই বা কী কারণ?'

'জবাই করারই নিয়ম, তবে এটার মধ্যে খুব মজা আছে,' সহাস্যে বলল কারমেল। 'কেউ খসে পড়ার সময় যে চিৎকারটা দেয়, ওটা শুনতে অসম্ভব ভাল লাগে আমার–ঠিক যেমন সিনেমায় দেখা যায়। আওয়াজটা কেমন শোনায় জানোই তো–আ-আ-আ-ই-ই-ই-এ-এ-এ!' হেসে উঠল সে। তারপরই সেটা মুছে ফেলল মুখ থেকে। 'মুভ!'

ঘুরল রানা, গভীর তুষার ঠেলে কিনারার দিকে এগোল। লাবণ্যকে ধাক্কা দিয়ে প্লেন থেকে নামিয়ে আনল কারমেল। 'ওর পিছু নাও।'

ওরা খাদের কিনারায় পৌঁছাবার পর কারমেল বলল, 'লাফ দাও, রানা। চুপ করে থেকে আমাকে আবার ঠকিয়ো না।'

'তুমি খুব বড় একটা ভুল করতে যাচ্ছ, কারমেল,' বলল রানা। 'একা তুমি

পাহাড় থেকে নামবে কীভাবে?'

'তুমি ভুলে যাচ্ছ, রানা, আমি অত্যন্ত অভিজ্ঞ একজন মাউন্টিনিয়ার। আমি নিরাপদেই নামব। তবে নীচে তুমি আমার চেয়ে আগ পৌঁছাবে। ও, ভাল কথা, মাথাটা নীচে দিয়ে নামবে, কেমন?'

ঘুরে তার মুখোমুখি হলো রানা। কারমেল এখনও লাবণ্যের মাথায় পিস্তল ধরে আছে।

'আমি লাফ দেব না। আমাকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিতে হবে।'

মাথা নাড়ল কারমেল। 'হয় তুমি লাফ দেবে, তা না হলে আমি তোমার মাথা ফুটো করে দেব। কোনটা তোমার পছন্দ?'

গগলসের ভিতর দিয়ে লাবণ্যের দিকে অপলক তাকাল রানা। চোখের পাতা কাঁপিয়ে সংকেত দিল লাবণ্য। দু'বার চোখ মিটমিট করল রানা।

ডান পা তুলল লাবণ্য, কারমেলের হাঁটুর নীচে শক্ত হাড়ে লাথি মারল। ক্র্যাম্পূন-এর চোখা পয়েন্টগুলো কাপড় ভেদ করে চামড়ায় পৌঁছে গেল।

ব্যথায় চেঁচাচ্ছে কারমেল। পিস্তলটা ঠেলে দিয়ে বরফে হাঁটু গাড়ল লাবণ্য। ঠিক তখনই দৈত্যাকার লোকটার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল রানা। পড়ে গেল দু'জন। গড়াচ্ছে। কারমেলের পিস্তল শূন্যে খিলান আঁকল, তারপর তুষারে পড়েই ডুবে গেল।

রানার একটা ঘুসি কারমেলের গগলস্ ফাটিয়ে দিল। বাঘের মত গর্জে উঠল কারমেল, রানার হুড আঁকড়ে ধরে টান দিল। হুডটা খুলে যেতে রানার মুখ আর মাথায় সুই বেঁধাল বাতাস। এই সময় বুকে কারমেলের একটা লাথিও খেল ও।

দানবটার সঙ্গে পারা মুশকিল, বুঝতে পেরে আবার তার উপর লাফিয়ে পড়ল রানা। আবার ছিটকে পড়ল দু'জন। কিনারার দিকে সরে যাচ্ছে কারমেল, ধরবার পর রানাকে আর ছাড়ছে না। 'পড়লে তোমাকে নিয়েই পড়ব!' হিসহিস করে বলল সে।

লাফ দিয়ে অ্যাকশনে যোগ দিল লাবণ্য, রানার পা ধরে ফেলে বলল, 'তোমাকে আমি ধরেছি!'

কারমেল রানাকে ধরে রাখতে ব্যস্ত, আর রানা ব্যস্ত তাকে মারতে। ওর হাত চলছে, একই সঙ্গে ভাঁজ করা হাঁটু দিয়ে পেটে গুঁতো মারাও চলছে।

কিনারা থেকে ঝুলে পড়ল কারমেল। রানার কাঁধ ধরে আছে সে। তার ওজন দু'জনকেই নীচে টানছে। লাবণ্য জমিনে ক্র্যাম্পূন গাঁথল, রানার ঘষটানো আর পিছলানো থামানোর জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করছে।

রানা আর কারমেল এখন মুখোমুখি। এই মুহূর্তে লোকটার মুখ স্রেফ আতঙ্কের একটা মুখোশ ছাড়া আর কিছু নয়। তবে তার মানে এই নয় যে করুণা ভিক্ষা চাইবে সে।

'নীচে যাচ্ছ, রানা?' সেঁটে থাকা দু'সারি দাঁতের ফাঁক দিয়ে জিজ্ঞেস করল কারমেল। 'নক্ষত্রের পতন?'

তার হাতের মাংসে নখসহ আঙুল ঢোকাবার চেষ্টা করছে রানা, নিজের পারকা ছাড়িয়ে নেওয়ার চেষ্টায়।

'ভগবান!' বলল লাবণ্য, বাতাসের অভাবে ফোঁপাচ্ছে। 'আমি…বেশিক্ষণ…আর…ধরে…রাখতে…পারব না।'

কারমেলের এখন প্রায় পুরো শরীর শূন্যে ঝুলছে।

'জিএম…তোমার…বংশ…নির্বংশ করে…ছাড়বে!'

দমকা বাতাস এসে রানাকে জানিয়ে দিল, ওর মাথা খালি। একই সঙ্গে রানা উপলব্ধি করল ওর কাছে ভাল একটা অস্ত্র আছে। মাথার সামনের অংশ কারমেলের কপালে ঠুকল ও, যত জোরে পারা যায়।

কারমেলের চোখের মণি উপর দিকে উঠে গেল। ঢিল পড়ল মুঠোয়। নিজেকে ছাড়িয়ে নিল রানা। ঠেলে ফেলে দিল শত্রুকে।

'আ-আ-আ-ই-ই-ই-এ-এ-এ!'

কিনারা থেকে এক ইঞ্চি এক ইঞ্চি করে পিছিয়ে এল রানা। লাবণ্যকে দু'হাত দিয়ে আলিঙ্গন করল ও। কারমেলের আর্তচিৎকার ক্রমশ মিলিয়ে গেল।

'ঠিক সিনেমার মত,' বলল রানা।

বেস ক্যাম্পে পৌঁছাতে তিন দিন লাগল ওদের। ওদেরকে দেখে দু'হাত মেলে দিয়ে ছুটে এল কার্তিক সুলক্ষণ। মোবাইল ফোনে সাড়া না পেয়ে সে ধরে নিয়েছিল সবাই মারা গেছে। বিশ্রামের তিনটে দিন ওদের যত্ন-আত্তির কোন ত্রুটি রাখল না সে।

তারপর দীর্ঘ পদযাত্রা শেষে সভ্যতায় প্রত্যাবর্তন। রানা আর লাবণ্য অবিচ্ছেদ্য ঘনিষ্ঠ বন্ধু, শেরপাদের ভ্রুকুটি অগ্রাহ্য করে একই তাঁবুতে রাত কাটাল ওরা।

কাঠমাণ্ডুতে পৌঁছে নেপালি স্পেশাল পুলিশ আর সিআইডি কর্মকর্তাদের সঙ্গে একটা মীটিং করল রানা। কাঞ্চনজঙ্ঘায় ঠিক কী ঘটেছে, জিএম-এর হাত কতটা লম্বা, ইত্যাদি সমস্ত বিষয়ে বিশদ একটা লিখিত রিপোর্ট জমা দিল ও।

তাতে লাবণ্যের সাহসী ভূমিকার কথাও উল্লেখ করা হয়েছে। কর্মকর্তারা ওকে ধন্যবাদ দিলেন।

কাঠমাণ্ডু এয়ারপোর্টে রানাকে বিদায় জানাতে এল লাবণ্য। 'এখানেই শুরু আর এখানেই শেষ? আর কখনও দেখা হবে না?'

'কেন দেখা হবে না। পাহাড়ে চড়ার রোগটা তো নতুন করে ধরেছেই আমাকে। এবার তোমাকে নিয়ে এভারেস্টে চড়তে চাই। ছুটি পেলেই জানাব তোমাকে।'

'অনেস্ট?' একটা হাত বাড়াল লাবণ্য।

সেটা ধরে মৃদু চাপ দিল রানা। 'অনেস্ট।'

***